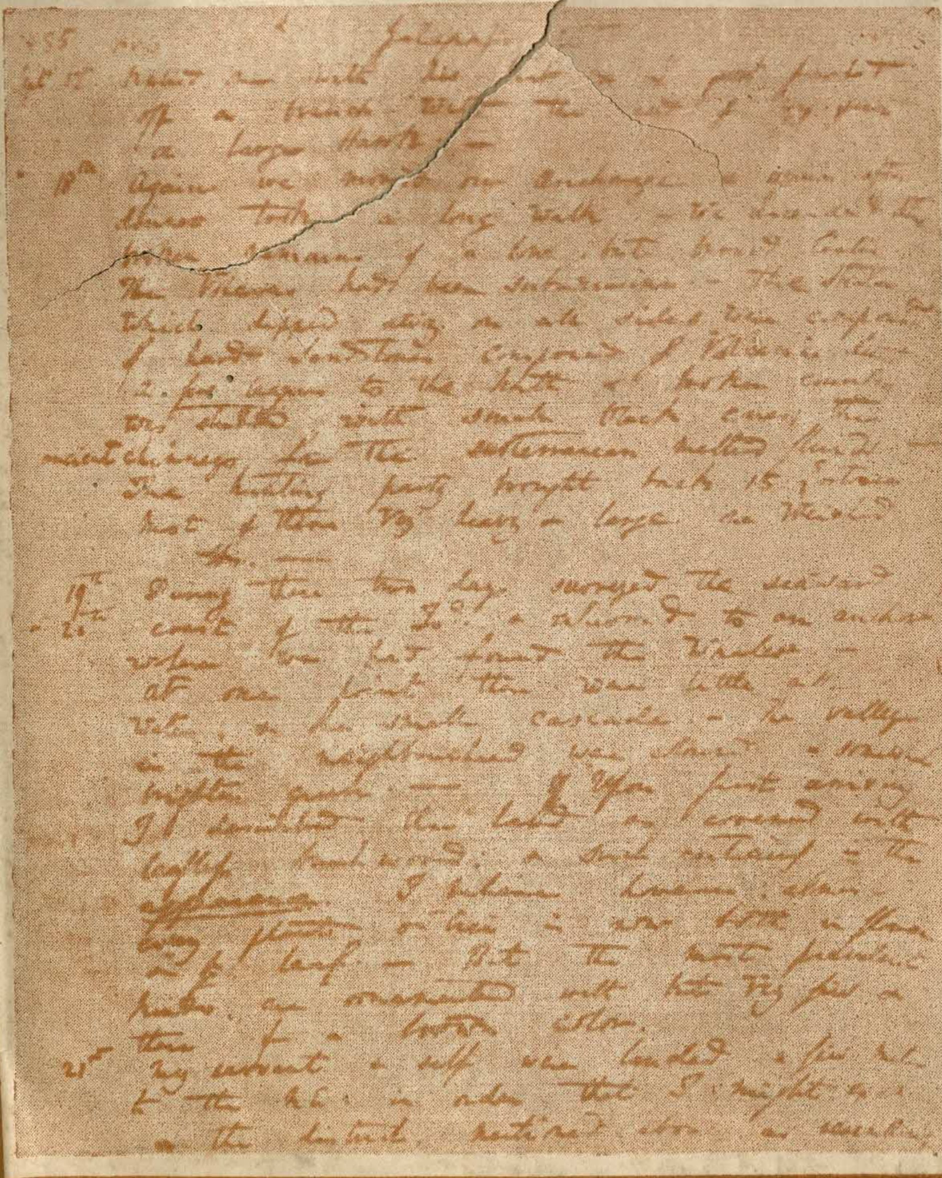


চার্লস ডারউইন
ডিসেন্ট অফ ম্যান



ডিসেণ্ট অব ম্যান

চার্লস ডারউইন

প্রথম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯৬

প্রকাশক ॥ রেণুকা সাহা ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদপট ॥ সন্দীপন ভট্টাচার্য ॥ জেলিয়াপাড়া লেন ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০১২
মুদ্রাকর ॥ দি [illegible] প্রিণ্টার্স ॥ ১৯ই গোয়াবাগান স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পঞ্চাশ টাকা

ইরাসমাস্ ডারউইন

চার্লস ডারউইনের পিতামহ

ডিসেন্ট অব ম্যান

চার্লস ডারউইন

ভাষান্তর

সঞ্জীব মণ্ডল

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

অসিত চৌধুরি

দীপায়ণ

২০ কেশব সেন স্ট্রীট॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

চার্লস ডারউইন

॥ জীবন এবং কাজ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ডাক্তার ইরাসমাস ডারউইন এক পরিচিত নাম। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, লেখক, অনুবাদক—সবের সমন্বয়ে ইরাসমাস এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 'জুনোমিয়া' নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। বইটির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, 'যে সব প্রাণীর রক্ত গরম, তারা সবাই একই সূত্র থেকে এসেছে—একথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে।' ইরাসমাসের পুত্র রবার্ট ডারউইনও বেছে নিয়েছিলেন চিকিৎসকের জীবিকা। শ্রপশায়ারের শ্রিউসবেরী অঞ্চলের বাসিন্দা রবার্ট জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেন সুসানা ওয়েজউডকে। রবার্ট-সুসানার ছয় সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তানটি পৃথিবীর আলো দেখে ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, আমরা যাকে চিনি চার্লস ডারউইন নামে।

শিশু চার্লস সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন না রবার্ট। কেননা, পড়াশোনায় তার মন নেই তেমন। ন'বছর বয়সে ওকে ভর্তি করা হয় শ্রিউসবেরী স্কুলে। না, সেখানেও মন বসাতে পারে নি চার্লস। বাঁধাধরা গতের পড়াশোনা কিছুতেই ভাল লাগতো না তার। সাবেক কালের কিছু ভূগোল আর ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু পড়ানোর পাট ছিল না ঐ স্কুলে। তাঁর ভাল লাগতো খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। পড়াশোনা করার চেয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল মুদ্রা, নামাঙ্কিত মোহর, নানাধরণের নুড়ি পাথর সংগ্রহ করার দিকে। এছাড়াও ভালবাসতেন রসায়নশাস্ত্র পড়তে এবং গাছপালা, লতাপাতা, পোকামাকড় ও পাখির ডিম সংগ্রহ ও চিহ্নিত করতে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁকটা তিনি পেয়েছিলেন তার বাবার বংশ থেকে এবং হাতে-কলমে কাজ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন মামার বাড়ি থেকে। এই সব কাজকর্ম তাঁর বাবা খুব অপছন্দ না করলেও, অপছন্দ করতেন পরীক্ষায় পাওয়া খারাপ নম্বরগুলি! বাবা ডাক্তার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন চাইতেন না মাতৃহারা ছেলেটি পড়াশোনা ফেলে সারাদিন খেলা ও মাঠ, পাহাড় বনজঙ্গল আর শিকার নিয়ে মেতে থাকুক। বেজায় রেগে একদিন বলেই ফেললেন,—'তুমি দেখছি শিকার, কুকুরের পাল আর ইঁদুর ধরা নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাক, পড়াশোনার দিকে ফিরেও তাকাও না। নিজের আর বংশের নাম ডোবাবে তুমি।' ভবিষ্যতের মহান প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছেলেবেলায় যে বেশ কিছুটা আলাদাই ছিলেন, এটা পরিস্কার বোঝা যায়। ষোল বছর বয়সে, বাবাকে কিছুটা সন্তুষ্ট করার তাগিদেই, ১৮২৫ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়তে যান তিনি। দাদা ইরাসমাস আগেই ওখানে পড়তে গেছে। কিন্তু পাঠক্রম শেষ করার উৎসাহ ধরে রাখতে পারেন নি চার্লস। পরবর্তী কালের চার্লস ডারউইনের লেখায় দেখছি: 'শীতকালের সকাল আটটার সময় মেটিরিয়া মেডিকা সম্বন্ধে ডাঃ ডানকানের ভাষণ—ওহ্, সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা!' তবে দুবছর ওখানে থাকার সময় প্লিনিয়ান সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর, প্রাণিতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন চার্লস। পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজও চলতে থাকে। এই সময় তিনি সামুদ্রিক জীবদের ভ্রূণ সম্বন্ধে দুটো কৌতূহলজনক আবিষ্কার করেন। এরপর ডাক্তারী পড়ায় ইতি ঘটে তাঁর। বাবা তাঁকে যাজক হতে বলেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে রাজী হন চার্লস। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটির ক্রাইস্ট কলেজে ১৮২৮ সালে জানুয়ারীতে ভর্তি হন, কিছুদিন তাঁকে বসতে হয় যাজক হওয়ার ক্লাসেও।

অন্য বইপত্রের অবসরে চার্লস ততদিনে পড়ে ফেলেছেন শেকসপিয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, বায়রণ, স্কট, মিল্টনের লেখা। কবিতা তাঁকে টানে, পরবর্তীকালে জাহাজে দীর্ঘভ্রমণের সময় সঙ্গী হয় মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'। কিন্তু এ পড়াশোনাও ভাল লাগে না তাঁর। এখানেও বেরোতেন দল বেঁধে শিকার করতে, সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজও চলতো।

এখানেই পরিচয় হয় উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন সিভেন্স হেন্‌স্লো-র সঙ্গে। হেন্‌স্লো হয়ে ওঠেন তার প্রেরণাদাতা। তাঁর প্রভাবে ভূতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা শুরু করে চার্লস। দাদুর লেখা 'জুনোমিয়া' বইটি আবার ভাল করে পড়ে ফেলেন। পড়লেন লামার্কের লেখা। চার্লসের হাতে আসে হাম্‌বোল্ড-এর 'পার্সোন্যাল ন্যারেটিভ'। অনুপ্রাণিত হন চার্লস। তারপর পড়েন হারসেলের লেখা 'ইনট্রোডাকস্‌ন টু দি ষ্টাডি অফ ন্যাচারাল ফিলজফি'। তিনি পরে লিখেছেন, 'প্রকৃতিবিজ্ঞান পঠনে এই দুটি লেখার বিনীত অবদান আমাকে তখন উৎসাহ উদ্দীপনার তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল।'

জানুয়ারী মাসে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চার্লস। অধ্যাপক হেনস্লো তাঁকে ভূতত্ত্ববিদ্যা পড়তে উৎসাহ যোগান। এবার গরমের ছুটিতে অধ্যাপক সেজউইকের সঙ্গে ডারউইন ভূতত্ত্ববিদ্যার উপর শিক্ষামূলক ভ্রমণে ওয়েলস-এ যান।

১৮৩১ সাল। বাইশ বছরের সদ্য-যুবক চার্লসের জীবন মোড় নিতে শুরু করল ভবিষ্যতের ডারউইন হওয়ার দিকে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ সেরে আসার পর হেন্‌স্লোর সুপারিশে, 'এইচ এম এস বিগ্‌ল্‌' জাহাজের দীর্ঘ অভিযানে শরিক হন চার্লস—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে। 'এইচ. এম. এস বিগল' জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর ঠিক হয়—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি এই ভ্রমণে যাবেন, কিন্তু কোন মাসোহারা পাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সুযোগ

গ্রহণ করেন। বিগ্‌ল্‌ জাহাজের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগের মানচিত্র তৈরির কাজে সাহায্য করা, আর দুই, যথাযথভাবে দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ করা। ছেলেকে ঐ দীর্ঘ যাত্রায় ছেড়ে দিতে প্রথমে রাজি হতে পারেন নি রবার্ট ডারউইন। অনেক টালবাহানার পর, অবশেষে রাজি হন তিনি। প্লিমাউথ বন্দর থেকে ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে যাত্রা শুরু করে বিগ্‌ল্‌। ভবিষ্যতের পথে যাত্রা শুরু হয় চার্লস ডারউইনের।

ডারউইনের নিজের কথায়—বিগল জাহাজে সমুদ্রযাত্রা আমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা আমার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এম এস বিগ্‌ল্‌-এর দীর্ঘ যাত্রা—১৮৩১-এর ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮৩৬-এর ২ অক্টোবর। ঠিক পাঁচ বছর পরে ফল্‌মাউথ বন্দরে নোঙর করেছিল বিগ্‌ল্‌। এই পাঁচ বছর সে ছুঁয়ে এসেছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, টিয়েরা দেল ফুয়েগো, উরুগুয়ে, পাটাগোনিয়া, চিলি, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, অতিক্রম করেছে প্রশান্ত মহাসাগর, স্পর্শ করেছে নিউজিল্যান্ডক, অস্ট্রেলিয়াকে, তারপর ভারত মহাসাগরের বুক চিরে মুখ ফিরিয়েছে দেশের দিকে, কেপটাউন, সেণ্ট হেলেনা হয়ে ফলমাউথের ঠিকানায়।

এই সুদীর্ঘ পথে ডারউইন দেখে এসেছেন পৃথিবীর কিছু গহনতম অঞ্চল, সংগ্রহ করেছেন প্রচুর উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মথ ও প্রজাপতি, শামুক, পাথর, জীবাশ্ম, আর সঞ্চয় করেছেন বিপুল অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের চতুষ্পদীদের প্রচুর জীবাশ্ম আর গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের বহুবিচিত্র প্রজাতিগুলো গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাকে। বলা যায়, এই গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের প্রজাতিগুলোই ছিল ডারউইনের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার মূল উৎস।

শুরু হয় ডারউইনের লেখালিখি। প্রকাশিত হয় জার্নাল অফ্‌ রিসার্চেস, জুওলজি অফ দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিগ্‌ল্‌, দি স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিসট্রিবিউসন অফ কোরাল রিফ্‌স এবং জিওলজিকাল অবজারভেসন অন ভলকানিক আইল্যান্ড অ্যান্ড অন সাউথ আমেরিকা। ফিরে আসার কয়েকবছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল এগুলো। সমুদ্রযাত্রার শুরুতেই, কেপ ডি ভারডে আর্কিপেলাগোতে অবস্থিত সেনট জ্যাগো দ্বীপে ভ্রমণের সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকা সহ যে-সব দেশ ভ্রমণ করেছেন তাদের ভূতাত্ত্বিক গঠনপ্রণালী, বিস্তর পরিমাণে সংগৃহীত চতুষ্পদীদের হাড়গোড় এবং ফসিলের উপর একখানা বই লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভ্রমণের আগে তিনি লিল্‌ এর 'প্রিন্সিপলস্‌ অব জিওলজি' বইটির প্রথম খণ্ডটি পড়েন এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞানে মূলসূত্র ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা লাভ করেন। ভ্রমণ শেষে ফিরে আসবার পর তিনি ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের একজন হাতে-কলমে শিক্ষা পাওয়া তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন। অচিরেই এসব বিষয়ের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হন এবং জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সম্পাদকের পদে তাঁকে মনোনীত করা

নতুন তত্ত্ব ডারউইনের সামনে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে তখনও দ্বিধান্বিত তিনি। আরও ভাবছেন, যাচাই করছেন, হিসেব মেলাচ্ছেন! প্রায় বিশটা বছর দ্বিধার দরিয়ায় ভেসেছেন ডারউইন। অবশেষে, ১৮৫৮ সালের এক বিশেষ ঘটনায়, দ্বিধা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। সে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু এক প্রকৃতিবিজ্ঞানী —আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

হামবোল্ডের 'পার্সোন্যাল ন্যারেটিভ' আর ডারউইনের 'জার্নাল অফ রিসার্চেস' পড়ে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তরুণ ওয়ালেস। অজানা প্রকৃতির খোঁজ নিতে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রাজিলে, তারপর একে একে আরও অনেক জায়গায়। সঙ্গী ছিলেন তাঁর বন্ধু প্রকৃতিবিজ্ঞানী এইচ. ডব্লিউ. বেট্‌স্। ডারউইনের প্রজাতি বিষয়ক চিন্তার কথা জানা ছিল না ওয়ালেসের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ আর গভীর চিন্তা-ভাবনার পথ বেয়ে তিনি স্বাধীনভাবেই পেঁছিতে পেরেছিলেন প্রায় একই তত্ত্বের দুয়ারে—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ বিবর্তনের তত্ত্বে। মনে রাখা দরকার, ডারউইন আর ওয়ালেসের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও, ফারাকও কম ছিল না। ম্যালথাসের তত্ত্ব চিন্তার সূত্র যুগিয়েছিল ওয়ালেসকেও।

সালটা ১৮৫৮, ডারউইন তখন প্রকৃতিবিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে ডারউইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ওয়ালেস (On the Tendeney of varietis to depart indefinitly from the original type)।

নাড়া খেলেন ডারউইন। তাঁর বহু শ্রমার্জিত তত্ত্বের জগতে আর একজন পেঁছে গেছে স্বাধীনভাবেই! নিজের তত্ত্ব প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি। লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সামনে পড়া হল ওয়ালেসের প্রবন্ধ আর ডারউইনের অপ্রকাশিত রচনার কিছু বাছাই করা অংশ, যা পরে 'অরিজিন অফ স্পিসীজ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সোসাইটির মুখপত্রে ছাপা হল তাঁদের দুজনের রচনা, 'অন দ্য টেনডেন্সি অফ স্পিসীজ টু ফর্ম ভ্যারাইটিস' এবং 'অন দ্য পার্পেচুয়েশন অফ ভ্যারাইটিস অ্যাণ্ড স্পিসীজ বাই ন্যাচারাল মিন্‌স্ অফ সিলেকশন' নামে।

তারপরের বছর, ১৮৫৯ সালে, পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে সংযোজিত হল এক আশ্চর্য, ইতিহাস-কাঁপানো সম্পদ: অরিজিন অফ স্পিসীজ! মানবজাতির ভাবনা-জগৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেল, গিয়ে পেঁছিলো এক নতুন স্তরে, নতুন মাত্রায়। প্রজাতির বিবর্তন, তার ইতিহাস, রূপান্তর—সব কিছুর প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হল প্রাকৃতিক নির্বাচন।

সৃষ্টি হল ভয়ানক আলোড়ন বিতর্ক উঠল প্রচুর। কোন এক আদি জীব থেকেই পরবর্তীকালের সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠল (সব বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি)। সারা দেশের ধর্মগুরুরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এই তত্ত্ব খ্রীশ্চিয়ান ধর্ম বিরুদ্ধ, সৃষ্টি তত্ত্বকে যে

অস্বীকার করছে—এইসব বলে ডারউইনের তত্বকে আক্রমণ করা হলো। অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন বসল ১৮৬০ সালে। সেখানে মুখোমুখী দাঁড়াল দুই যুযুধান পক্ষ। ডারউইনের মতের পক্ষে থমাস হেনরি হাক্সলে আর জোসেফ হুকার, বিপক্ষে অক্সফোর্ডের বিশপ ডঃ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স (যাঁকে পিছন থেকে মদত যুগিয়েছিলেন রিচার্ড ওয়েন)। টানা চার ঘণ্টা বিতর্কের শেষে, মাথা নিচু করে সরে যেতে হয়েছিল উইলবারফোর্সকে।

তেরো বছরের মধ্যে ছ'টা সংস্করণ বেরোল অরিজিন অফ স্পিসীজের। এরই মধ্যে প্রকাশিত হল নৃতত্ব এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপর আরো অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হল, 'দি ভ্যারিয়াস কনট্রিভানসেস বাই হুইচ অর্কিড আর ফার্টিলাইজইড বাই ইনসেক্টস, অ্যাণ্ড দি গুড এফেক্টস অফ ইনটার-ক্রসিং'; ১৯৬৮ সালে 'ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্টস আণ্ডার ডোমেস্টিকেশন', এবং ১৮৭১ এ এই বহুল-আলোচিত 'ডিসেণ্ট অফ ম্যান।' তারপর একে একে—'দি এক্সপ্রেসন অফ ইমোসন ইন ম্যান অ্যাণ্ড অ্যানিম্যাল' ১৮৭২, 'ইনসেক্টিভোরাস প্ল্যাণ্টস' ১৮৭৫, 'দি এফেক্টস অফ ক্রস অ্যাণ্ড সেল্ফ ফার্টিলাইজেসন ইন দি ভেজিটেবল কিংডম', ১৮৭৬, দি ডিফারেনট ফরমস অফ ফ্লাওয়ারস ইন প্ল্যানটস অফ দি সেম স্পিসীজ', ১৮৭৭; 'দি পাওয়ার অফ মুভমেণ্ট ইন প্ল্যাণ্টস,' ১৮৮০; ফরমেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থ্রু দি একসন অব ওয়ারমস', ১৮৮১।

জীবনের শেষ বছরগুলোতে ডারউইন নিজেকে বেশি করে ব্যস্ত রেখেছিলেন বিভিন্ন উদ্ভিদ আর ছোটখাট পোকা-মাকড় সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজে। ১৮৭৬ সালে লিখেছিলেন সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী।

শরীর ভেঙেছিল অনেক আগেই। পঙ্গুত্ব তাঁর শরীরকে গ্রাস করেছিল অনেকটাই। ইনভ্যালিড্'স্ চেয়ারে বসে চলাচল করতে হয়েছে বহু বছর। অবশেষে, ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে, সব প্রচেষ্টা-সাফল্য-যন্ত্রণার অবসান। মারা গেলেন চার্লস ডারউইন। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি-তে নিউটনের সমাধির খুব কাছাকাছি, সমাহিত হলেন ডারউইন। অন্তিমযাত্রায় মাথা নিচু করে হেঁটে গেলেন প্রিয় অনুরাগীরা—হাক্সলে, হুকার আর আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।

ডারউইনোত্তর একশ বছরে পৃথিবী অনেক পরিবর্তন, অনেক নতুন-কিছু-জানার সাক্ষী। তাঁর সময়ের জীববিদ্যা আজ প্রায় শতশাখায় বিভক্ত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষনার প্রচুর নতুন তথ্য হয়েছে আবিষ্কৃত এবং নতুন নতুন তত্বের আলোয় এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। জীববিদ্যা, জীব-রসায়নবিদ্যা, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি, সৃষ্ট জীবনকে ইচ্ছামতো পরিবর্তনের অধিকারী আজ মানুষ। আজ প্রকৃতির উপরে কিছুটা আধিপত্য বিস্তার

করতে পারছে মানুষ ক্লোনিং, মিউটেশন তত্ত্ব এবং নিউক্লিয়ার বায়োলজি করায়ত্ত করার দৌলতে।

১৮৫৯ সালে 'অরিজিন অফ স্পিসীজ' প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস। পরের বছর এ বইয়ের পাতায় মগ্ন হন কার্ল মার্কস। ১৮৬০ সালের ১৯ ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস লিখেছেন: 'আমাদের ধারণার প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক বনিয়াদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই গ্রন্থটি।' এঙ্গেলস তাঁর 'ডায়ালেকটিকস্ অফ নেচার' লিখতে গিয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জগতে তিনটি ঘটনাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন—জীবকোষ আবিষ্কার, শক্তির সংরক্ষণ ও তার রূপান্তরের নিয়ম আবিষ্কার, আর ডারউইনের আবিষ্কার। অর্থাৎ, মার্কস-এঙ্গেলসের চোখে চার্লস ডারউইনের আবিষ্কার ছিল এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার তার পাশাপাশি, ডায়ালেক্টিকস্ অফ নেচার-এর পৃষ্ঠায় ডারউইনের কিছু সমালোচনাও করেছেন এঙ্গেলস। অস্তিত্বরক্ষা বা উদ্বর্তনের জন্য সংগ্রামের ওপর একপেশেভাবে অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন ডারউইন, যা এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গীতে সঠিক বলে মনে হয় নি। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধেও কিছুটা ভিন্ন মত ছিল এঙ্গেলসের। সদস্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তাতে সবথেকে শক্তিশালীরাই প্রধানত টিকে থাকলেও, অন্য অনেক দিকের বিচারে দুর্বলতমরাও পারে টিকে থাকতে—বলেছেন তিনি। আরও বলেছেন, অজৈব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শুধু সংঘাতই থাকে না, সামঞ্জস্যও থাকে; জৈব প্রকৃতির বস্তুগুলোর মধ্যে সচেতন ও অসচেতন সংগ্রামের পাশাপাশিই অবস্থান করে সচেতন ও অসচেতন সহযোগিতাও। আর তাই, এমনকি প্রকৃতির ক্ষেত্রেও, চিন্তার নিশানে শুধু "সংগ্রাম" লিখে রাখাটা তাঁর মতে নেহাতই একপেশে ধারণা। বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার কারণ, পরিবেশের ভূমিকা, বিপাক-ক্রিয়ার ভূমিকা—এ-সব বিষয়েও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন এঙ্গেলস। প্রশ্ন তুলেছেন ম্যালথাসের তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও। তবু, সমালোচনার পাশাপাশিই, মানবদেহের শারীরস্থানবিদ্যা, তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, জীবাশ্মতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা—সব কিছুর ভিত্তি হিসেবে এঙ্গেলস চিহ্নিত করেছেন প্রজাতিতত্ত্বকেই, অকৃত্রিম স্বাগত জানিয়েছেন ডারউইনের আবিষ্কারকে। বলে রাখা ভালো, ডায়ালেক্টিকস্ অফ নেচার লেখার সময় 'অরিজিন অফ স্পিসীজ' ছাড়াও এঙ্গেলস সাহায্য নিয়েছিলেন এই 'ডিসেণ্ট অফ ম্যান' গ্রন্থেরও।

ডারউইনের ভাবনা-চিন্তার অনেক জায়গা আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় পরিত্যক্ত, সংশোধিত হয়েছে, আবার কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়ে আজও চলছে বিতর্ক, গবেষণা। ডারউইন নিজেই লিখে গেছেন—'আমি জানি, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হবে…মানুষের উদ্ভব আর

মানবজাতির ইতিহাসের ওপর এসে পড়বে আরও উজ্বল আলোকরশ্মি।' এ কথা লিখতে পেরেছিলেন ডারউইন, কারণ সামনে এগিয়ে চলাই সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য। নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন চিন্তাই এগিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীকে, ইতিহাসকে, মানবজাতিকে।

তবু, সমস্ত সমালোচনা সত্বেও, এটা অনস্বীকার্য যে আধুনিক জীববিদ্যার বনিয়াদ যিনি গড়ে দিয়ে গেছেন তাঁর নাম চার্লস ডারউইন। পৃথিবীর ইতিহাসে ডারউইন এবং তাঁর বিবর্তন তত্ত্বের মৃত্যু নেই॥

শিবপুর, হাওড়া-২ **অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়**

চৈত্র ১৩৯৫

ডিসেণ্ট অব ম্যান

চার্লস ডারউইন

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নশ্রেণীর কোন জৈবিক গঠন থেকে মানুষরূপে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণাবলী ঃ

মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক প্রমাণাবলীর প্রকৃতি—মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অনুরূপ অঙ্গসংস্থান—পারস্পরিক সাদৃশ্যের বিবিধ বিষয়—ক্রমোন্নতি—আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সংস্থান —মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, চুল, অস্থি, জননেন্দ্রিয়, ইত্যাদি—মানুষের উৎপত্তি বিষয়ক তিনটি বিরাট শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তথ্যের বিন্যাস।

মানুষ পূর্বোদ্ভূত নিম্নশ্রেণীর কোন প্রজাতির বিবর্তিত উন্নততর রূপ—একথা যিনি বিশ্বাস করেন, সম্ভবত তিনি প্রথমেই জানতে চাইবেন, যে শারীরিক গঠন ও মানসিক গুণের বিচারে, তা সে যতই সামান্য হোক না কেন, মানুষ তাদের থেকে কোনরূপ ভিন্নতা পোষণ করে কিনা। যদি তাই হয়, তবে নিম্নশ্রেণীর জীবদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মানুষের বেলাতেও সেটা বংশগতভাবে বর্তায় কিনা। আবার এই ভিন্নতা কি আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী অন্য প্রাণীদের মতো একই সাধারণ কারণজনিত কোনো ফল, এবং তারা কি একই নিয়মের বশবর্তী, যেমন শরীরের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কোন অঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল স্বরূপ বংশগত ভাবে তার প্রভাব, ইত্যাদি ? মানুষ ও কি একইভাবে অঙ্গের অসংগতিতে, ক্রমবিকাশের সীমাবদ্ধতায় তার পূর্বতন বা আদিম অবস্থার দৈহিক গঠনের কোন ব্যতিক্রম নিয়মে পুনরায় ফিরে যেতে পারে ? খুব স্বাভাবিকভাবেই এটাও নিশ্চয় জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে মানুষ কি অন্যান্য বহু প্রাণীর মতো বিভিন্ন প্রকার ও উপজাতির মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে তফাৎ অতি সামান্য আবার কখনো কখনো এত বেশি যে তাদের সন্দেহজনক প্রজাতি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে ? কীভাবে এই জাতিগুলি পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে ; এবং যৌন মিলনের পরে কীভাবে তারা প্রথম এবং পরবর্তী বংশধারায় পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে ? এই ভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে ক্রমশ উপস্থিত হয়। প্রশ্নকর্তা এরপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চলে আসবেন, মানুষের মধ্যে কি দ্রুতহারে বংশবৃদ্ধির প্রবণতা আছে, কারণ টিঁকে থাকবার জন্য তাকে যে কঠিন জীবনসংগ্রাম করতে হয় এবং তার ফলস্বরূপ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে রক্ষা পাচ্ছে সবলের দল আর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যারা দুর্বল ? তবে কি মানুষের সব জাতি অথবা প্রজাতি, যে পদ-ই ব্যবহার করা হোক না কেন, জোর করে একে

অন্যকে সরিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে, কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে? আমরা দেখব এই সমস্ত প্রশ্নের, যা বাস্তবিকপক্ষে তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, একটিই উত্তর হবে, হ্যাঁ, ঠিক নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিয়মপদ্ধতির মতোই। এখানে উল্লিখিত কিছু প্রশ্নের আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখব এবং প্রথমে আমরা দেখব যে মানুষের শারীরিক গঠনে কম-বেশি এমন কোন চিহ্ন আছে কিনা, যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় মানুষের উদ্ভব কোন নিম্নশ্রেণীর জৈবিক রূপ থেকে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মানুষের মানসিক শক্তির সাথে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে।

মানুষের শারীরিক গঠন: এটা শুনতে বেশ খারাপ লাগারই কথা যে মানুষের শারীরিক গঠন ঠিক অন্যান্য স্তন্যপায়ীজন্তুর আকার বা গড়নের মতোনই। তার কাঠামোর সমস্ত হাড়কেই বাঁদর, বাদুড় বা সীল মাছের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তুলনা করা যায় তার পেশীতন্তু, স্নায়ুতন্তু, রক্তবাহী নালি বা শরীরের অন্তবর্তী অন্যান্য অংশের সঙ্গেও। শরীরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মস্তিষ্কও যে এই একই নিয়ম মেনে চলে সেটাও প্রফেসার হাক্সলি ও অন্যান্য শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিয়েছেন। বিশোফ (Bischoff) এর মতো একজন বিরোধী সমালোচকও স্বীকার করেছেন যে মানুষের মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রধান অংশ ও ভাঁজের সাথে ওরাংওটাং-এর মস্তিষ্কের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি মনে করেন উভয়ের মস্তিষ্কের বিকাশের ধারা একই বা উভয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে এমনটি আশা করা অন্যায় হবে, কারণ, তাহলে তো তাদের বোধ বুদ্ধি, বিবেচনাও একই রকমের হতো। ভালপিয়ান (Vulpian) মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের সঙ্গে বনমানুষের মস্তিষ্কের সত্যিকারের তফাৎ খুব কম। এই ব্যাপারে যেন কেউ ভুল না করেন যে মস্তিষ্কের চরিত্র, করোটির গঠন ও আকারে মানুষের অবস্থান একেবারে বনমানুষের কাছাকাছি। তাছাড়া বেবুন ও সাধারণ জাতের বাঁদরের সঙ্গেও করোটির গঠনে মানুষের যথেষ্ট মিল রয়েছে।' কিন্তু মস্তিষ্কের গঠন বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয়ে মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা এখানে অর্থহীন মনে হতে পারে।

যাইহোক, শারীরিক গঠনের সাথে সরাসরি বা সুস্পষ্ট কোন সম্বন্ধ না থাকলেও দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে এই যোগাযোগ বা সম্পর্ক বেশ ভালো ভাবে দেখানো যেতে পারে।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের থেকে কিছু রোগ যেমন মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তেমনিই মানুষও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রোগের কারণ, যেমন জলাতঙ্ক, বসন্ত, সিফিলিস, কলেরা ও চর্মরোগ ইত্যাদি। এই তথ্য উভয়ের মধ্যেকার স্নায়ুকলা ও রক্তের মুখ্য গঠন ও উপাদানের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের প্রমাণ স্বরূপ, এবং এটা যাচাই করে দেখবার জন্য সবচেয়ে সংবেদনশীল অনুবীক্ষণ বা সবচেয়ে ভালো রাসায়নিক বিশ্লেষণের দরকার হয় না। আমাদের মতে বাঁদরদেরও কিছু রোগ হয় যেগুলি আদৌ সংক্রামক নয়। অধ্যাপক রেঙ্গার (Rengger) সেবুস এজারে (Cebus Azarae) নামে একশ্রেণীর বাঁদরকে তাদের আবাসস্থলে রেখে দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে তারা সর্দিতে ভোগে এবং তার সাধারণ লক্ষণগুলি মানুষের ক্ষেত্রেও একই। ঘন ঘন সর্দি হবার ফলে তারা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া এই ধরণের বাঁদররা সন্ন্যাস রোগ, পেট ফুলে যাওয়া এবং চোখে ছানি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। শৈশবে দুধের দাঁত পড়ার সময় প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তারা। এদের উপর ওষুধের ক্রিয়াও ঠিক আমাদেরই মতো। কোন কোন জাতের বাঁদরদের আবার চা, কফি এবং উৎকৃষ্ট মদের উপর দারুন লোভ। আমার নিজের চোখে দেখা যে তারা খোশমেজাজে ধূমপান করে।[১] ব্রেহম (Brehm) একে সমর্থন করে বলেন যে উত্তর পূর্ব আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীরা বুনো বেবুনদের ধরবার জন্য কড়া দেশজ মদ ভর্তি পাত্র টোপ হিসেবে ব্যবহার করে, কারণ তারা তা খেয়ে সহজেই মাতাল হয়ে পড়ে। তিনি এই ধরনের মাতাল বাঁদরকে আটক রেখে পরীক্ষা করে তাদের ব্যবহার ও আশ্চর্য মুখভঙ্গী সম্পর্কে নানা মজাদার তথ্য পেশ করেছেন। পরের দিন সকালে তারা অত্যন্ত হতাশ ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে। তখন বিয়ার বা মদ দিলে তারা বিরক্তি প্রকাশ করে কিন্তু লেবুর জল পেলে তারিয়ে পান করে। এটেলেস (Ateles) জাতীয় একটা আমেরিকান বাঁদর একবার ব্রান্ডি খেয়ে মাতাল হবার পর আর কখনো তা স্পর্শ পর্যন্ত করেনি! দেখা যাচ্ছে তারা কখনো কখনো মানুষের চেয়েও সুবিবেচক। এই সমস্ত সামান্য ঘটনা প্রমাণ করে মানুষ ও

১। জীব জগতের খুব নীচু স্তরের কিছু কিছু প্রাণীর ঐ সকল বস্তুর প্রতি একইরকম আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। মিঃ এ. নিকেলস আমাকে জানিয়েছেন, তিনি অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে ফ্যাসিওলারক্টাস সিনেরাস (Phaseolarctus cinereus) নামে তিনটি নিম্নশ্রেণীর বাঁদর জাতীয় প্রাণীতে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে তারা কোনরকম অনুশীলন ছাড়াই মদ ও ধূমপানের প্রতি তীব্র আসক্তি প্রকাশ করেছে।

বাঁদরের স্বাদের অনুভূতি কত কাছাকাছি এবং উভয়ে স্নায়ুতন্ত্র কিরকম একইভাবে কাজ করে।

মানুষের দেহে অভ্যন্তরস্থ পরজীবী জীবাণুর আক্রমণ কখনো কখনো তার মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া, বহিঃস্থ পরজীবীরাও নানা ভাবে আক্রমণ করে। একই জাতি বা বংশের অন্তর্ভুক্ত পরজীবীরা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরও আক্রমণ করে, একই শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষ বা অন্য জীবদের খোসপাঁচড়াও এদের আক্রমণের ফলস্বরূপ। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব, পাখি, এমনকি পোকামাকড়দের বেলাতেও যেমন দেখা যায়, মানুষও ঠিক তাদেরই মতো গর্ভধারণ, রোগের আক্রমণ ও স্থায়িত্ব ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েই একই রহস্যময় নিয়মের অনুবর্তী এবং চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে-কোন ক্ষত আরোগ্যলাভের পথে প্রায় একই উপায়ে সেরে ওঠে এবং অঙ্গছেদনের পর কোন ক্ষত সৃষ্টি হলে, বিশেষ করে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায়, ক্ষতস্থান কিছুটা পুনর্গঠিত হয়, ঠিক যেমনটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বেলাতেও ঘটে থাকে।

জীবের জন্ম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, পুরুষের প্রণয় নিবেদন থেকে শুরু করে জন্মক্ষণ ও লালন-পালন, আশ্চর্যজনকভাবে সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী দের ক্ষেত্রে একইরকম। বাঁদরও মানুষের বাচ্চার মতো প্রায় একইরকম অসহায় অবস্থার মধ্যে জন্মায়। কোন কোন জাতের বাঁদর আবার মানুষের মতোই শৈশবে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক বাপ-মায়ের মত দেখতে হয় না। কেউ কেউ বেশ জোর দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখান এই বলে যে অন্যান্য জীবের তুলনায় মানবশিশুর বড় হতে কিছু বেশি সময় লাগে। কিন্তু যদি আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষদের লক্ষ করি তবে দেখব এই প্রভেদ এমন কিছু বেশী নয়। কারণ একটি ওরাং শিশু দশ থেকে পনেরো বছরের পূর্বে যৌবন লাভ করে না। তুলনামূলক ভাবে, অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষেরা দেহের ওজন, আকার, চুলের পরিমাণ ইত্যাদিতে তাদের জাতের মেয়েদের থেকে আলাদা, উভয়ের মানসিক গঠন ও প্রভেদ প্রচুর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উচ্চশ্রেণীর জীব বিশেষ করে বনমানুষে-রা, দৈহিক গঠন, ছোট ছোট পেশীতন্তুর গঠন, জীব রাসায়নিক গঠন, মানসিক গঠন প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের খুব কাছাকাছি জায়গায় রয়েছে।

ভ্রূণের ক্রমবিকাশ : মানুষের ভ্রূণ যেটা প্রায় এক ইঞ্চির একশ পঁচিশ ভাগ ব্যাসবিশিষ্ট ডিম্বাণু থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়; কোন অর্থেই সেটা অন্য প্রাণীদের ডিম্বাণু থেকে আলাদা নয়। মানুষের ভ্রূণকে প্রাথমিক অবস্থায় মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে চেনা প্রায় অসম্ভব। এই সময় শরীরের রক্তবাহী

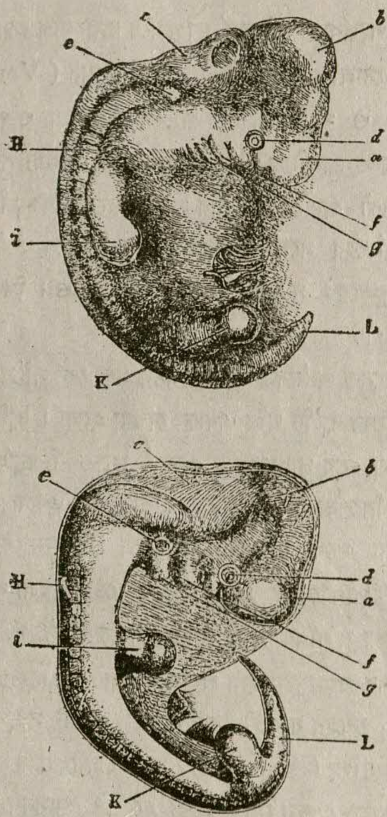
ধমনীগুলো ধনুকের মতন বাঁকানো অবস্থায় থাকে, কারণ ব্রনক্রিয়া-তে (branchiae) রক্ত পাঠাবার জন্য এমন ব্যবস্থাপনা। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এরকম কোন ব্যবস্থা না থাকলেও দেখা যায় তাদের গলার কাছে (১নং ছবি, f & g) পূর্বাবস্থার নিদর্শন হিসেবে চেরা দাগ রয়ে গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে হাত-পায়ের ক্রমোন্নতি ঘটে। বিখ্যাত ভন্ বেয়ার (Von Baer) উল্লেখ করেছিন, 'সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের পা, পাখীর ডানা ও পা ঠিক মানুষের হাত-পায়ের মতো একই প্রাথমিক গঠন থেকে সৃষ্ট।' অধ্যাপক হাক্সলি বলেন, 'ভ্রূণবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে বাঁদরের কিছু কিছু প্রভেদ চোখে পড়ে। অন্যদিকে বাঁদরের সঙ্গে কুকুরের ভ্রূণের বিকাশে যতটাই তফাৎ ততটাই প্রায় চোখে পড়ে কুকুরের সাথে মানুষের বেলাতেও। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি আশ্চর্য মনে হলেও এটি পরীক্ষিত সত্য!'

যেহেতু এই বইএর অনেক পাঠকের ভ্রূণের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই, তাই মানুষ ও কুকুরের ভ্রূণের দু'টি ছবি এখানে দেওয়া হলো। দুটিই বিকাশ লাভের প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্র, খুব সাবধানে আর যতদূর সম্ভব নির্ভুল ভাবে অনুকৃত।[২] উচ্চ পর্যায়ের বহু বিশেষজ্ঞদের মতামত রাখার পর, একগাদা ধার করা তথ্যের সাহায্যে এটা আমার পক্ষে দেখানো অর্থহীন যে মানুষের ভ্রূণ অবিকল অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই মতো। তবে এটুকু বলা যায় যে মানুষের ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ভ্রূণবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় হৃৎপিণ্ড বলতে শুধুমাত্র একটি ধুক্‌ধুক্ করা যন্ত্রকে বোঝায়; দেহের যাবতীয় বর্জপদার্থ একটি সরুপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে; এবং অপুত্রিকাস্থি (os coccyx) সত্যিকারের লেজের মতো বেরিয়ে থাকে, প্রাথমিক অবস্থার পায়ের পেছন থেকে লম্বা হয়ে।[৩] শ্বাসযন্ত্র সম্বলিত সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে করপোরা উলফিয়ানা (Corpora Wolffiana) নামে

২। মানুষের ভ্রূণের ছবিটির জন্য অধ্যাপক একারের "আইকন ফিজিক্স" ১৮৫-১৮৫৯, সারণী ৩০, ছবি ২ দ্রষ্টব্য। ভ্রূণটি প্রকৃত মাপের চেয়ে দশগুণ বড় করে দেখানো হয়েছে। কুকুরের ভ্রূণটির জন্য অধ্যাপক বিশোফের "Entwicklungsgeschichte des Hunde-Eies" ১৮৪৫, সারণী ১১, ছবি ৪২ বি দ্রষ্টব্য। ছবিটি পঁচিশ দিন বয়সের একটি ভ্রূণের প্রকৃত মাপের চেয়ে পাঁচগুণ বড়। দুটি চিত্রেই অন্তর্বর্তী নাড়ী-ভুঁড়ি ও গর্ভাশয়ের উপাদনসমূহকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক হাক্সলির 'Man's place in nature' নামক বই থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী ছবি দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাপক হাকেলও তার 'Schopfungsgeschichte' নামক গ্রন্থে একইরকম ছবি ব্যবহার করেছেন।

৩। অধ্যাপক উইম্যান—'প্রোক্রেম অব আমেরিকান অ্যাকাডেমী অব সাইন্সেস':৪র্থ খণ্ড।

একটি গ্রন্থি থাকে যা দেখতে ও কাজে পরিণত মাছের বৃক্কের মতো।[৪] এমনকি ভ্রূণের বিকাশের শেষপর্যায়ে মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কিছু আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক বিশোফের মতে মানুষের ভ্রূণের সাত মাস বয়সের



১নং ছবি—উপরে মানুষের ভ্রূণের ছবিটি একারের (Ecker) কাছ থেকে দেওয়া। নীচে কুকুরের ভ্রূণের ছবিটি বিশোফের (Bischoff) কাছ থেকে পাওয়া।

a. সম্মুখ—মস্তিষ্ক, সেরিব্রাল হেমিস্ফেয়ারল্
b. মধ্য—মস্তিষ্ক, কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা
c. পশ্চাৎ—মস্তিষ্ক, সেরিবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা
d. চোখ
e. কান
f. প্রথম ভিসেরাল আর্চ
g. দ্বিতীয় ভিসেরোল আর্চ
h. মেরুদণ্ডী স্তম্ভ ও ক্রমোন্নতির স্তরে মাংসপেশী
i. সম্মুখবর্তী } হাত-পা
k. পশ্চাৎবর্তী } হাত-পা
l. লেজ বা অনুত্রিকাস্থি

৪। অধ্যাপক ওয়েন "অ্যানাটমি অব ভার্টিব্রেটস" প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩-।

সময় মস্তিষ্কের ভাঁজ একটি পূর্ণবয়স্ক বেবুনের মতো উন্নতির একই পর্যায়ে পেঁছায়। অধ্যাপক ওয়েন (owen) বলেন, 'পায়ের বুড়ো আঙুল যা দাঁড়াতে বা হাঁটতে আলম্ব হিসেবে কাজ করে, সম্ভবত মানুষের ভ্রূণের গঠনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।' কিন্তু প্রফেসর উইম্যান প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটি ভ্রূণকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, 'পায়ের বুড়ো আঙুল অন্যান্য আঙুলের চাইতে ছোট এবং তাদের সাথে সমান্তরালে না থেকে একপাশে বাঁকানো অবস্থায় থাকে, যা এ বিষয়ে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীদের স্বাভাবিক অবস্থার মতোই।' আমি অধ্যাপক হাক্সলি থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার ছেদ টানব। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মানুষ কি কুকুর, ব্যাঙ, পাখি বা মাছ থেকে স্বতন্ত্র কোন উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে? তিনি বলেন, 'এ প্রশ্নের নিঃসংশয়ে উত্তর একটাই, মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের ধারা তার চেয়ে নীচুমানের প্রাণীদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত। এ বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কুকুর ও বাঁদর অপেক্ষা বাঁদর ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক বেশী।'

মৌলিক বা প্রাথমিক অঙ্গ : এ বিষয়টি যদিও আগের দুটি বিষয়ের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু অন্য কারণে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। উচ্চশ্রেণীর এমন কোন একটি প্রাণীরও নাম করা যাবে না, যারা আদিম অবস্থার কোন অঙ্গ এখনও শরীরে বহন করে না, এমনকি মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গগুলিকে পরবর্তীকালে সৃষ্ট অঙ্গগুলি থেকে আলাদা করতে হবে, যদিও সব সময় কাজটি খুব সোজা নয়। হয় প্রাথমিক অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে [যেমন, পুরুষ চতুষ্পদীদের দুগ্ধগ্রন্থি বা জাবর-কাটা জন্তুদের কৃন্তক (incisor), যা মাড়ি কেটে বেরোতে পারেনি], নতুবা তারা নিকট অতীত ও বর্তমান প্রজন্মে এত সামান্য ব্যবহৃত হয়েছে যে বর্তমান অবস্থায় তারা আর বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অঙ্গগুলিকে অবশ্য সরাসরি প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বলা যায় না, কিন্তু তারা ক্রমে সেদিকেই এগোচ্ছে। অন্যদিকে পরবর্তীকালে সৃষ্ট বা বর্ধিষ্ণু অঙ্গগুলি (Nascent), সম্পূর্ণ বিকশিত না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রয়োজনের কারণে দারুণ সম্ভবনাপূর্ণ এবং প্রয়োজনে আরো বিকশিত হতে পারে। প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বস্তুত পরিবর্তনশীল ; যেহেতু তারা অকেজো বা প্রায়-অকেজো, ফলে তারা আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) অধীন নয়। একথা প্রায় সত্যি যে তারা লুপ্ত হওয়ার মুখে, তবুও কখনো কখনো তারা উল্টো পথে তাদের পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে যেতে পারে, যে কারণে বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য।

যে যে কারণে এই অঙ্গগুলি প্রাথমিক অবস্থায় থেকে গেছে তার মুখ্য কারণ হিসাবে বলা যায় বয়ঃপ্রাপ্তির কালে অঙ্গগুলির অব্যবহার, যে-সময়ে এদের ব্যবহৃত হওয়ার কথা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া, বংশগতির প্রভাব-জনিত কারণও আছে। অব্যবহার (disuse), মানে শুধু পেশীসমূহের কর্মক্রিয়ার হ্রাস নয়, শরীরের কোন অংশে বা অঙ্গে রক্তচাপের অদলবদলে রক্তপ্রবাহের স্বল্পতা বা কোন অঙ্গের অভ্যাসজনিত নিষ্ক্রিয়তার কথাও মনে রাখতে হবে। প্রাথমিক অঙ্গগুলি অনেক সময়ে কোন প্রজাতির স্ত্রী বা পুরুষে অকেজো অবস্থায় দেখা যেতে পারে, যা কিনা ঐ একই প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকতে পারে। ঐ আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলি (rudiments), আমরা পরে দেখব, প্রায়শ সৃষ্টি হয়েছে এখানে উল্লিখিত অঙ্গগুলি থেকে স্বতন্ত্র উপায়ে ! কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্যও অবলুপ্ত হয়েছে, কারণ প্রজাতির জীবনে পরিবর্তিত অভ্যাসের পক্ষে হয়তো সেটা ক্ষতিকর। হ্রাস বা অবলুপ্তির এই প্রক্রিয়া সম্ভবত ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধির মিতাচার (economy of growth),—এই দুটি মৌলিক নীতির উপর নির্ভরশীল। অঙ্গের ক্রমহ্রাসমানতার শেষ পর্যায়ে যখন অব্যবহারজনিত কারণে অঙ্গহ্রাস সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং বৃদ্ধির মিতাচারজনিত কারণও আর সক্রিয় নয়, সেই পর্যায়টিকে বুঝে ওঠা অবশ্যই দুরূহ। কোন অঙ্গ যা ইতিমধ্যেই অকেজো ও ক্ষুদ্রাকার হয়ে পড়েছে, তার চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ নিবারণ, যেক্ষেত্রে উপরিউক্ত নীতিদ্বয়ের কোন ভূমিকা নেই, সম্ভবত (hypothesis of pangenesis) প্যানজেনেসিস এর অনুমান দিয়ে বোঝা যায়। কিন্তু যেহেতু প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গের সম্পূর্ণ বিষয়টি আমার পূর্বেকার লেখায় ব্যাখ্যা সহকারে আলোচিত এবং তাই এ ব্যাপারে আমি এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করছি না।

মানব শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাথমিকঅবস্থার কিছু পেশীকে (rudiments) লক্ষ্য করা যায়,[৫] এবং তার সংখ্যাও খুব কম নয়। যেগুলিকে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের

৫। উদাহরণস্বরূপ, মিঃ রিচার্ড [(Annales des sciences Nat.) তৃতীয় শ্রেণী, প্রাণীত্ব; ১৮৫২, গ্রন্থখণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৩] সেই সমস্ত প্রাথমিক বা আদিম শারীর অংশের বর্ণনা ও ছবি দিয়েছেন, যাদের তিনি বলেছেন 'হাতের বংশানুক্রমিক (pedieux delamain) পেশী', যারা কখনো কখনো খুবই ছোট আকারের। অপর একটি পশ্চাৎবর্তী টিবিয়াল (be tibial) পেশী, সাধারণতঃ বর্ত্তমানে হাতে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে পেশীটিকে কম-বেশী আদিম বা প্রাথমিক অবস্থায় পুনরাবির্ভূত হতে দেখা যায়।

শরীরে স্বাভাবিক পেশী হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রায়শ খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় মানুষের শরীরে দেখা যায়। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে বহু প্রাণী বিশেষত ঘোড়া, তার শরীরের চিকন চামড়া সর্বত্র আশ্চর্যভাবে নাড়াতে বা কাঁপাতে পারে, এবং যা সম্ভব হয় প্যানিকিউলাস কারনোসাস্ (Panniculus Carnosus) নামক পেশীর জন্য। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে পেশীটির কার্যকারিতা দেখা যায়; যেমন কপালে—যার ফলে আমরা ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে পারি। প্লাটিস্মা মাইওডিস (platysma myoides) এইরকম গলার পেশী। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্নার জানিয়েছেন যে, শরীরের পাঁচটি ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত পেশীতন্তু, যেমন বগল, স্কন্ধাস্থির নিকটে, ইত্যাদি জায়গার সমস্ত পেশীগুলিই প্যানিকিউলাস পেশীব্যবস্থার অন্তর্গত। প্রায় ছশো মানবশরীর পরীক্ষা করে শতকরা তিনভাগ শরীরে তিনি দেখিয়েছেন যে বুকের খাঁচার উপরের পেশীতন্তুগুলি, যেমন মাস্কুলাস স্টারনালিস (musculus sternalis) অথবা স্টারনালিস ব্রুটোরাম (sternalis brutorum), যা পেটের পেশী রেক্টাস অ্যাবডোমিনালিসের (Rectus abdominalis) বর্ধিত অংশ নয়, কিন্তু প্যানিকিউলাস পেশীর সাথে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত। তিনি বলেন, "আদিম অঙ্গসংস্থান যে বিশেষ অবস্থানগত পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল, এই বক্তব্যের পক্ষে একটি চমৎকার উদাহরণ স্বরূপ হতে পারে এই পেশীটি (panniculus)।"

কোন কোন ব্যক্তির করোটির পেশী-সংকোচনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা থাকে এবং এই পেশীগুলো এখনও পরিবর্তনশীল হলেও অংশত প্রাথমিক বা আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। অধ্যাপক এম. এ. দ্য ক্যাঁদল আমাকে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা জানিয়েছেন যা দীর্ঘ কালের অধ্যবসায় বা বংশপরম্পরাগত ক্ষমতা যা এই পেশীটির এক অস্বাভাবিক বিকাশের চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। তিনি এমন একটি পরিবারকে জানেন, যে পরিবারের বর্তমান কর্তা যৌবনে করোটির চামড়া নাচিয়ে (পেশী সম্প্রসারণের সাহায্যে) কয়েকটি ভারী বই মাথার উপর থেকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারতেন এবং এভাবে তিনি বহু বাজী জিতেছেন। তার বাবা, কাকা, ঠাকুর্দা এবং তিন ছেলে সকলেই এই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। প্রায় আটপুরুষ আগে এই পরিবারটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়; সুতরাং এখানে উল্লেখ্য যে, এই পরিবারটির কর্তা অপর শাখাটির পারিবারিক কর্তার সাত-পুরুষের সম্পর্কিত জ্ঞাতিভাই। দ্বিতীয় শাখাটির বর্তমান কর্তা ফ্রান্সের অন্য একটি অঞ্চলে বসবাস করেন; তাকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি তৎক্ষণাৎ

তাঁর ঐ বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দেন। বর্তমানকালে একটি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় পেশীর এই বিশেষ ক্ষমতা ধরে রাখার পুরুষানুক্রমিক অধ্যবসায়ের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত, যা সম্ভবত সুদূর অতীতের মানবাকৃতির পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা প্রাপ্ত। কারণ দেখা যায় যে বাঁদরদের এই ক্ষমতা বর্তমান এবং তারা অনবরত এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাথার উপরকার চামড়াকে উঁচুনীচু করতে পারে।

বহির্ভাগের পেশী যা কানের বাইরের দিককে এবং অন্তর্ভাগের পেশী যা কানের ভেতরের দিকের বিভিন্ন অংশকে নাড়াতে সাহায্য করে, এখনো মানুষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বা আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে এবং এ সমস্তই প্যানিকিউলাস পেশী-ব্যবস্থার অন্তর্গত। আমি এমন একজন মানুষকে দেখেছি যে তার সম্পূর্ণ বহিঃকর্ণ সামনের দিকে নিয়ে আসতে পারে; দেখা যায় কেউ কেউ উপরের দিকে এবং পিছনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজন আমাকে বলেছিল যে যদি আমরা মাঝে মাঝে হাত দিয়ে কান ধরে সেদিকে একটু খেয়াল রাখি, তবে আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টার দ্বারা কান নাড়ানোর বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব। কান খাড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ফেরানোর ক্ষমতা নিসন্দেহে পশুদের একটি বড় গুণ যার দ্বারা তারা বুঝতে পারে কোন্ দিক থেকে বিপদ আসছে। কিন্তু আমি কখনো এমন কোন মানুষের কথা শুনিনি যার মধ্যে এই ক্ষমতা বর্তমান এবং যা কিনা তার কাজে লাগে। সমস্ত বহিকর্ণকে বিভিন্ন ভাঁজ ও সুস্পষ্ট চিহ্ন (হেলিক্স ও অ্যাণ্টিহেলিক্স, ট্রাগাস ও অ্যাণ্টিট্রাগাস, ইত্যাদি) সমেত একটি প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ বলা যেতে পারে, যা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে কান খাড়া করার সময় কোনরকম বোঝা না হয়ে কানকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করে। তথাপি, কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা যে এই অংশের (shell) কোমলাস্থি (cartilage) কম্পন সৃষ্ঠি করে শ্রবণ-স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু মিঃ টয়নবি[৬] এ বিষয়ে পরীক্ষিত তথ্যাদি পেশ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বহির্কর্ণের স্বতন্ত্র কোন কাজ নেই। শিম্পাঞ্জি ও ও ওরাং-ওটাংয়ের কান দেখতে অনেকটা মানুষের কানের মতো এবং প্রধান পেশীগুলিও একইরকম, যদিও সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত নয়। চিড়িয়াখানার

৬। "দি ডিজিজেস্ অব দি ইয়ার" বইয়ের লেখক জে. টয়নবি, এফ. আর. এস, ১৮৬০, পৃষ্ঠা ১২। প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক প্রেয়ার আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি পরবর্তীকালে কানের কাঠামোর কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং এই পুস্তকে উল্লিখিত প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আমাকে জানিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জি বা ওরাং-ওটাং কখনো তাদের কান নাড়াতে বা খাড়া করতে পারে না। এর থেকে বোঝা যায় মানুষের মতোই অন্তত কানের ক্ষেত্রে, এদের বহিকর্ণও একই প্রাথমিক বা আদিম পর্যায়ের অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত প্রাণীদের, মানুষের অন্যান্য পূর্বপুরুষের মতো, কান খাড়া করার ক্ষমতা কেন লোপ পেল, আমরা জানি না। যদিও আমি এবিষয়ে নিশ্চিত নই তবু এটা হতে পারে যে তারা বৃক্ষবাসী ও দারুণ শক্তিশালী হওয়ার জন্য খুব কম সময়েই বিপদের মধ্যে পড়ত; ফলে একটা দীর্ঘ সময় তাদের কান নাড়ানোর খুব একটা প্রয়োজন হয়নি এবং সম্ভবত এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের এ ক্ষমতাটি লোপ পেয়েছে। আকারে বড় আর শক্তিশালী পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে, সুদূর সামুদ্রিক দ্বীপের অধিবাসী হওয়ার ফলে তারা শিকারী জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং ক্রমে ডানা মেলে ওড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য মানুষ ও কিছু কিছু জাতের বাঁদরের কান নাড়ানোর অক্ষমতা অংশত পূরণ হয় কোন দিকের শব্দ শোনার জন্য তাদের মাথা ঘোরাতে পারার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। এটা বেশ জোর দিয়ে বলা হয় যে একমাত্র মানুষের কানেই লতি (lobule) আছে; কিন্তু "এর প্রাথমিক অবস্থা গরিলার মধ্যে দেখা যায়; এবং অধ্যাপক প্রেয়ার-এর কাছে আমি শুনেছি যে, নিগ্রো প্রজাতির মানুষদের মধ্যে কিন্তু এটার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি।"

প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিঃ উলনার বহিঃকর্ণের একটি ছোট্ট বৈশিষ্ট্যর কথা আমাকে জানান, যা তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন এবং তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। বিষয়টির তার প্রথম নজরে আসে পাকের (পরী বিশেষ) মূর্তি গড়ার সময়, যেখানে তিনি সরু ছুঁচলো কান (Pointed ears) তৈরী করেছিলেন। এই ঘটনা তাঁকে বিভিন্ন বাঁদরের এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে মানুষের কান নিয়ে পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করে। বৈশিষ্ট্যটি হলো ভিতরের দিকের ভাঁজ করা সীমা বা হেলিকস থেকে বার করা একটি ছোট ভোঁতা অংশের অদ্ভুত উপস্থিতি। এটা যাদের থাকে, জন্মের সময় থেকেই থাকে এবং অধ্যাপক লুড্‌ভিগ মেয়ার (Ludwig Meyer)-এর মতে মেয়েদের



২নং ছবি—মানুষের কান
ছাঁচ এবং অঙ্কণ মিঃ উলনারের।
a.—প্রক্ষিপ্ত বা উদ্‌গত বিন্দু

চেয়ে পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় বেশী। মিঃ উলনার হুবহু এরকম একটি মডেল তৈরি করেছেন এবং আমাকে তার একটা ছবি পাঠিয়েছেন (২ নং ছবি)। ভোঁতা অংশটি যে শুধু ভিতরের দিকে কানের কেন্দ্রাভিমুখে বেরিয়ে থাকে, তাই নয়, প্রায়ই বাইরের দিকে ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকে, ফলে সামনাসামনি বা পেছন থেকে লক্ষ করলে সহজেই চোখে পড়ে। এর কোন সুনির্দিষ্ট আকার নেই, অবস্থানও খুব নির্দিষ্ট নয়, এবং এমনকি এক কানে এর দেখা মিললেও অন্য কানে তা নাও থাকতে পারে। শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয় আমি এক স্পাইডার মাংকির (Ateles bcelzebuth) কানেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। ডঃ ই. রে ল্যাংকেস্টার হামবুর্গের চিড়িয়াখানায় এক শিম্পাঞ্জির কানেও এই একই জিনিস দেখেছেন। হেলিক্স স্পষ্টতই কানের ভিতরের দিকের ভাঁজ করা অংশের চূড়ান্ত সীমা এবং ভাঁজ করা অংশটি কোন না কোন ভাবে সম্পূর্ণ বহিঃকর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যার ফলে বহিঃকর্ন পিছন দিকে বরাবরের জন্য একই অবস্থানে থাকে। বেশ কিছু বাঁদর, যারা উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে পেঁছয়নি যেমন বেবুন ও ম্যাকাকাসক-এর কয়েকটি প্রজাতির কানের উপরিভাগ সামান্য ছুঁচালো এবং কানের প্রান্তসীমা মোটেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা নয়। কিন্তু বহিঃকর্ণের প্রান্তসীমা যদি এভাবে ভাঁজ করা থাকত, তাহলে কেন্দ্রাভিমুখী এই অংশটি ভিতরের দিকে এবং সম্ভবত বাইরের দিকেও কিছুটা উঁচু হয়ে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অংশের উৎপত্তির কারণও এই বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্যদিকে অধ্যাপক এল. মেয়ার সম্প্রতি প্রকাশিত তার একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে সম্পূর্ণ বিষয়টিই পরিবর্তনশীল এবং এই বেরিয়ে থাকা অংশগুলি তাদের দুপাশে অবস্থিত অন্তবর্তী কোমলাস্থির পুরোপুরি গড়ে না ওঠার কারণে সৃষ্ট। আমি স্বীকার করতে সম্পূর্ণ রাজী আছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে, যেমন অধ্যাপক মেয়ারের উল্লেখ্য উদাহরণ-গুলির মধ্যে প্রচুর ছোট ছোট ছুঁচালো অংশ আছে অথবা সমস্ত প্রান্তসীমাই যার সর্পিল। ডঃ এল, ডাউনের সহায়তায় আমি নিজেই মাইক্রোসেফ্যালাস (microcephalous) জাতীয় একটি জড়বুদ্ধির কান পর্যবেক্ষণ করেছি; যার প্রক্ষিপ্ত অংশটি হেলিক্সের বাইরে দিকে, অন্তবর্তী ভাঁজ করা প্রান্তসীমায় নয়, ফলে অংশটি কানের পূর্ববর্তী চূড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মতানুযায়ী বহিঃকর্ণে এই ধরনের ছোট ভোঁতা বিন্দু মানবাকৃতি উত্তরসূরীদের ছুঁচলো খাড়া কানের অবশেষমাত্র। এ ঘটনার পৌনঃপুনিকতা ও ছুঁচলো কানের ক্ষেত্রে ঐ অংশের অবস্থানগত সাদৃশ্য আমাকে

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছে। আমাকে পাঠানো একটি ফটোতে কানের এই অংশটি এত বড় যে অনুমান করে নিতে হয়, অধ্যাপক মেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, পরিসীমা বরাবর কোমলাস্থির সমবিকাশের ফলেই বহিঃকর্ণের আকার সুষম হয়ে থাকে এবং এখানে প্রক্ষিপ্ত অংশটি সমস্ত কানের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে। উত্তর আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী দুজন লোকের কানের উর্দ্ধতম প্রান্তসীমা মোটেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা নয়, বরং ছুঁচালো, এবং সাধারণ চতুষ্পদ জন্তুর কানের সঙ্গে তাদের নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এরকম আর একটি ক্ষেত্রে সাইনোপিথেকাস নিগার জাতীয় একটি বাঁদরের কানের সঙ্গে একটি মানবশিশুর কান তুলনা করে দেখা গেছে, যে আকৃতিগত ভাবে উভয়ে নিকট সম্বন্ধযুক্ত, যদি এই দুটি ক্ষেত্রে বহিঃকর্ণসীমা স্বাভাবিক নিয়মে ভাঁজ করা থাকত, তবে একটি অন্তর্বর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশ অবশ্যই গঠিত হত। আরো অন্তত দুটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাইরের আকৃতি এখনো খানিকটা ছুঁচালো হয়ে আছে,



৩নং ছবি—ওরাংওটাং-এর একটি পরিণত ভ্রূণ। হুবহু একটি ফটোর নকল, জীবনের প্রারম্ভিক সময়ে কানের গঠন দেখানোর জন্য।

যদিও উর্ধ্বাংশের প্রান্তসীমা স্বাভাবিকভাবেই ভিতরের দিকে ভাঁজ করা একটি বেশ সঙ্কীর্ণ অবস্থাতে। উপরের উডকাটটি (৩ নং ছবি) ভ্রূণাবস্থায় একটি ওরাংওটাং-এর ফটোর বিশ্বস্ত নকল) ডেঃ নীটশের পাঠানো)। লক্ষণীয় যে এই সময়ে ভ্রূনের কানের ছুঁচলো বহিঃরেখা প্রাপ্তবয়স্ক একটি ওরাওটাং এর কানের থেকে, যার সঙ্গে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের কানের মিল রয়েছে, কত আলাদা। এটা স্পষ্ট যে এই এরকম একটি কানের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র অংশের ভাঁজ, যদি বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক ভাবে পরিবর্তিত না হয়, ভিতরের দিকে প্রক্ষিপ্ত অংশ সৃষ্টি করবে। মোটের উপর, এটা এখনো পর্যন্ত আমার কাছে সম্ভবপর বলে মনে হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে, জিজ্ঞাস্য অংশগুলি, মানুষ

ও বাঁদর উভয়ের ব্যাপারেই পূর্ববর্তী অবস্থার নিদর্শন স্বরূপ।

নিক্‌টিটেটিং মেমব্রেন বা তৃতীয় চক্ষুপল্লব অতিরিক্ত পেশীতন্তু ও সুবিধাজনক গঠনকাঠামো সহ বিকশিত হয়েছে, বিশেষ করে পাখীদের ক্ষেত্রে এবং তাদের কাছে এর বিশেষ কার্যকরী গুরুত্ব রয়েছে, যেমন এর সাহায্যে খুব দ্রুত সমস্ত চক্ষু গোলককে ঢেকে নেওয়া যায়। কিছু সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী এবং কোন কোন মাছের মধ্যে যেমন হাঙর, এই একই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। স্তন্যপায়ী গোত্রের অন্তর্গত কিছু নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, যেমন হংসচঞ্চু বা ক্যাঙ্গারু, এবং সিন্ধু-ঘোটকের মতো কিছু উচ্চ-স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে এটি আশানুরূপ বিকাশ লাভ করেছে। কিন্তু মানুষ, চতুষ্পদী জন্তু এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এর অবস্থান, প্রায় সকল শারীরতত্ত্ববিদ্‌ কর্তৃক স্বীকৃত,প্রাথমিক বা আদিম অংশ হিসেবে, যাকে উপপল্লব (Semilunar fold) বলা হয়।[৭]

বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কাছে ঘ্রাণশক্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কখনো যেমন তৃণভোজী প্রাণীদের (ruminants) ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি বিপদসংকেত হিসাবে কাজ করে; মাংশাসী প্রাণীদের শিকার ধরতে তেমনি সাহায্য করে; আবার বুনো শুয়োরের মতো জন্তুদের দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি খুব সামান্যই প্রয়োজনে আসে, এমনকি কালো মানুষদেরও, যদিও তাদের মধ্যে এর বিকাশ সভ্য ও সাদা মানুষের তুলনাই অনেক বেশি। তথাপি, এটি তাদের বিপদ-বার্তা জানায় না, খাবার খুঁজতে সাহায্যও করে না, তীব্র দুর্গন্ধময় পরিবেশ এক্সিমোদের ঘুমে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না বা বর্বরদের ক্ষেত্রে অর্ধগলিত মাংস আহার থেকে নিবৃত্ত করে না। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে ঘ্রাণের অনুভূতি একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম এবং আমি এই ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হয়েছি একজন বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্‌কে পরীক্ষা করে, যার মধ্যে

৭। অধ্যাপক মূলারের এলিমেন্টস অব ফিজিওলজি, ইংরেজী ভাষান্তর, ১৮৪২, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১১৭। অধ্যাপক ওয়েন, অ্যানাটমি অব ভার্টিব্রেটস, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬০; ঐ একই বইতে সিন্ধুঘোটকের উপর, প্রোক্রিয়েশন ইন জুওলজিকাল সোসাইটি, ৮ই নভেম্বর, ১৮৫৪। আরো দেখুন আর নক্সের, গ্রেট আর্টিস্টস্ এ্যাণ্ড আনাটমিষ্ট, পৃষ্ঠা নং ১০৬। আদিম বা লুপ্তপ্রায় এই অংশটি দৃশ্যত ইয়োরোপের অধিবাসীদের তুলনায় নিগ্রো এবং অষ্ট্রেলিয়ানদের ক্ষেত্রে কিছু বড়। দেখুন কার্ল ভোগট্, লেক্‌চারস্ অন্ ম্যান, ইংরেজী ভাষান্তর, পৃষ্ঠা ১২৯।

৮। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের প্রখর ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে অধ্যাপক হাসবোল্ডের বক্তব্য যথেষ্ট পরিচিত, অন্যরাও তা সমর্থন করেছেন। মিঃ হুজো "Etudes sur les Fuculte's Mentales" ইত্যাদি, গ্রন্থখণ্ড ১ম, ১৮৭২, পৃষ্ঠা ৯১ জোর দিয়ে বলেন যে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে নিগ্রো এবং রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের ঘ্রাণানুভূতি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও যে-কোন ব্যক্তিকে চিনতে পারে। ডঃ ডব্লু, ওগল ঘ্রাণশক্তি ও শরীরের তৈলাক্ত অঞ্চলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বর্ণগত উপাদান এবং তৎসহ শরীরের চামড়ার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করেন। সেই জন্য, আমি পরবর্তী সময়ে বলেছি সাদা বর্ণের জাতিগুলির তুলনায় কালো বর্ণের জাতিগুলির ঘ্রানানুভূতি প্রখর ও সূক্ষ্ম। দেখুন তাঁর গবেষণাপত্রগুলি "মেডিকো-চিররেজিক্যাল ট্রানজাকসনস", লণ্ডন খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭৬।

এই অনুভূতি অত্যন্ত বেশি এবং তিনি তা প্রমাণও করেছেন। ক্রমবিবর্তনের নীতিতে যারা বিশ্বাস করেন, তারা একথা সহজে স্বীকার করতে চাইবেন না যে মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি এখন যে অবস্থায় আছে, তা মানুষের স্বোপার্জিত। উত্তরাধিকারসূত্রে এই বিশেষ ক্ষমতা সে খুবই দুর্বল ও প্রাথমিক অবস্থায় লাভ করেছে সেইসব আদিম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, যাদের কাছে ঘ্রাণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কার্যকরী ক্ষমতাবিশিষ্ঠ এবং নিয়মিত ব্যবহারযোগ্য। সেইসমস্ত প্রাণী, যাদের ক্ষেত্রে এই অনুভূতি যথেষ্ট বিকশিত, যেমন কুকুর বা ঘোড়া, তাদের ক্ষেত্রে কোন প্রাণী বা স্থানের স্মৃতি গভীরভাবে গন্ধের সঙ্গে যুক্ত। সম্ভবত এবার আমরা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কি এবং এ বিষয়ে ডঃ মডস্লে ঠিকই বলেছেন, 'মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি শুধুমাত্র বিস্মৃত দৃশ্য বা স্থানের স্পষ্ট চলচ্ছবি ও অনুভূতি মনে করার ক্ষেত্রেই কার্যকরী'।

নগ্ন মানুষ স্পষ্টতই অন্যান্য দ্বিপদী বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের থেকে আলাদা। পুরুষের দেহে বেশিরভাগ জায়গায় তবু ইতস্তত ছড়ানো সামান্য রোম বা চুল দেখা যায়, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা প্রায় নেই বললেই চলে। রোমশতার দিক দিয়ে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আবার একই জাতের সকলের রোম শুধু মাত্র পরিমাণে নয়, অবস্থানেও আলাদা হতে পারে। কোন কোন ইউরোপবাসীর কাঁধ একেবারে রোম শূন্য, আবার একজনের হয়ত ঘন রোমে আচ্ছাদিত। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের শরীরে ছড়িয়ে থাকা রোম নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের শরীর জুড়ে সুষম রোমাচ্ছাদনের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন বিশেষ। একথা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় যখন হাত-পা বা শরীরের কোন অংশে, পুরনো প্রদাহিত স্থানে ওষুধপত্র বা মালিশ লাগালে সেখানকার ধূসর রঙের পাতলা ছোট ছোট রোম কখনো কখনো 'ঘন, লম্বা ও গাঢ় কালো রঙের' চুলে পরিণত হয়।

স্যার জেম্স প্যাগেট আমাকে জানিয়েছেন যে, প্রায়ই একই পরিবারভুক্ত কয়েক জনের ভ্রূপল্লবে দু একটি চুল দেখা যায় যা অন্যগুলির তুলনায় অনেক দীর্ঘ। এই সামান্য বৈশিষ্ট্যটিও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলে আমার ধারণা। এই দীর্ঘ কেশগুচ্ছ তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের প্রতিনিধি স্বরূপ, কারণ শিম্পাঞ্জি ও ম্যাকাকাস্ জাতীয় বাঁদরদের কোন কোন প্রজাতির মধ্যে চোখের উপরের রোমহীন চামড়া থেকে উৎপন্ন বিক্ষিপ্ত কিন্তু রীতি মতো দীর্ঘ চুল দেখা যায়, যা আমাদের ভ্রূর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। একই রকম লম্বা চুল কোন কোন বেবুনের রোমশ ভ্রূপ্রদেশ থেকেও বেরিয়ে থাকতে দেখা যায়।

কৌতূহলোদ্দীপক হলো, ছ-মাস বয়সের মানুষের ভ্রূণ পাতলা পশমের মতো রোম বা লানুগোয় (Lanugo) আবৃত থাকে। মাস-পাঁচেকের সময় ভ্রূ ও মুখমণ্ডলে, বিশেষ করে মুখগহ্বরের চারপাশে মাথার চেয়ে অনেকবেশি পরিমাণে এরকম চুল দেখা যায়। এসরিখট (Eschricht) একটি মেয়ে-ভ্রূণে এমনকি গোঁফদাড়ির আভাস পর্যন্ত দেখেছেন। কিন্তু এ ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কেননা বিকাশের প্রথমাবস্থার বাহ্যচরিত্রলক্ষণে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাধারণত আরো অনেক ধরনের মিলই বর্তমান থাকে। ভ্রূণের শরীরে রোমের অভিমুখ ও বিন্যাস একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতোই, যদিও নানাপ্রকার ভেদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কপাল ও কানদুটি সমেত সমস্ত শরীর জুড়ে বিস্তৃত থাকে ঘন রোমরাজি, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো হাতের তালু ও পায়ের পাতা দুটি দেখা যায় মসৃণ, রোমহীন, যেমন কিনা ঠিক দেখা যায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহে, চার হাত-পায়ের নীচে। এটাকে একটা সমাপতন বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে যারা রোমশ অবস্থায় জন্মায় সম্ভবত তাদের ভ্রূণের শরীরে পশমের আচ্ছাদন লোমের প্রথম স্থায়ী আবরণের সূচনামাত্র। জন্ম থেকেই সারা শরীর ও মুখ ঘন রোমে আবৃত, এরকম তিন-চার জনের কথা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই অদ্ভুত অবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত ও দাঁতের অস্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।[৯] অধ্যাপক অ্যালেক্স ব্রাণ্ড আমাকে জানান যে, তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির মুখের চুল একটি ভ্রূণের রোমের (lanugo) সাথে তুলনা করে দেখেছেন যে তাদের গঠন-রীতি প্রায় এক। তাই তিনি মন্তব্য করেন, উপরিউক্ত বিষয়টিকে চুলের বিকাশের ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা এবং ক্রমবৃদ্ধির কারণের প্রমাণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে। অনেক শিশুর পিঠে লম্বা রেশমের মতো রোম দেখা যায় যা আমি শিশু-হাসপাতালের একজন শল্য-চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনেছি; তার কারণও সম্ভবত এই একই।

ইদানীং পেছনের পেষক দাঁত (Posterior molar) বা আক্কেল-দাঁত উন্নত সভ্যজাতের মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে। আক্কেল-দাঁত অন্যান্য পেষকদাঁতের তুলনায় আকারে অনেক ছোট, যেমনটি দেখা যায় শিম্পাঞ্জি ও ওরাংওটাংদের ক্ষেত্রে, এবং এদের মাত্র দুটি আলাদা করে ছেদক দাঁত থাকে। কমবেশি

৯। অধ্যাপক অ্যালেক্স ব্রাণ্ড সম্প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমেত এক রাশিয়ান পিতাপুত্রের খবর দিয়েছেন। দুজনেরই ছবি আমি প্যারিস থেকে পেয়েছি।

সত্তেরো বছরের আগে আক্কেল দাঁত মাড়ি কেটে বেরোয় না এবং আমি নিশ্চিত যে অন্যান্য দাঁতের চেয়ে অনেক আগেই তা ক্ষয় হয়ে যায় বা পড়ে যায়; কোন কোন দন্ত-বিশারদ অবশ্য তা স্বীকার করেন না। আবার অন্যান্য দাঁতের তুলনায় এই দাঁতটি গঠন ও বিকাশকালের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। অন্যদিকে, মেলানিয়ান জাতির মধ্যে আক্কেল দাঁত তিনটি আলাদা ছেদক দাঁতের সঙ্গে একত্রে থাকে এবং সাধারণত সুস্থ অবস্থাতেই থাকে; এরা অন্যান্য দাঁতের তুলনায় পৃথক আকারের হলেও ককেশিয়ান জাতির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে এই পার্থক্য অনেক কম। অধ্যাপক শাফহাউসেন জাতিগুলির মধ্যে এই পার্থক্যকে সূচিত করেন এই ভাবে: সভ্যজাতিগুলির ক্ষেত্রে চোয়ালের পশ্চাদাংশের আকার সর্বদাই ছোট, তার কারণ হিসাবে আমার মনে হয়, নিয়মিত নরম এবং সিদ্ধ খাদ্য খাওয়ার যে-অভ্যাস সভ্যজাতিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় তার ফলে তাদেরকে চোয়ালের কসরত খুবই কম করতে হয়। মিঃব্রেস আমাকে জানিয়েছেন যে, এখন আমেরিকার বাচ্চাদের কিছু মাড়ির দাঁত তুলে ফেলা প্রায় একটা সাধারণ ঘটনায় এসে দাঁড়িয়েছে; কারণ স্বাভাবিক দাঁতের পূর্ণ বিকাশের জন্য যতটা দরকার ঠিক ততটা চোয়ালের হাড় বাড়তে পারে না।[১০]

পৌষ্টিক নালীতে আমি একটি মাত্র লুপ্ত প্রায় অঙ্গের কথা জানি, যাকে সিকাম এর ভারমিফর্ম অ্যাপেনডেজ (vermiform appendageg of the caecum) বলা হয়। সিকাম হলো অন্ত্রের শাখা বা বর্ধিত অংশ বিশেষ, যা কুল দ্য সাক-এ যেয়ে শেষ হয়েছে। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট দীর্ঘ। কোয়ালা (koala) জাতীয় ক্যাঙ্গারুর ক্ষেত্রে এটি প্রায় তার পুরো শরীরের তিন গুণেরও বেশি লম্বা। কখনো কখনো দেখা যায় যে এটি নীচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে আসছে কিংবা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে। খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্যের পরিবর্তনের ফলে দেখা যায় সিকাম কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে খুব ছোট হয়ে এসেছে এবং ভারমিফর্ম অ্যাপেনডেজ সেক্ষেত্রে এই হ্রাস প্রাপ্ত অঙ্গের লুপ্তপ্রায় একটি অংশ হিসেবে পড়ে রয়েছে। অধ্যাপক কানেসট্রিনি মানুষের ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন আকারের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন।

১০। অধ্যাপক মন্টেগাজা ফ্লোরেন্স থেকে আমাকে লিখেছেন যে তিনি সাম্প্রতিক কালে মানুষের বিভিন্ন জাতির শেষ বা তৃতীয় মোলার দাঁত (আকারে বড়, পেষক দাঁত) বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং তিনিও এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ উচ্চতর বা সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যে তৃতীয়পেষক দাঁত অপুষ্টিজনিত কারণে হয় ক্ষয়ে যাচ্ছে, নতুবা ক্রমাবলুপ্তির পথে।

অ্যাপেনডিক্সের ক্ষুদ্র আকার এবং কানেসট্রিনির সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে এ হলো এক লুপ্ত প্রায় প্রাথমিক অঙ্গবিশেষ। ঘটনাক্রমে এটি যেমন আদৌ না থাকতে পারে তেমনি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দারুণ ভাবে বিকশিত অবস্থাতেও দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এর অবস্থানের অর্ধেক বা তিন ভাগের দু'ভাগ জায়গাই কখনো কখনো এর আয়তনে ভরে যায়, আর শেষাংশ চওড়া শক্ত হয়ে বেড়ে ওঠে। ওরাংওটাং-এর অ্যাপেনডেজ বেশ লম্বা এবং কুণ্ডলীকৃত, মানুষের মধ্যে এটি হ্রাসপ্রাপ্ত সিকামের শেষপ্রান্তে দেখা যায় এবং সাধারণত চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়, যার ব্যাস মাত্র এক ইঞ্চির এক-তৃতীয়াংশ। এটি শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, কখনো কখনো মৃত্যুর কারণ; এ সম্পর্কে সম্প্রতি আমি দুটি ঘটনার কথা শুনেছি। ঘটনার কারণ কোন শক্ত ক্ষুদ্র বস্তু, যেমন দানা খাদ্য, এর মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করলে প্রচণ্ড দাহ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।[১১]

নিম্নশ্রেণীর কিছু বাঁদর (quadrumana), লেমুর ও মাংসাশী প্রাণী এবং অধিকাংশ ক্যাঙ্গারুর মধ্যে হাতের হাড়ের (humerus) শেষাংশে সুপ্রাকণ্ডিলয়েড ফোরামেন (supra-condiloid foramen) নামে একটি ছিদ্র আছে, যার মধ্যে দিয়ে সম্মুখ হাতের প্রধান স্নায়ু এবং প্রায়শই প্রধান ধমনী অতিক্রম করে। মানুষের বাহুতে সাধারণত এই একই ধরনের ছিদ্রের চিহ্নমাত্র দেখা যায়, যা কখনো কখনো হাড়ের বিশিষ্ট বিকাশপদ্ধতির মাধ্যমে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে এবং সম্পূর্ণ হয় একপ্রস্থ অস্থিবন্ধনী পেশীর সাহায্যে। ডঃ স্ট্রুথার্স[১২], যিনি এই বিষয়টা নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছেন, লক্ষ্য করেছেন যে এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য কখনো কখনো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। একজন লোকের কথা তিনি বলেছেন যার সন্তানদের মধ্যে চারজনের ক্ষেত্রেই তাদের পিতার মতো এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। যদি ছিদ্রটি থাকে, তাহলে প্রধান স্নায়ু অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, এবং স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রে তা নিম্নশ্রেণীর সুপ্রাকণ্ডিলয়েড

১১। এম, সি, মার্তাস (Revue des deux mondes) এবং হ্যাকেল (Geneneue Morphologie) উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে এই লুপ্তপ্রায় অঙ্গ কখনো কখনো মৃত্যুর কারণ।
১২। বংশানুক্রম প্রসঙ্গে দেখুন, ডঃ ষ্ট্রুথার্সের "লান্সেট", ১৫ই ফেব্রুয়ারি, পৃঃ ৮৭৩ এবং অপর এক গবেষণাপত্র ঐ একই বইতে যার প্রকাশকাল ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৬৩, পৃষ্ঠা ৮৩। আমার জানা খবর অনুযায়ী ডঃ নক্সই সম্ভবত প্রথম শারীরবিদ্ যিনি মানুষের দেহে এই অদ্ভুত গঠনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; দেখুন তার "গ্রেট আর্টিষ্টস্ এ্যাণ্ড অ্যানাটমিস্টস্", পৃষ্ঠা ৬৩। আরো দেখুন ডঃ গ্রু বার-এর গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি-কথা, Bulletin de l'Aead. Imp de st. Petersbourg", খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৪৪৮।

ফোরামেন-এর লুপ্তপ্রায় অংশের অনুরূপ। অধ্যাপক টার্নার হিসেব করে দেখিয়েছেন যে বর্তমানে মানুষের অস্থিকাঠামোর শতকরা একভাগের মধ্যে এটিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি মানুষের মধ্যে পুনরায় এর বিকাশ ঘটে, সম্ভবত তা হবে উল্টোপথে, পুনরায় সেই প্রাচীন অবস্থায় ফিরে যাবার জন্যে : কারণ, উচ্চ শ্রেণীর বাঁদরদের (quadrumana) মধ্যেও বর্তমানে এটি অনুপস্থিত।

মানুষের বাহুর হাড়ে কখনো সখনো আর একটি ফোরামেন বা ছিদ্র দেখা যায়, যাকে ইণ্টার-কণ্ডিলয়েড বলে। সবসময় না হলেও বিভিন্ন জাতের বনমানুষ, গরিলা, বাঁদর এবং এই জাতীয় অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে মাঝে মাঝে এর দেখা মেলে। উল্লেখযোগ্য হলো যে এই ছিদ্রটি মানুষের মধ্যে এখনকার তুলনায় অনেক বেশি দেখা যেত প্রাচীনকালে। মিঃ বাস্‌কে[১৩] এই বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ যোগাড় করেছেন : অধ্যাপক ব্রোকা "প্যারিসের দক্ষিণ ভাগের কবরখানা থেকে সংগৃহীত শতকরা সাড়ে চার ভাগ বাহুর হাড়ে ছিদ্রটি লক্ষ্য করেছিলেন; এবং ওরনিতে (Orrony) ব্রোঞ্জ যুগের মাটির গহ্বর থেকে পাওয়া বত্রিশটি প্রগণ্ডাস্থির (humeri) মধ্যে আটটিতে এই ছিদ্র দেখেছিলেন; কিন্তু তিনি মনে করেন এই অস্বাভাবিক অনুপাত সম্ভবত পারিবারিক কবরখানার (Family vault) কারণে। মঁসিয়ে দুপোঁ আবার রেইনডিয়ার যুগের লেসী-উপত্যকার গুহাতে শতকরা ত্রিশ ভাগ ছিদ্রযুক্ত হাড় দেখেছিলেন; যেখানে মঁসিয়ে লেগুয়ে আর্জাতুঁরের ডলমেন (Dolmen)* এ রক্ষিত শতকরা পঁচিশ ভাগ দেহে এই ছিদ্র লক্ষ্য করেছিলেন এবং মঁসিয়ে প্রুনার বে একই অবস্থায় ভোরেল (Vaurial) থেকে পাওয়া হাড়ে এর সংখ্যা দেখেছিলেন শতকরা ছাব্বিশভাগ। লক্ষণীয় যে মঁশিয়ে প্রুনার বে-র বিবৃতি অনুসারে এই অবস্থা গুয়াঁস (guanche) অস্থি-কাঠামোয় খুবই সাধারণ ঘটনা।" কৌতূহলোদ্দীপক যে, প্রাচীন জাতিগুলি এই বিষয়ে ও অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ে সাম্প্রতিককালের তুলনায় অনেকবেশি তথ্য

১৩। "অন্ দি কেভস অব জিব্রালটার", "ট্রানজাক্শন ইন ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব প্রিহিস্টোরিক্যাল আর্কিওলজি", তৃতীয় অধিবেশন, ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ১৫৯। অধ্যাপক ওয়াইম্যান সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে (৪র্থ বার্ষিক রিপোর্ট, পিয়াবডি মিউজিয়াম, ১৮৭১, পৃষ্ঠা ২০), পশ্চিম আমেরিকা ও ফ্লোরিডা অঞ্চলের প্রাচীন ঢিপিগুলির মধ্যে কবরস্থ মানুষের শতকরা একত্রিশ ভাগের হাড়ে এই ছিদ্র আছে। একই জিনিস নিগ্রোদের মধ্যেও খুব বেশি দেখা যায়।

* ডলমেন—দুইটি খাড়া প্রস্তর খণ্ডের উপর-রাখা প্রস্তরখণ্ড বিশেষ।

হাজির করে, যা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সাথে গভীর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রধান কারণ সম্ভবত প্রাচীন জাতিগুলি তাদের সুদূর অমানুষ পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ বংশ-সারির অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী।

মানুষের ক্ষেত্রে অণুত্রিকাস্থি (os coccyx), অন্যান্য কসেরুকা বা মেরুদণ্ডের অংশের (vertebrae) সাথে যা পরে আলোচনা করা হবে, যদিও লেজের কাজ করে না কিন্তু অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের তা যথেষ্ট কর্মক্ষম। মানুষের ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় এই অংশটি যে বেশ প্রত্যক্ষ ও শেষ প্রান্ত থেকে কিছুটা বর্দ্ধিত, তা যে-কোন ভ্রূণের ছবিতেই দেখা যেতে পারে (ছবি-১)। এমনকি জন্মের পরেও কোন কোন দুর্লভ ক্ষেত্রে অংশটি ছোট, কিন্তু লেজের প্রাথমিক লুপ্ত অংশের পরিচয়সহ বাইরে বেরিয়ে থাকে।[১৪] সাধারণত মাত্র চারটি কশেরুকা নিয়ে গঠিত এই অনুত্রিকাস্থি আকারে বেশ ছোট এবং দৃঢ়সম্বন্ধ; এবং এগুলি যে গঠনের প্রাথমিক বা আদিম রূপের অবশেষ হিসাবে রয়েছে তা বোঝা যায়, কেননা মেরুদণ্ডের তলস্থিত কোন অংশ ছাড়াই এগুলি শুধুমাত্র মধ্যঅংশকে (centrum) ধারণ করে থাকে। কতকগুলি ছোট পেশীতন্তুর আবরণে ঢাকা থাকে এরা। যে পেশীগুলির একটিকে অধ্যাপক টার্নার-এর মতে থেইল (Theile) নামে অভিহিত করা হয়, যা লেজেরই খুব প্রাথমিক পুনরাবৃত্তি—এমন একটি পেশী যা বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে দারুণ-ভাবে বিকশিত হয়েছে।

মানুষের সুষুম্নাকাণ্ড পৃষ্ঠদেশের শেষ প্রান্ত বা প্রথম 'লাম্বার' (lumbar) কশেরুকা পর্যন্ত গেছে। কিন্তু সরু সুতোর মতো একটা তন্তু (filum terminale) মেরুনালীর সেক্রাল অংশের অক্ষ বরাবর নেমে গেছে, এমনকি কখনো সেটাকে অনুত্রিকাস্থির পিছন পর্যন্ত দেখা যায়। এই তন্তুর উর্ধাংশ, অধ্যাপক টার্নারের মতানুসারে, নিঃসন্দেহে সুষুম্নাকাণ্ডের অনুরূপ, কিন্তু নিম্নাংশ শুধুমাত্র পায়ামেটার (piamater) বা স্নায়ুতন্ত্রের ঝিল্লী দিয়ে তৈরি। এক্ষেত্রেও অণুত্রিকাস্থি মেরুদণ্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর অবশেষ

১৪। অধ্যাপক কাতরফাজ সাম্প্রতিককালে এই বিষয়ে কিছু তথ্য যোগাড় করেছেন, "Revue des cours scientifiques", ১৮৬৭-৬৮, পৃষ্ঠা ৬২৫। ১৮৪০ সালে ফ্লিথমান্ এমন লেজযুক্ত একটি মানুষের ভ্রূণ প্রদর্শন করেছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না, এটা মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল; লেজটিকে বহু শারীরবিদ আরল্যানজেন-এর প্রাণিতত্ত্ববিদদের আলোচনা-সভায় উপস্থিত থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। [দ্রষ্টব্যঃ মার্শালের "Nied erlandi-schen Archiv fiir Zoologie", ডিসেম্বর ১৮৭১]।

বলে বিবেচিত হলেও তার সাথে মেরুনালীর কোন যোগ নেই। অধ্যাপক টার্নারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি দেখিয়েছেন অনুত্রিকাস্থি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের লেজের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যযুক্ত। অধ্যাপক লুস্কা কিছুদিন আগে অনুত্রিকাস্থির শেষ প্রান্তে খুবই অদ্ভুত কুণ্ডলীকৃত একটি অংশ আবিষ্কার করেছেন, যা মধ্য-সেক্রাল ধমনীর সাথে সংযুক্ত এবং এই আবিষ্কার অধ্যাপক ক্রাউস ও অধ্যাপক মেয়ারকে একটি বাঁদর (macacus) ও একটি বিড়ালের লেজ নিয়ে পরীক্ষায় উৎসাহিত করেছিল। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁরা একইরকম কুণ্ডলীকৃত অংশের সন্ধান পেয়েছেন, যদিও তা ঠিক শেষপ্রান্ত নেই।

জননপ্রক্রিয়ায় এমন কিছু কিছু অঙ্গের ব্যবহার আছে যা এখন প্রায় প্রাথমিক বা লুপ্ত অঙ্গের পর্যায়ে এসে পেঁৗছেছে। যদিও এগুলি পূর্বের ব্যাপারগুলি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাদা। এখানে আমরা এমন অঙ্গ বা অঙ্গের অংশ নিয়ে আলোচনা করব না যা প্রজাতিগুলির মধ্যে আর কার্যকরী অবস্থায় নেই, কিন্তু প্রজাতির দুটি বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে একটিতে কার্যকরী এবং অন্যটিতে নিতান্ত প্রাথমিক কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে। তথাপি, এই প্রাথমিক অঙ্গের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা কঠিন, পূর্বের মতো প্রত্যেকটি প্রজাতির স্বতন্ত্র উৎপত্তির ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে যথেষ্ট না হলেও আমি বলব যে, নিতান্ত উত্তরাধিকারপ্রথাই এই ক্ষেত্রে কাজ করে, যা একটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হলে অন্য লিঙ্গে অংশত স্থানান্তরিত হয়। এখানে আমি এই ধরনের কয়েকটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উদাহরণ দেব। আমরা সকলেই জানি যে মানুষ সমেত সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রজাতির পুরুষদেরই প্রাথমিক দুগ্ধ-গ্রন্থি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বিকশিত হয়ে ওঠে এবং প্রচুর দুধ উৎপাদন করতে পারে। উভয় লিঙ্গের মধ্যে এই দুগ্ধগ্রন্থির সাময়িক সাদৃশ্য চোখে পড়ে, যেমন হামে আক্রান্ত হওয়ার সময় উভয়েই স্ফীত হয়ে ওঠে। ভেসিকিউলা প্রোসটাটিকা (Vesicula prostatica), যা অনেক পুরুষ স্তন্যপায়ীর শরীরে থাকে, সংযুক্তিনালীসহ জরায়ুর অনুরূপ—একথা সর্বস্বীকৃত। এই দেহযন্ত্র সম্বন্ধে অধ্যাপক লিওকার্ট-এর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিশেষতঃ সেই সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে একথা আরো স্পষ্ট যাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে জরায়ু দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে[১৫] এবং তাদের পুরুষদের

১৫। লিউকার্ট, টডের "সাইক্লপিডিয়া অব অ্যানাটমি", ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১৫। মানুষের এই অঙ্গটির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক, কিন্তু অন্যান্য অনেক লুপ্তপ্রায় অঙ্গের মতো এটি বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসহ পরিবর্তনশীল।

ভেসিকিউলাও অনুরূপভাবে বিভক্ত। জননতন্ত্রের অন্তর্গত আরো কিছু লুপ্ত-প্রায় অঙ্গের কথা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো না।

এখানে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো, তা অভ্রান্ত। 'অরিজিন অফ স্পিসিজ'-এ যেভাবে বিশদে বলেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি অর্থহীন। একই শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর সাদৃশ্য বেশ বোঝা যায় যদি আমরা তাদের একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের কথা স্বীকার করে নিই এবং বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের মানিয়ে নেবার যোগ্যতার কারণে তাদের পার্থক্যের কথা মনে রাখি। অন্য কোন মতবাদের দ্বারা মানুষ বা বাঁদরের হাত, ঘোড়ার পা, সীল মাছের পাখনা, বাদুড়ের ডানা ইত্যাদির মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।[১৬] একই আদর্শ ছক অনুযায়ী তারা গঠিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারা প্রসূত ব্যাখ্যা নয়। বিকাশের ক্ষেত্রে ভ্রূণের শেষ দশায় আমরা পরিষ্কার ভাবে পরিবর্তনের মূলনীতি কিভাবে হঠাৎ কার্যকরী হয় এবং অনুরূপ সময়ে বংশানুসরণ করে কেমন আশ্চর্যজনকভাবে ভ্রূণগুলি কাঠামো ও গঠনে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় সেটা বুঝতে পারি এবং মোটামুটি সঠিকভাবে তাদের একই

১৬। অধ্যাপক বিয়ানকনি, সম্প্রতি প্রকাশিত ছবিসহ একটি চমৎকার বইতে, (La Thioric Dar wirienne et la· dite· independlente, ১৮৭৪), দেখাতে চেয়েছেন যে, উপরোল্লিখিত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুরূপ গঠন-কাঠামো তাদের ব্যবহারিকতা অনুযায়ী যান্ত্রিক নীতিতেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সম্ভবত আর কেউই এত ভালোভাবে দেখাতে পারেন নি যে এই ধরনের গঠন-আকৃতি কী আশ্চর্যভাবে এদের মুখ্য উদ্দেশ্যের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে এবং আমি মনে করি এই উপযোগীকরণ প্রাকৃতিক-নির্বাচনের মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বাদুড়ের ডানা পরীক্ষা করে তিনি (বিয়ানকনি) যা উপস্থিত করেন (এই বইয়ের ২১৮ পৃষ্ঠায়), অগুস্ত কোঁৎ-এর কথা ধার করে বলা যায়—'আমার কাছে তা শুধুমাত্র একটি অধিতত্ত্বগত (metaphysical) নীতি বলে মনে হয়', অর্থাৎ সংরক্ষণ হলো—'প্রাণীর স্তন্যপায়ী প্রকৃতির অখণ্ডতা'। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র তিনি আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের আলোচনা করেছেন এবং তাও আবার সেই সমস্ত অঙ্গ যা এখনো আংশিকভাবে আদিম বা প্রাথমিক, যেমন, গরু বা শুয়োরের এমন খুর যা মাটি স্পর্শ করে না। তিনি সুস্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন ওটা তাদের এখনো কাজে লাগে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তিনি এক্ষেত্রে গরুর চোয়াল কেটে উঠতে পারা কৃদন্ত বা চতুষ্পদ পুরুষপশুদের দুগ্ধগ্রন্থি বা গুবরে পোকার ডানা যা কাঁধের ডানা-আচ্ছাদনের মধ্যে থাকে বা ফুলের গর্ভ-কেশরের চিহ্ন বা বিভিন্ন ফুলের পুং-কেশর এবং আরো অনেক বিষয়ে আদৌ আলোচনা করেন নি। যদিও আমি দারুণভাবে অধ্যাপক বিয়ানকনির কাজের প্রশংসা করি, তবু আমার মনে হয় যে অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্ববিদের মধ্যে এই ধারণা এখনো অক্ষত যে অনুরূপ গঠন-আকৃতিকে নিছক অভিযোজনের নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব পর নয়।

পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করায়। মানুষ, কুকুর, সীল, বাদুড়, সরীসৃপ ইত্যাদির ভ্রূণ প্রথম অবস্থাতে আলাদা করা কঠিন, অন্য কোন অনুমান দ্বারা এই চমৎকার ঘটনার ব্যাখ্যা করা এখনও সম্ভবপর হয় নি। আদিম বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে আমরা বড়জোর অনুমান করতে পারি যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এককালে এই সমস্ত অঙ্গকেই পরিপূর্ণ সক্ষমতায় ব্যবহার করেছিলেন, এবং জীবনযাপনের অভ্যাস-পরিবর্তনের ফলে এ সমস্ত অঙ্গগুলির ব্যবহার কমে যাওয়ায় ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে বা কোথাও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে অথবা স্বাভাবিক নির্বাচনের ফলে ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, কিভাবে মানুষ এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী একই সাধারণ কাঠামোয় তৈরি, কিভাবে তাদের সকলকে বিকাশের একই প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে, এবং কেনই বা তাদের লুপ্তপ্রায় আদিম অঙ্গগুলিও এক। ফলে, তাদের বংশধারার সাদৃশ্যও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। যে-কোন অন্য মত গ্রহণ করার আগে আমরা যদি একটু আমাদের ও চারপাশের অন্যান্য জীবজন্তুদের শারীরিক গঠনকে মিলিয়ে দেখি, তাহলেই বিচারের ক্ষেত্রে কোন ভুল হবে না। এই সিদ্ধান্ত আরো জোরদার হবে যদি আমরা গোটা প্রাণীজগতের দিকে তাকাই এবং তাদের সাদৃশ্য ও শ্রেণীবিভাজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ, ভৌগোলিক বিভাজন ও ভূতাত্ত্বিক উত্তরাধিকারের (জীবাশ্মঘটিত) প্রমাণসমূহ বিচার করে দেখি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে রকম স্পর্ধার সাথে বলতেন যে তাঁরা দেবতাদের অংশ, তা যদি আমাদের সিদ্ধান্তকে কখনো প্রভাবিত করে, তাহলে সেটা হবে আমাদের স্বাভাবিক সংস্কারমাত্র। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন লোকে শুনে আশ্চর্য হবে যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদরা, যাঁরা কিনা মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনামূলক শারীরিক গঠনতত্ত্ব ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারতেন যে প্রত্যেকটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই আলাদাভাবে সৃজনের নিয়ম কাজ করেছে বা করছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিম্নতর কোন জৈবিক গঠন থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষে উত্তরণের ধরন।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পরিবর্তনশীলতা—উত্তরাধিকার—রূপান্তরের কারণসমূহ—মানুষ এবং নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে রূপান্তরের একই সূত্রসমূহ—জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ধিত ব্যবহার ও অব্যবহারের ফলাফল—সীমিত বিকাশ—পুনরাবর্তন—পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রূপান্তর—বৃদ্ধির হার—বৃদ্ধিকে রোধ করা—প্রাকৃতিক নির্বাচন—পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী প্রাণী—তার শারীরিক কাঠামোর গুরুত্ব—তার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার পিছনের কারণসমূহ—তার ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন—শ্বদন্তের আয়তনের ক্রমহ্রাস—করোটির বর্ধিত ও পরিবর্তিত আকার—রোমহীন নগ্নতা—লেজের অনুপস্থিতি—মানুষের প্রতিরোধহীন অবস্থা।

এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে মানুষের মধ্যে নানান বৈসাদৃশ্য আছে। একই জাতের দু'জন মানুষকে দু'রকম দেখতে। আমরা কয়েক লক্ষ মানুষের মুখ তুলনা করে দেখলে দেখব যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত ও আয়তনেও পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। যেমন, পায়ের দৈর্ঘ্য।[১] পৃথিবীর কোন কোন অংশে লম্বাটে ধরনের এবং অন্যত্র ছোট মাপের করোটি দেখা যায়, এমনকি একই জাতির সীমিত পরিসরেও গড়নের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন আমেরিকার ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন উপজাতি। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা, "যারা রক্তের শুদ্ধতায়, আচার ব্যবহার ও ভাষার বিশুদ্ধতায় সম্ভবত অদ্বিতীয়,"—এমনকি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের মতো চারপাশে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা স্থানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও করোটির গঠনে এই পার্থক্য থাকতে পারে। একজন বিখ্যাত দন্তবিশারদের মতে, মুখাবয়বের মতো দাঁতের গঠনেও প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। প্রধান প্রধান ধমনীর গতিপথ এত অস্বাভাবিক রকমের আলাদা যে অস্ত্রোপচারের কারণে ধমনীর গতিপথ সম্পর্কে একটা সাধারণ সূত্রে পেঁছিনোর জন্য ১০৪০-টি শবদেহ পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। মাংসপেশী স্পষ্টতই পরিবর্তনশীল, যেমন অধ্যাপক টার্নার দেখেছেন পঞ্চাশজনের মধ্যে

১। "ইনভেষ্টিগেশন ইন্ মিলিটারী অ্যাণ্ড অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স্ অব আমেরিকান সোলজারস্",বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ২৫৬।

দুজনের পায়ের পেশীও একেবারে একরকম নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য বিচ্যুতিও রয়েছে। তিনি আরও বলেন, পায়ের সঠিক পেশীগত ছন্দ অনেক সময়ই বিভিন্ন বিচ্যুতিসাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে। মিঃ জে উড ৩৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ২৯৫টি পেশীর অসামঞ্জস্য এবং অন্য একটি ৩৬ জনের দলে প্রায় ৫৫৮টি পার্থক্য নথিভুক্ত করেছেন। শরীরের দু'দিকে একইরকম পার্থক্যকে এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য হিসাবেই ধরা হয়েছিল। শেষের ঘটনাটিতে ৩৬টির মধ্যে একটিও "শারীরতত্ত্বের বইতে ছাপা পেশী-ব্যবস্থার সাধারণ বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে নি।" একটি বিশেষ ক্ষেত্রে একই দেহে ২৫টি স্বতন্ত্র অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেছে। একই পেশী নানাদিক থেকেই আলাদা হতে পারে। সেকারণে অধ্যাপক ম্যাকালিস্টার হাতের পামারিস অ্যাসেসোরিয়াস (palmaris accessorius) পেশীতে কম করে কুড়িটি ভিন্ন রূপান্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক উল্‌ফ জোর দিয়ে বলেছেন, শরীরের ভিতরের অংশগুলি (internal viscera) বাইরের তুলনায় অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। অন্তর্বর্তী অংশের প্রচলিত উদাহরণ টেনে লেখা একটা প্রবন্ধে তিনি প্রায় মানুষের মুখসৌন্দর্যের মতো ক'রে যকৃত, ফুসফুস, কিডনী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও একই জাতির মধ্যে মানসিক গঠনের বৈসাদৃশ্য বা ভিন্নতা এত বেশি পরিচিত যে সে সম্বন্ধে এখানে আর নতুন কিছু বলার নেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও এই পার্থক্য রয়েছে। জন্তু-জানোয়ার নিয়ে যাঁদের ওঠা-বসা, তাঁরাও একথা স্বীকার করেন এবং সাধারণত কুকুর বা গৃহপালিত পশুর বেলায়ও একই জিনিস আমরা দেখতে পাই। ব্রেহাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি আফ্রিকাতে যে-সমস্ত বাঁদরকে পোষ মানিয়ে ছিলেন তারা প্রত্যেকে অদ্ভুতরকম আলাদা আলাদা প্রবণতা ও মেজাজের অধিকারী ছিল। চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা আমাকে একটি বাঁদর দেখিয়েছিলেন যার বুদ্ধিমত্তা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক রেনগ্যার প্যারাগুয়েতে একই প্রজাতির কিছু বাঁদরের আলাদা আলাদা মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা জোর দিয়ে বলেছেন এবং তাঁর মতে এই পার্থক্য অংশত সহজাত এবং অংশত শিক্ষা ও প্রযুক্ত আচরণের ফল।

বংশগতি নিয়ে আমি অন্যত্র এত বিশদে আলোচনা করেছি যে এখানে দু'একটি কথা ছাড়া আর কিছু বলার নেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে বংশগতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য যোগাড় করা হয়েছে, যার কিছু কিছু অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের জন্য সংগৃহীত তথ্যও খুব কম নয়। তাই মানসিক গুণ প্রসঙ্গে বংশগতির প্রভাব (transmission) আমাদের পোষা কুকুর, ঘোড়া বা গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায়। অধিকন্তু বিশেষ স্বাদ ও অভ্যাস, সাধারণ বুদ্ধি, সাহস, ভালো ও বদ মেজাজ প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই উত্তরপুরুষে বর্তায়। মানুষের মধ্যে এই ঘটনা আমরা প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারেই দেখি। এবং আমরা মিঃ গ্যাল্টনের[২] কাছ থেকে জেনেছি যে প্রতিভা বিবিধ মানসিক গুণের এক জটিল ও চমৎকার যৌগমাত্র এবং সেটা উত্তরপুরুষে বর্তায়, আবার অন্যদিকে মানসিক ক্ষমতার হ্রাস, মানসিক অসুস্থতা প্রভৃতিও নিশ্চিতভাবেই বংশগতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

পরিবর্তনের কারণ প্রসঙ্গে আমরা প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই অজ্ঞ, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মতো মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তারা অবস্থার এমন কতকগুলি সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে আছে যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রজাতিকে কয়েক পুরুষ ধরে যেতে হয়েছে। গৃহপালিত পশুরা বন্য পশুদের চেয়ে অনেক বেশিগুণে পরিবর্তিত হয় এবং তা কার্যত তাদের স্বতন্ত্র ও পরিবর্তনশীল অবস্থার চাপেই হয়ে থাকে। মানবজাতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এ-কথা একইভাবে সত্যি, এবং একই জাতির বিভিন্ন ব্যক্তিতেও তা দেখা যায়, যদি তারা আমেরিকার মতো কোন একটা বিরাট জায়গায় বাস করে। অধিকতর সভ্য জাতিগুলির মধ্যেও (পরিবেশগত) অবস্থার প্রভাব আমরা দেখতে পাই। যেহেতু তারা পদমর্যাদার বিভিন্ন ধাপে রয়েছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, ফলে বর্বর জাতিগুলির সদস্যদের চেয়ে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিধিও হয়ে পড়ে অনেক বিস্তৃত। বর্বর জাতির সভ্যদের ঐক্য নিয়ে প্রায়ই অতিরঞ্জন করা হয় এবং কখনো কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে এর কোন অস্তিত্বই থাকে না।[৩] তথাপি মানুষকে, যে যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে, তা দেখেই যদি অন্যান্য জন্তুর চেয়ে অনেক বেশি গৃহপালিত বলি, তাহলে ভুল হবে। অস্ট্রেলিয়ানদের মতো কোন-কোন বর্বর জাতিকে খুব বেশি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না, যেমন কিনা অন্যান্য প্রজাতির অনেককেই বিস্তীর্ণ পরিসরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অন্য

২। "হেরিডিটারি জিনিয়াস : অ্যান এনকোয়ারী ইনটু ইট্স্ লজ্ অ্যাণ্ড কনসিকোয়েন্সেস্।"

৩। মিঃ বেট্ (দি ন্যাচারালিষ্ট অন্ দি আমাজন—১৮৬৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯) দক্ষিণ আমেরিকার একই গোষ্ঠীভুক্ত ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তাদের মধ্যে কোন দুজনের মাথার আকৃতি একরকমের ছিল না ; একজনের কিছু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসহ ডিম্বাকৃতি মাথা এবং অন্য জনের গণ্ডদেশের (cheek) বিস্তৃতি ও স্পষ্টতা, নাসারন্ধ্রের বিস্তৃতি এবং দৃষ্টির প্রখরতায় পুরোপুরি একজন মঙ্গোলিয়ান।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষ গৃহপালিত প্রাণীদের থেকে ব্যাপক অর্থে আলাদা, যেহেতু তার যৌনমিলন কখনোই কোন পদ্ধতিমাফিক বা অসচেতন নির্বাচনের ফলস্বরূপ নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষের কোন জাতি বা দলকে অন্য মানুষরা কখনো এমনভাবে বশীভূত করতে পারেনি, যাতে তাদের কিছুটা অংশকে আলাদাভাবে সংরক্ষিত রেখে অচেতনে মিলনের জন্য নির্বাচন করা সম্ভব হয়। একমাত্র প্রাশিয়ান পদাতিক বাহিনীর বিখ্যাত ঘটনাটি ছাড়া কখনোই নির্দিষ্ট কিছু ছেলে ও মেয়েকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেছে নিয়ে তাদের বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করা হয়নি এবং এই ক্ষেত্রে মানুষ প্রত্যাশামতই প্রণালীবদ্ধ নির্বাচনের নিয়মটি (law of methodical selection) মেনে নিয়েছে। অনুমান করা হয় যে পদাতিক সৈন্য ও তাদের দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীদের বসত-গ্রামগুলিতে দীর্ঘ মানুষ প্রস্তুত করা হতো। স্পার্টাতেও এক ধরনের নির্বাচন অনুসৃত হতো। জন্মের পরপরই একটা প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সুন্দর গঠন ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ শিশুদের সযত্নে রক্ষা করা হতো, বাদবাকিরা ছিল পরিত্যাজ্য।[8]

যদি আমরা মানুষের সমস্ত জাতিগুলিকে একটি মাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরি, তাহলে তার পরিসর বিশাল। আমেরিকাবাসী বা পলিনেশিয়াবাসীদের (polynesians) মতো কিছু স্বতন্ত্র জাতিরও অবশ্য বিস্তৃত পরিসর আছে। এটা আমাদের অজানা নয় যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা যে-কোন প্রজাতি সীমাবদ্ধ পরিসরের প্রজাতির চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। এবং মানুষের মধ্যে এই বিপুল ভিন্নতাকে গৃহপালিত প্রাণীদের তুলনায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা প্রাণীকুলের প্রজাতিগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই সম্ভবত ঠিক হবে। মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে শুধুমাত্র একই সাধারণ কারণে বৈসাদৃশ্য ঘটে না, উভয়ের ক্ষেত্রেই শরীরের একই অঙ্গ প্রায় সদৃশ ধরনে পরিবর্তিত হয়। অধ্যাপক গডরন ও অধ্যাপক কাত্রফাজ এই বিষয়টা ব্যাপক গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন, এখানে আমি শুধু তাঁদের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। অস্বাভাবিকতা উভয় ক্ষেত্রেই এত ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় যে মানুষ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী উভয়ের

৪। মিটফোর্ড-এর "হিস্ট্রি অব্ গ্রীস" ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৮২, এটা আরো জানা যায় জেনো ফেন-এর "মেমোর‍্যাবিলিয়া" বইটির একটি অংশ থেকে (যার প্রতি রেভারেণ্ড জে. এন. হোর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন)। গ্রীকদের একটি স্বীকৃত নিয়মই ছিল যে পুরুষেরা ভবিষ্যৎ সন্তানদের স্বাস্থ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের স্ত্রী নির্বাচন করবেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ সালে গ্রীককবি থিওগ্নিস্ মনে করেছিলেন মানুষের উন্নতির পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন যদি তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়। তিনি দেখেছিলেন যে প্রায়শই সম্পদ যৌন নির্বাচনের সুঠিক কাজের পক্ষে বাধাস্বরূপ। এই বিষয়ে তাঁর একটি চমৎকার কবিতাও আছে।

জন্যই একই নাম ও শ্রেণীবিভাগ ব্যবহার করা যেতে পারে ঠিক যেমনটি দেখিয়েছেন অধ্যাপক ইসিডোর জিওফ্রয়, সেণ্ট-ইলেয়ার। গৃহপালিত পশুদের ভিন্নতা সম্পর্কিত প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিতভাবে একটু স্থূলপন্থাতেই পরিবর্তনের সূত্রগুলিকে রাখতে চেষ্টা করেছি; (ক) পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ ও নিশ্চিত ক্রিয়া যেমন একই প্রজাতির প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বা প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনই সদৃশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তাদের উপর ক্রিয়া করে প্রায় একই ধরনে; (খ) দীর্ঘদিন যাবৎ শরীরের কোন অংশের ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলাফল; (গ) শরীরের অনুরূপ সংযোগ-প্রবণতা; (ঘ) শরীরের নানা অংশের পরিবর্তনশীলতা; (ঙ) বৃদ্ধির পরিপূরকনীতি—অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির কোন প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমি পাইনি; (চ) শরীরের একটি অংশের আর একটি অংশের উপর যান্ত্রিক চাপের (machanical pressure) ফলাফল, যেমন জরায়ুর মধ্যস্থিত ভ্রূণের মাথার খুলিতে পেলভিস-এর চাপ; (ছ) বিকাশের গতিরোধ, যার ফলে শরীরের কোন অংশের আকস্মিক হ্রাস বা অবনতি; (জ) পুনরাবর্তনের মাধ্যমে হারিয়ে-যাওয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পুনরাবির্ভাবের অপ্রবণতা, এবং শেষত (ঝ) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন। এই সমস্ত সূত্রই মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য, এমনকি এর অধিকাংশ সূত্র উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেকটি সূত্রের আলোচনা এখানে নিরর্থক।[৫] কিন্তু কয়েকটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন।

পরিবর্তিত অবস্থার প্রত্যক্ষ ও নির্দিষ্ট ক্রিয়া: খুবই জটিল বিষয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমস্ত জীববস্তুর ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত অবস্থা কখনো সামান্য, কখনো বা যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাব ফেলে এবং সম্ভবত যথেষ্ট সময় দেওয়া হলে সর্বক্ষেত্রে ফলাফল প্রায় অপরিবর্তিত হতো। কিন্তু এর সপক্ষে আমি এখনও কোন স্পষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি। দেহগঠন বা কাঠামো সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বিষয়, যা নির্দিষ্ট কারণে অর্জিত হয়েছে, তার বৈধ কারণগুলি এখানে জোর দিয়ে আলোচনা করা যায়। সন্দেহ নেই যে অবস্থার পরিবর্তন অনির্দিষ্ট সংখ্যক রূপান্তরক্রিয়ার কারণ হতে পারে, যার ফলে কোন কোন শারীরিক গঠন কিছু পরিমাণে নমনীয় গুণের অধিকারী হয়।

৫। এই সূত্রগুলি বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার "ভ্যারিয়েশন অব্ অ্যানিম্যালস্ অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্টস্ আণ্ডার ডমেষ্টিকেশন" ২য় খণ্ড, ২২ ও ২৩ পরিচ্ছেদ। এম. জে. পি. ডুরাও দ্যা লিঁফ্লুয়স্ দে মিলিও "(De L' Influence des Milieux)" নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী উদ্ভিদের বিষয়টিতে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত যুদ্ধের প্রায় দশ লাখ সৈন্যের দৈহিক পরিসংখ্যান, কোন্ অঞ্চলে তাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইত্যাদি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এই আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে দৈহিক উচ্চতার উপর আঞ্চলিক প্রভাব প্রায় সরাসরিভাবে কাজ করে, এবং আমরা আরো জানতে পারি "কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থা দৈহিক গঠনবৃদ্ধির অনুকূল, এবং জন্মকালীন অবস্থা ও দৈহিক উচ্চতার ওপর কিভাবে তার স্পষ্ট প্রভাব রেখে যায়।" উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের দৈহিক বিকাশের কালে উচ্চতাবৃদ্ধির হার বেশ ভালো। অন্যপক্ষে, নাবিকদের জীবনে বিকাশের কাল অনেক দেরিতে আসে, এবং দেখা গেছে যে "সতেরো-আঠারো বছরে স্থল সৈন্যদেরও উচ্চতার সঙ্গে নাবিকদের উচ্চতার রয়েছে বিশাল তফাৎ।" মিঃ বি. এ. গোল্ড উচ্চতার উপর কার্যকরী পরিবেশগত প্রভাবগুলির প্রকৃতি নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র নঙর্থক কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, অর্থাৎ দৈহিক উচ্চতা আবহাওয়া বা জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, মৃত্তিকা বা ভূমির উচ্চতার সঙ্গে নয়, এমনকি নিয়ন্ত্রিত হারে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন বা প্রাচুর্যের সঙ্গেও ততটা সম্পর্কযুক্ত নয়। এই শেষ সিদ্ধান্তটি সরাসরি অধ্যাপক ভিলের্মের সিদ্ধান্তের বিরোধী। তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত পদাতিক সৈন্য ও নৌ-সৈন্যদের উচ্চতার পরিসংখ্যান প্রস্তুত করেছিলেন। যখন একই দ্বীপপরিধির মধ্যে আমরা পলিনেশিয়ান সর্দার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে দৈহিক উচ্চতার তুলনা করি, কিংবা যখন একই মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত উর্বর আগ্নেয়গিরিজাত দ্বীপ ও অনুর্বর প্রবাল দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে[৬] তুলনা করি অথবা পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের ফিজিয়ান অধিবাসী যাদের জীবিকা নির্বাহের প্রণালীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তখন এ সিদ্ধান্ত নাকচ করা প্রায় অসম্ভব যে উত্তম খাদ্য ও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য দৈহিক উচ্চতার উপর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত বক্তব্য দেখায় যে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান কীরকম অসুবিধাজনক। ডঃ বিডো সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে ব্রিটেনের অধিবাসীরা, যাঁরা শহরে বাস করেন, তাঁদের উচ্চতার উপর ক্ষতিকর পেশাগত

৬। পলিনেশিয়ানদের জন্য দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক রিচার্ডের "ফিজিক্যাল হিস্ট্রি অব্ ম্যান্‌কাইণ্ড" ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫ ও ২৮৩; এবং অধ্যাপক গর্ডনের "দ্য লেস্‌প্যাস্ (De L' Espece)" ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৯, আবার গাঙ্গেয় উচ্চ উপত্যকায় বসবাসকারী হিন্দুদের সঙ্গে বাঙ্গলার (সমভূমির) অধিবাসীদের হাবভাবে অনেক মিল আছে। দ্রষ্টব্য, অধ্যাপক এলফিনস্টোনের "হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া" ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৪।

প্রভাব রয়েছে, এবং তিনি মনে করেন যে আমেরিকার মতোই কিছুটা বংশগতির কারণেও একই ফল হতে পারে। ডঃ বিড্ডো আরো মনে করেন যে যখন কোন "জাতি দৈহিক বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছায়, তখন সে একই সঙ্গে প্রাণশক্তি ও নৈতিক শক্তিরও চরমে ওঠে।"

বাহ্যিক অবস্থা মানুষের উপর সরাসরি অন্য কোন প্রভাব ফেলে কিনা ঠিক জানা যায় না। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে জলবায়ুঘটিত তারতম্যেরও নির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে, যেহেতু স্বল্প উষ্ণতা ফুসফুস ও মূত্রাশয়ের পক্ষে কমবেশি সহায়ক এবং যকৃত ও শরীরের চামড়া অধিক উষ্ণতায় বেশি কার্যকরী। আগে ভাবা হতো ত্বকের রঙ ও চুলের বৈশিষ্ট্য বুঝি আলো ও তাপের দ্বারা নির্ধারিত হয়। অস্বীকার করা যায় না যে এর সামান্য কিছু প্রভাব অবশ্যই রয়েছে, তবু এখন একথা সর্বজনস্বীকৃত যে তা নিতান্তই সামান্য। বিভিন্ন মানবজাতির প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা পরে করা হবে। গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে অবশ্য একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে ঠাণ্ডা ও সঁ্যাতসঁ্যাতে আবহাওয়া রোমবৃদ্ধির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমি এ বিষয়ে এখনও তেমন কোন প্রমাণ পাইনি।

শরীরের কোন অংশের বহুল ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল : আমরা জানি যে ব্যবহার যেমন পেশীশক্তিকে উজ্জীবিত করে, তেমনই অব্যবহার বা নির্দিষ্ট কোন স্নায়ুতন্তুর বিনাশ ক্রমশ পেশীগত শক্তিহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় চোখ নষ্ট হলে চোখের স্নায়ুও (optic nerve) ক্রমে শুকিয়ে আসে। যদি কোন একটি শিরা নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে তার পার্শ্ববর্তী রক্তবাহী নালী-গুলি শুধুমাত্র ব্যাসেই বেড়ে যায় না, তার বেধ ও শক্তিও বাড়ে। যখন একটি কিডনী অসুস্থতার কারণে কাজ বন্ধ করে, তখন অন্যটি আকারে বেড়ে যায় এবং প্রায় দ্বিগুণ কাজ করে। অতিরিক্ত ভারবহনের দরুন হাড় শুধু মোটা নয়, অনেক সময়ে দৈর্ঘ্যেও বেড়ে যায়। বিভিন্ন পেশা, অভ্যাসগত কারণে শরীরের নানা অংশের আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটায়। ইউনাইটেড স্টেট্‌স কমিশন পরীক্ষা করে দেখেছিল যে গত যুদ্ধে যারা নাবিক হিসেবে কাজ করেছে, তাদের পা পদাতিক সৈন্যদের চেয়ে অন্তত ০.২১৭ ইঞি বেশি লম্বা, যদিও নাবিকদের গড় উচ্চতা সাধারণত কম। এবং তাদের বাহুর মাপ ১'০৯ ইঞি কম অর্থাৎ স্বল্প উচ্চতার তুলনায়ও এই মাপ সমানুপাতিক নয়। বাহুর দৈর্ঘ্যের এই স্বল্পতা সম্ভবত অতিব্যবহারের ফল, যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু নাবিকেরা প্রধানত দাঁড় টানে, সেই অর্থে কোন ভারী জিনিস তারা বহন করে না। আবার

পদাতিক সৈন্যদের তুলনায় নাবিকদের গলার বেড় ও পায়ের পাতার উপরিভাগের বিস্তৃতি অনেক বেশী, কিন্তু বুক, কোমর ও নিতম্বের পরিধি বেশ কম।

পূর্বোল্লিখিত নানা পরিবর্তন বেশ কয়েক পুরুষ ধরে যদি জীবনের একই অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়, তবে তা বংশানুক্রমিক হয়ে উঠবে কিনা সঠিক জানা না গেলেও, মনে হয় তা অসম্ভব নয়। অধ্যাপক রেনগ্যার দেখিয়েছেন, পায়াগাস্ (Payaguas) ইণ্ডিয়ানরা—যারা পুরুষানুক্রমিকভাবে সারা জীবন শরীরের নিম্নাংশকে অচল রেখে ডোঙা বা শালতি (Canoes) চালায়, তাদের কৃশ পা ও শক্তপোক্ত বাহু উত্তরপুরুষে বর্তায়।

অন্যান্য লেখকগণও অনুরূপ ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অধ্যাপক ক্রানৎস্, যিনি দীর্ঘদিন এস্কিমোদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, তাঁর মতে, এস্কিমোরা বিশ্বাস করে সীল-শিকারের জন্য (যা তাদের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প ও প্রধান ধর্ম) প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনশক্তি ও হাতের কৌশল বংশানুক্রমিক ; কারণ একজন বিখ্যাত সীলমাছ শিকারীর ছেলে শৈশবে তার বাবাকে হারালেও পরবর্তীকালে যখন নিজের যোগ্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে, তখন মনে হয় যে বিষয়টি হয়তো সত্যি হতেও পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে মানসিক ক্ষমতাও ঠিক শারীরিক গঠনের মতোই বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বলে মনে হয়। আবার ভদ্রলোকদের তুলনায় ইংরেজ শ্রমিকদের হাত জন্মাবধি দীর্ঘ বলে অনুমিত। হাত-পা ও চোয়ালের বিকাশে অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, তাতে করে মনে হয়—যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ হাত-পা খুব বেশী ব্যবহার করে না, তাদের চোয়াল আকারে এ-কারণে ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। এ-কথা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সভ্য ও মার্জিত ভদ্রলোকদের তুলনায় শারীরিকভাবে বেশি পরিশ্রমী মানুষ অথবা বর্বরজাতির মানুষের চোয়াল অনেক বড়। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, বর্বররা রান্না-না-করা খাদ্য চিবিয়ে খায় বলে তাদের চোয়ালের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়, ফলে সংশ্লিষ্ট পেশী (masticatory muscles) ও হাড়ের উপর তার প্রভাব পড়ে। গর্ভাবস্থায় শিশুদের পায়ের পাতার চামড়া শরীরের যে কোন অংশের চামড়ার চেয়ে পুরু থাকে এবং নিঃসন্দেহে তার কারণ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার।

ঘড়ি প্রস্তুতকারক ও তক্ষণশিল্পীদের দৃষ্টিশক্তি সাধারণত কম। অথচ যারা ঘরের বাইরে প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় বেশিক্ষণ থাকে তাদের, বিশেষ করে বর্বরদের

চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ন।[৭] দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা বা তীক্ষ্নতা নিশ্চিত ভাবেই বংশানুক্রমিক হতে পারে। দৃষ্টি শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষেত্রে অসভ্য বর্বরদের তুলনায় ইউরোপীয়ানদের তুলনামূলক ক্ষীণতা নিঃসন্দেহে বহু পুরুষের ক্রমিক অব্যবহারের অর্জিত ফল। কারণ, অধ্যাপক রেনগ্যার[৮] জানিয়েছেন যে তিনি বারেবারে লক্ষ্য করে দেখেছেন, ইউরোপীয়ানরা অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়েও ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্রতায় তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি আরো লক্ষ্য কারছেন যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সঠিক ভাবে গ্রহণের জন্য করোটিস্থিত ছিদ্র পথগুলি ইউরোপীয়ানদের চেয়ে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অনেক বড় এবং সম্ভবত এই তথ্য ইন্দ্রিয়গুলির তুলনামূলক মাত্রাগত পার্থক্যের দিকেও নির্দেশ করে। অধ্যাপক ব্লুমেনবাখ্ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের নাকের বৃহৎ গর্তের (nasal cavities) কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই ঘটনা তাদের তীব্র ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে যুক্ত। অধ্যাপক প্যালাস্-এর মতে উত্তর-এশিয়ার সমতলবাসী মঙ্গোলিয়ানদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি আশ্চর্যরকমের তীব্র। অধ্যাপক প্রিচার্ড মনে করেন যে গালের হাড় (zygoma) বরাবর করোটির বিস্তৃত বিস্তার তাদের উন্নত ইন্দ্রিয়শক্তির পরিচায়ক।

কেশুয়া (Quechua) ইণ্ডিয়ানরা পেরুর উঁচু মালভূমিতে বসবাস করে। অধ্যাপক আলসিদ দ্যরবিনি বলেছেন যে সব সময় বিশুদ্ধ বাতাসে শ্বাসগ্রহণের ফলে তাদের বুকের ছাতি ও ফুসফুস অস্বাভাবিক রকমের বড়। ফুসফুসের বায়ুকোষগুলি আকারে বেশ বড় এবং ইউরোপীয়ানদের চেয়ে সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এ-ঘটনা অবশ্য বেশ সন্দেহজনক মনে হতে পারে। কিন্তু মিঃ ডি. ফরবেস্, দশহাজার থেকে পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে বসবাসকারী আইমারা (Aymara) নামক এক সংকর জাতির ক্ষেত্রে বিষয়টি লক্ষ্য করে আমায় জানিয়েছেন যে, তাঁর দেখা

৭। একটি বিরল এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা হল যে, নাবিকদের দৃষ্টিশক্তি সাধারণত ডাঙার মানুষদের তুলনায় কম হয়ে থাকে। ডঃ বি. এ. গোল্ড তাঁর গ্রন্থে ("স্যানিটারি মেমোয়্যারস্ অফ্ দ্য ওয়ার অফ্ দ্য রেবেলিয়ন", ১৮৬৯ পৃষ্ঠা ৫৩০), এ-কথা প্রমাণ করেছেন এবং তিনি মনে করেন নাবিকদের দৃষ্টিসীমা সাধারণত "জাহাজের দৈর্ঘ্য ও মাস্তুলের উচ্চতা-র" মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলেই তাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

৮। "সগেথিয়ের ফন্ প্যারাগুয়ে (Saugethiere von paraguay) এস. ৮, ১০"। ফুজিয়ানদের প্রখর দৃষ্টিশক্তি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য অধ্যাপক লরেন্সের বই, "লেক্‌চারস্ অন্ ফিজিওলজি" ইত্যাদি, ১৮২২ পৃঃ ৪০৪। মিঃ গিরদ্-জিউলন সম্প্রতি এবিষয়ে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন, (দ্রষ্টব্য, "রেভ্যু দ্য কোর সায়েনটিফিক্ Reveu de cours Scientifiques", ১৮৭০ পৃঃ ৬২৫) এবং কমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার আসল কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন (C' est le travail assldu, de pris).

অন্য সমস্ত জাতির মানুষদের চেয়ে শারীরিক পরিধি ও দৈর্ঘে তারা অনেক আলাদা। তাঁর তথ্যসারণীতে তিনি ১০০০ এককের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকের শারীরিক উচ্চতা বিচার করেছেন, এবং একই নানানুসারে অন্যান্য অঙ্গের মাপ নিয়েছেন। দেখা গেছে আইমারাদের (Aymaras) অগ্রবাহু (extended arms) ইউরোপীয়ানদের চেয়ে দৈর্ঘে ছোট এবং নিগ্রোদের তুলনায় আরো বেশী ছোট। একইরকমভাবে তাদের পা-ও বেশ ছোট।

উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক আইমারার পায়ের উপরের অংশও (femur) পায়ের নিম্নাংশের (tibia) চেয়ে ছোট। গড় হিসেব অনুযায়ী, উর্ধাংশ যদি ২১১ একক হয়, তাহলে নিম্নাংশ দেখা যাচ্ছে ২৫২ একক। অথচ একজন ইউরোপীয়ানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৪৪/২৩০। এবং তিনজন নিগ্রোর ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৫৮/২৪১ একক আবার একই ভাবে তাদের হাতের উপরের অংশ (humerus) অগ্রবাহুর তুলনায় ছোট। দেহকাণ্ডের নিকটবর্তী পেশীসমূহের এই ক্ষুদ্রতা মিঃ ফরবেসের মতানুযায়ী সম্ভবত দেহের নিম্নাংশের অতিবৃদ্ধির আংশিক পরিপূরক। আইমারাদের কাঠামোগত আরো কিছু বৈশিষ্ট্যর মধ্যে গোড়ালির সামান্য অংশ বাইরে বেরিয়ে থাকার কথাও বলতে হবে।

আইমারাজাতির লোকেরা শীতল ও সুউচ্চ বাসভূমিতে থাকতে এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, যখন স্পেনীয়রা পূর্বদিকের নীচু সমতলভূমিতে তাদের নামিয়ে এনে অধিক মজুরী সাপেক্ষে সোনার খনিতে কাজ করতে প্রলুব্দ করল, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার ভয়ংকর ভাবে বেড়ে গেছে। তথাপি মিঃ ফরবেস্ এখানে এমন কয়েকটি পরিবারের সন্ধান পেয়েছেন যারা দু'পুরুষ ধরে কোনক্রমে টিকে আছে এবং এখনও তাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক কিছু কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরিসংখ্যান ছাড়াই একথা বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমহ্রাসমান এবং পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উচ্চ-মালভূমির লোকেদের মতো তাদের শারীর কাঠামো তত দীর্ঘ নয় এবং তাদের ফেমোরা দৈর্ঘে কিছুটা বেড়ে গেছে, এবং তুলনায় কম হলেও টিবিয়াও কিছুটা বেড়েছে। এ-বিষয়ে প্রকৃত পরিমাপগুলি জানা যেতে পারে মিঃ ফরবেস্-এর স্মৃতিকথা পড়ে। এরপরে সম্ভবত আর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে দীর্ঘ কয়েক পুরুষের বাসস্থান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ভাবেই শরীরের আনুপাতিক গঠনবিন্যাসে বংশগত রূপান্তরের কারণ হতে পারে।[৯]

৯। ডঃ উইলকেন্স্ (দ্রষ্টব্য, 'ল্যাণ্ডউইর্দ শেফ্‌ট্ উসেন্ ব্লাট Landwirth schaft wochenblatt", সংখ্যা ১০, ১৮৬৯) সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কৌতূহলদীপক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গৃহপালিত প্রাণীদের দৈহিক গঠন কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

যদিও পরবর্তীকালে কোন বিশেষ অঙ্গের বর্ধিত বা অবদমিত ব্যবহারের ফলে মনুষ্য দেহে তেমন কোন রূপান্তর হয়ত ঘটতে পারে, তথাপি উপরিল্লিখিত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে এ বিষয়ে তার দায় এখনো পুরোপুরি লোপ পায়নি এবং আমরা নিশ্চিত যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই নিয়ম এখনও ক্রিয়াশীল। ফলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে সুদূর অতীতে যখন মানুষের আদি পূর্বপুরুষরা পরিবর্তনশীল অবস্থায় ছিল এবং ক্রমে চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণীতে পরিণত হচ্ছিল, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্ভবত শরীরের বিভিন্ন অংশের বর্ধিত বা অবদমিত ব্যবহারের বংশগত প্রভাব দ্বারা দারুণভাবে উপকৃত হয়েছিল।

বিকাশের গতিরোধ : গতিরুদ্ধ বিকাশ ও গতিরুদ্ধ বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে অঙ্গগুলির সাধারণ বৃদ্ধির কোন হানি ঘটে না, যদিও তারা বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায়ই থেকে যায়। বিচিত্র অস্বাভাবিক অঙ্গগুলি এর মধ্যে পড়ে এবং কোন-কোনটা, যেমন নাকের নীচে চেরা ঠোঁট, (cleft-palate) প্রায়শ বংশানুক্রমিক বলে পরিচিত। অধ্যাপক ভোগ-এর বর্ণনানুযায়ী জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নির্বোধের (microcephalous idiots) গতিরুদ্ধ মস্তিষ্ক-বিকাশের কথাটা এখানে উল্লেখ করাই আপাতত যথেষ্ট। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের করোটি অনেক ছোট এবং দেখা যায় মস্তিষ্কের ভাঁজ প্রায় জটিলতামুক্ত এবং তাদের কপালের হাড় বা দুই ভ্রু-র মাঝখানের প্রক্ষিপ্ত অংশ যথেষ্ট বিকশিত এবং চোয়াল সামনের দিকে প্রায় 'নির্লজ্জভাবে' এগোনো, ফলে এজাতীয় জড়বুদ্ধি কখনো কখনো মানুষের আদি পূর্বপুরুষের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য মানসিক ক্ষমতা খুবই দুর্বল। কথা বলার শক্তি নেই, বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘ মনোযোগ স্থাপন তাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু কমবেশি অনুকরণের ক্ষমতা তাদের থাকে। সাধারণত এরা বেশ শক্তিশালী এবং যথেষ্ট কর্মঠ হয়, প্রায় সারাক্ষণ নেচে-কুঁদে, লাফিয়ে বেড়ায় এবং নানারকম মুখভঙ্গী করে। এরা প্রায়ই চার হাত-পায়ে সিঁড়ি চড়ে এবং আশ্চর্য ব্যাপার হল উঁচু আসবাব বা গাছে চড়তে এরা খুব ভালোবাসে। ভেবে দেখুন, কমবয়সের ছেলেরা গাছে চড়ার সুযোগ পেলে কেমন খুশি হয়, আবার ভেড়া, ছাগল বা উচ্চ উপত্যকার যে-কোন প্রাণীই ছোটখাটো টিলায় ওঠার সময় কীভাবে আনন্দ প্রকাশ করে। আরো কিছু কিছু বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে এদের মিল আছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা নথিভুক্ত আছে যে কীভাবে এরা প্রতি গ্রাস খাওয়ার আগে সতর্কভাবে তা একবার শুঁকে নেয়। এরকম এক জড়বুদ্ধি ব্যক্তি উকুন মারতে হাতের সঙ্গে মুখও ব্যবহার করত।

এরা অধিকাংশই অত্যন্ত নোংরা ধরনের অভ্যাসে স্বচ্ছন্দ, এদের কোন সৌন্দর্য বা শালীনতার বোধ নেই এবং এদের অনেকেরই শরীরময় রোমের আধিক্য দেখা যায়।[১০]

বংশগতির মাধ্যমে লুপ্তাংশের পুনরাবর্তন : এখানে যা লিখছি তার কিছু কিছু আগের অনুচ্ছেদে (বিকাশের গতিরোধে) হয়তো বলা যেত। শরীরের কোন একটি অংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবার পরও যখন অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একই প্রজাতির কোন নিম্নশ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত প্রাণীর ঐ অংশটির প্রায় সদৃশ রূপ সে না পায়, এক অর্থে তাকে লুপ্তাংশের পুনরাবর্তন বলা যেতে পারে। একই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীরা, আমাদের একই সাধারণ পূর্বপুরুষদের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করে। এ-কথা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে শরীরের একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভ্রূণের বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে গতিরুদ্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুনরায় বাড়তে থাকবে. যাতে অবশেষে তার প্রকৃত কাজটি সে করতে পারে, যদি না এখনকার এই ব্যতিক্রমধর্মী গতিরুদ্ধ অংশটি বহু যুগ পূর্বে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় কার্যকরী ছিল, তখনই এই ক্ষমতা সে অর্জন করে থাকে।

এক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধের (microcephalous idiot) সরল মস্তিষ্ক বাঁদরের মস্তিষ্কগঠনের সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত সাদৃশ্যযুক্ত দেখা যায় যে তাকে এই অর্থে পুনরা-বর্তনের উদাহরণ বলা যেতে পারে।[১১] এরকম আরো অনেকগুলি ঘটনাই

১০। অধ্যাপক লেকক্ পশু-সদৃশ নির্বোধদের (idiots) 'থেরয়েড' নামে চিহ্নিত করে তাদের চরিত্রের সারসংকলন করেছেন। দ্রষ্টব্য "জার্নাল অফ্ মেন্টাল সায়েন্স", জুলাই, ১৮৬৩। আবার ডঃ স্কট (দ্রষ্টব্য, "দ্য ডেফ্ এ্যাণ্ড ডাম্ব", দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৭০, পৃঃ ১০) খাবারের গন্ধ সম্পর্কে তাদের অচেতনতার কথা প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়টি ও নির্বোধদের লোমশতা বিষয়ক ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ডঃ মডস্লে-র গ্রন্থ, "বডি এ্যাণ্ড মাইণ্ড", পৃঃ, ৪৬ থেকে ৫৭ ; পাইনেল্ ও জনৈক নির্বোধের লোমশতা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানিয়েছেন।

১১। আমার "ভ্যারিয়েশন্স্ অফ্ অ্যানিম্যালস্ আন্ডার ডোমেষ্টিকেশন" (২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭) বইটিতে শরীরে অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি রয়েছে, এমন অনেক স্ত্রী লোকদের কথা জানিয়েছি এবং এর কারণ হিসাবে আমি পূর্বপুরুষের শারীরিক গঠনে প্রত্যাবর্তনের কথাই উল্লেখ করেছিলাম। মেয়েদের বুকে সুসমঞ্জসভাবে অবস্থিত অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি থাকার ঘটনাটি লক্ষ্য করেই আমি এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। বিশেষ করে একটি ঘটনা আমাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গিয়েছিল,—জনৈকা স্ত্রীলোকের কুঁচকিতে একটি কার্যকরী স্তনগ্রন্থি ছিল এবং তাঁর মায়ের শরীরেও ছিল অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি। কিন্তু আমি এ-ও দেখেছি যে শরীরের নানা অঞ্চলে, যেমন পিঠ, বাহুমূল বা উরুতে স্তনগ্রন্থির মত দেখতে অংশ (mamae erraticae) সৃষ্টি হয়, জনৈকা নারীর উরুতে সৃষ্টি হওয়া এরকম স্তন থেকে এত দুধ পাওয়া যেত, যে তার সাহায্যেই তার বাচ্চাকে দিব্যি খাওয়ানো যেত। কাজেই, অতিরিক্ত স্তনগ্রন্থি সৃষ্টির কারণ হচ্ছে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন

—এই সিদ্ধান্তটি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাসত্ত্বেও সিদ্ধান্তটিকে এখনও আমি যথেষ্ট সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত বলেই মনে করি, কারণ এমন অনেক নারীর কথা আমি জানতে পেরেছি, যাদের বুকে সমনঞ্জসভাবে অবস্থিত দু'জোড়া স্তন দেখা গেছে। সকলেই জানে যে লেমুর জাতীয় বাঁদরের বুকে দু'জোড়া স্তন থাকে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন শুনি যে এমন পাঁচজন পুরুষ মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের প্রত্যেকের শরীরে একজোড়ারও বেশী করে স্তন আছে (অবশ্যই একেবারে প্রাথমিক ধরনের)। দ্রষ্টব্য "জার্নলি অফ্ অ্যানাটমি এ্যাণ্ড ফিজিওলজি," ১৮৭২ পৃঃ ৫৩; এখানে ডঃ হ্যাণ্ডিসাইড দু'জন ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে এই অস্বাভাবিক অংশটি দেখা গেছে। আরো দ্রষ্টব্য ডঃ বার্টেলস্-এর গবেষণাপত্র, "রিচার্টস্ অ্যাণ্ড দ্য বোয়া-রেমণ্ডস্ আর্কাইভ (Reichert's and du bois-Reymand's Archiv)",-এ, ১৮৭২, পৃঃ ৩০৪ ; তাছাড়া ডঃ বার্টেলস্ একজন মানুষের শরীরে পাঁচটি স্তনগ্রন্থির কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মধ্যে একটি মোটামুটি বিকশিত অবস্থায় নাভির উপরে অবস্থিত ছিল। মেবেল ফন্ হেনস্বাথ্ মনে করেন যে এই ঘটনাটি কিছু কাইরোপ্টেরা (Cheiroptera) জাতীয় প্রাণীর মোটামুটি বিকশিত স্তনের (medial mamae) সঙ্গে তুলনীয়। মোটের উপর আমাদের কিছু সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে যে মানুষের পূর্ব পুরুষদের শরীরে একজোড়ায় অধিক স্তনের অস্তিত্ব না থাকলে পরবর্তীকালের নারী বা পুরুষদের মধ্যে অতিরিক্ত স্তন কখনোই যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠতে পারত কি না।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থটিতে (Variations of Animals under domestication, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা—১২) কিছু দ্বিধা সত্ত্বেও আমি একাধিক উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছিলাম মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর হাতে বা পায়ে পাঁচটির বেশী আঙুল (Polydactylism) আসলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়াকেই (reversion) সমর্থন করে। কিছু আইসথিওপটেরিজিয়া (Ichthyopterygia) প্রাণীর হাতে বা পায়ে পাঁচটির বেশী আঙুল আছে—অধ্যাপক ওয়েনের এই তথ্য আমাকে অনেকটাই সহায়তা করেছিল, যার ফলে আমি ধারণা করেছিলাম যে এগুলি (আঙুল) প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক জিগেনবোর (দ্রঃ জেনাইশ্চেন জেইতশ্চরিফ্ত্", বি· ৫, হেফ্ট ৩, এস.—৩৪১) অধ্যাপক ওয়েনের বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে, হাড়ের কেন্দ্রীয় অবস্থানের (central chain) উভয় পাশে গাঁট যুক্ত হাড়ের আভাস (bony rays) থাকা প্যাডেল সেরাটোডাস প্রাণীদের (Paddle ceratodus) সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ গান্থার বলেছেন মধ্যমার একপাশে বা দুইপাশে ছ'টি বা তার বেশী আঙুল এমন কিছু বড় রকমের অসুবিধা সৃষ্টি করে না ; এক্ষেত্রে এগুলি প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পুনরুদ্ভাবিত হয়। ডঃ কুতেভিন আমাকে জানিয়েছেন যে এমন একজন লোকের কথা তাঁরা নথিভুক্ত করেছেন যার হাতে ও পায়ে ২৪টি করে আঙুল আছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে অত্যধিক আঙুলের উপস্থিতি প্রত্যাবর্তনের জন্যে হলেও তা শুধুমাত্র বংশগতির মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়, এবং তার চেয়েও বড় কথা হল, আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি যে, নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্বাভাবিক আঙুলের মতো তা ছেদনের পর পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা লাভ করে। অবশ্য আমি আমার বইয়ের (দ্রঃ "Variations of Animals under Domestication") দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যাখ্যা করেছি কেন এখন আমি নথিভুক্ত বিভিন্ন ঘটনার এই ধরনের পুনরুৎপাদনের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল নই। তথাপি লক্ষণীয় যে বেশীর ভাগ গতিরুদ্ধ বিকাশ ও শারীরিক অংশের প্রত্যাবর্তন একটি আন্তঃসম্পর্কিত পদ্ধতি বিশেষ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ঐ অবস্থায় বা গতিরুদ্ধ দশায় ভ্রূণের বিভিন্ন প্রকার গঠন-আকৃতি যা অধ্যাপক মেকেল ও অধ্যাপক ইজিডোর জিওফ্রে সেণ্ট-হিলেয়ার বার বার উল্লেখ করেছেন যেমন, নাকের নিচে চেরা ঠোঁট, যুগ্ম জরায়ু, ইত্যাদির কথা। কিন্তু এখন বোধহয় সবচাইতে নিরাপদ হবে যদি আমরা একইসঙ্গে অত্যধিক আঙুলের বিকাশ ও কিছু নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংগঠিত পূর্বপুরুষদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া শারীরিক অংশের মধ্যে সম্পর্কের ধারণাটি আপাতত সরিয়ে রাখি।

আমাদের বর্তমান শিরোনামে আলোচিত হতে পারে। শরীরের কিছু কিছু অংশ যা হামেশাই মানুষের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত নিম্নজাতের প্রাণীতে দেখা যায়, কখনো কখনো সেটা মানুষের মধ্যেও দেখা দিতে পারে, যদিও স্বাভাবিক মনুষ্য ভ্রূণে তার দেখা পাওয়া যায় না। হঠাৎ যদিও বা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে তারা অস্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হতে থাকে। অবশ্য মানব শ্রেণীভুক্ত নিম্নজাতির প্রাণীতে বিকাশের ঐ ধারাই স্বাভাবিক। এই মন্তব্যগুলি পরবর্তী উদাহরণে আরো পরিষ্কার হবে।

বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে জরায়ু ক্রমশ দুটি স্বতন্ত্র মুখ (orifices) ও পরিসর (passages) সহ একটি যুগ্ম-অঙ্গ (যেমনটা দেখা যায় ক্যাঙ্গারুর ক্ষেত্রে) থেকে একক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বাঁদর বা মানুষের ক্ষেত্রে জরায়ুতে সামান্য একটি অন্তর্বর্তী ভাঁজ যদিও দেখা যায়, তবুও তাকে কোনভাবেই যুগ্ম-অঙ্গ বলা চলে না। ইঁদুরের ক্ষেত্রে উভয় সীমার মধ্যবর্তী সঠিক পর্যায়ক্রম প্রমাণিত হতে দেখা যায়। সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেই জরায়ু ক্রমবিকশিত হয় দুটি প্রাথমিক নালী (primitive tubes) থেকে, যারা নিম্নতর অংশ 'করনুয়া' (cornua) গঠন করে। ডঃ ফ্যারে এভাবে বলেছেন "অন্তসীমায় দু'টি করনুয়ার মিলনে মানুষের দেহে জরায়ু অঙ্গটি গঠিত হয়, আবার সেইসব প্রাণীর ক্ষেত্রে যাদের মধ্যাংশ নেই, করনুয়া দুটি একত্রিত হয় না। জরায়ুর ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করনুয়াদুটি হয় জরায়ুর সঙ্গে মিশে যায় অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ ক্রমশ ছোট হতে থাকে।" উচ্চশ্রেণীর প্রাণী থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণীর বাঁদর বা লেমুর জাতীয় প্রাণী পর্যন্ত জরায়ুর গঠনবৈশিষ্ট্য করনুয়া অংশ থেকেই লক্ষণীয়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এ-ধরনের ঘটনা খুব বিরল নয়, যেখানে পরিণত জরায়ুতেও করনুয়া দেখা যায় বা যেখানে জরায়ু অংশত দু'ভাগে বিভক্ত। অধ্যাপক ওয়েনের মতে এই রকম ঘটনায় 'সুসংবদ্ধ ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি' (the grade of concentrative development) পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়, যা একশ্রেণীর ইঁদুরের (rodants) মধ্যে বেশি দেখা যায়। এখান থেকে সম্ভবত আমরা ভ্রূণের বিকাশপর্যায়ে একটি সাধারণ গতিরুদ্ধতা, যা একইসাথে পরবর্তী সময়ে আশানুরূপ উন্নত ও সুষম কার্যকারিতার দিক থেকে যথেষ্ট বিকশিত, তার একটা উদাহরণ পাচ্ছি, যেহেতু এই অংশত যুগ্মজরায়ুর উভয় অংশই গর্ভধারণের প্রয়োজনীয় কাজ করতে সক্ষম। অন্যান্য কিছু বিরল ঘটনার ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র জরায়ুর প্রতিটির সঠিক মুখ ও পরিসরসহ গঠিত হতে দেখা যায়।

ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ কালে এরকম কোন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সাধারণত যেতে হয় না ; এবং একথা বিশ্বাস করা কষ্টকর, যদিও তা একেবারে অসম্ভব নয় যে, দুটি সাধারণ, আদিমও সূক্ষ্ম নালী নিজেরাই জানে না যে (যদি এইভাবেই বলা যায়) কিভাবে তারা, প্রত্যেকে সুনির্মিত মুখ ও পরিসর সহ অসংখ্য মাংসপেশী, স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থি, শিরা-উপশিরায় সজ্জিত দুটি স্বতন্ত্র জরায়ুতে পরিণত হতে পারে, যদি-না তারা পূর্বকালে বিকাশের ঐ একই পর্যায়ক্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে থাকে, যেমন ক্যাঙ্গারু জাতীয় প্রাণীদের বেলায় ঘটে থাকে। কেউই বলতে পারেন না যে স্ত্রীলোকদের যুগ্ম-জরায়ুর মতো এ-রকম অস্বাভাবিক, কিন্তু নিখুঁত পরিপূর্ণ গঠন-কাঠামো নিছক আকস্মিকতার ফল। পুনরাবর্তনের নীতি দিয়েই বরং তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যার ফলে দীর্ঘদিন হারিয়ে যাওয়া কোন কাঠামো আবার পুনরাবির্ভূত হয়, এবং দীর্ঘ কালের ব্যবধানেও ঐ কাঠামোর পূর্ণ বিকাশে সেটা সহায়তা করে।

অধ্যাপক ক্যানেসত্রিনি উপরিল্লেখিত অনুরূপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ ও বিচার বিবেচনা করার পর অবশেষে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ম্যালার হাড়ের (malar bone)[১২] কথা উল্লেখ করেন, যা কোন কোন শ্রেণীর বাঁদর ও অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। দু'মাস বয়সের মানুষের ভ্রূণে এই হাড় এইভাবেই থাকে, এবং গতিরুদ্ধ বিকাশের ফলে এমনকি পরিণত মানুষের ক্ষেত্রেও একই অবস্থায় তা দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর মানব-জাতিগুলির (prognathous)

১২। অধ্যাপক ক্যানেস্ত্রিনি তাঁর বইয়ের (দ্রঃ "Annuario della Soc. dcl Naturalistic in Modena," ১৮৬৭) ৮৩ পাতায় প্রমাণিত তথ্য সহ এই বিষয়ের উপর অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। অধ্যাপক লারিলার্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন বিভিন্ন প্রকার মানুষ ও কিছু বাঁদরের দেহে দুটি ম্যালার হাড়ের (malar bone) গঠন, সৌষ্ঠব, এমনকি সম্পর্ক পর্যন্ত সম্পূর্ণ একই রকমের। তাছাড়া তিনি মনে করেন না যে এদের এই বিন্যাস কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র। এই ব্যাপারে ডঃ সারিওতির একটি গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে তুরিনের পত্রিকায় (দ্রঃ Gazzetta delle cliniche, Turin, ১৮৭১)", তাতে তিনি বলেছেন হাড়ের বিভাজন-চিহ্ন শতকরা দু'ভাগ পরিণত করোটিতে পাওয়া যেতে পারে এবং তা কখনোই অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় আর্যজাতির পূর্বপুরুষদের মধ্যে বেশী ছিল বলে দাবি করা যায় না। এই বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্যঃ জি. দেলোরেনজি ("The nuovi casi d'anomalia dell'osso malare," Torino, ১৮৭২) এবং অধ্যাপক ই. মর্শেলি ("Sopra unarara anomalia dell'osso malare," Modena, ১৮৭২)। এখনও পর্যন্ত আমি যতদূর জানি অধ্যাপক গ্রুবার সম্প্রতি হাড়ের বিভাজন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বই লিখেছেন। এসমস্ত উল্লেখ করা এই জন্য যে জনৈক সমালোচক উপযুক্ত কোন ভিত্তি ছাড়াই দ্বিধাহীনভাবে আমার বিবৃতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মধ্যে। তাই অধ্যাপক ক্যানেস্ত্রিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে—মানুষের কোন আদি পুরুষের মধ্যে এই হাড়টি দুটি স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত ছিল যা পরবর্তীকালে সম্মিলিত এককে পরিণত হয়েছে। মানুষের কপালের হাড় (frontal bone) একটি মাত্র অংশ নিয়ে গঠিত, কিন্তু মনুষ্যভ্রূণে বা শিশুদের ক্ষেত্রে, এমনকি প্রায় সমস্ত নিম্নশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দুটি স্বতন্ত্র গঠন-কাঠামো একে অপরকে আলাদা করেছে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে এই দুই অংশের জোড়ালাগার চিহ্ন ক্ষেত্রবিশেষে কমবেশি স্পষ্ট, এবং এখনকার তুলনায় মানুষের আদি পূর্বপুরুষের মাথার খুলিতে এটা অনেক বেশী দেখা যায়। অধ্যাপক ক্যানেস্ত্রিনি এই বিষয়টি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছেন, ড্রিফ্‌ট (Drift)-এর কবরখানা থেকে পাওয়া করোটি এবং বাঁদর জাতীয় প্রাণীর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত মানুষের করোটির হাড়ে (brachycephalic type)। এখানেও তিনি ম্যালার হাড়ের মত অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই উদাহরণটি বা এখানে উল্লিখিত অন্যান্য উদাহরণ থেকে বোঝা যায়—কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে মানুষের আধুনিকজাতিগুলির তুলনায় আদিম জাতিগুলির সাথে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিকট সাদৃশ্যের কারণ সম্ভবত আধুনিক জাতিগুলি ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পর্যায়ক্রমে তাদের একেবারে প্রথমদিককার আধা-মানুষ পূর্বপুরুষদের থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে।

পূর্বোল্লিখিত ঘটনাটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত মানুষের আরো অনেক অস্বাভাবিক গঠনবৈশিষ্ট্য নিয়ে পুনরাবর্তনের উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন লেখক আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনাই অল্পবিস্তর সংশয়ের কারণ হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দীর্ঘ সারণীর একেবারে নীচের ধাপে এই একই গঠন-কাঠামো যুক্ত প্রাণীদের স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।[১৩]

মানুষের ছেদকদন্ত (canine teeth) চিবানোর পক্ষে একেবারে আদর্শ। কিন্তু ওয়েন-এর মতে, তাদের প্রকৃত স্বদান্তিয় বৈশিষ্ট্য, "দাঁতের যে অংশ মাড়ি থেকে

১৩। ইজিডোর জিওফ্রে সেন্ট-হিলেয়ার এইসব ঘটনার একটি পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন (দ্রঃ "হিস্তোয়ার দে অ্যানোম্যালি" ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭)। শরীরের বিভিন্ন অংশের গতিরুদ্ধ বিকাশের বেশ কিছু ঘটনা নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে আলোচনা না করায় জনৈক সমালোচক আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে দোষারোপ করেছেন (দ্রঃ "জার্ণাল অফ অ্যানাটমি অ্যাণ্ড ফিজিওলজি," ১৮৭১ পৃষ্ঠা ৩৬৬)। আমার মতবাদ অনুযায়ী, তিনি বলেছেন, "বিকাশের সময় শরীরের কোন অংশের প্রত্যেকটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা শুধু তার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নয়, যদিও পূর্বে এটি নিজেই সেই উদ্দেশ্যই সাধন করেছিল।" এটা জানার পক্ষে জরুরী কিছু বলে আমার মনে হয় না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে কেন বিকাশের প্রারম্ভিক অবস্থায় শারীরিক

বেরিয়ে থাকে তার আকার শঙ্কুর মতো, তলদেশ সামান্য সমুন্নত ; যে ভোঁতা বিন্দুতে তা শেষ হয়, তার বাইরের দিক উত্তল এবং ভিতরের দিক সমতল বা সামান্য অবতল। মেলানিয়ান জাতি, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে এই শঙ্কু আকৃতি সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়। কৃন্তক দন্তের (incisors) তুলনায় ছেদকদন্ত অনেক গভীরে প্রোথিত এবং ধারালো।" মানুষের এই ছেদকদন্ত এখন আর শত্রুনিধনে বা শিকারের প্রয়োজনে বিশেষ অস্ত্র হিসেবে কোন সাহায্য করে না সেইজন্য, এর সংশ্লিষ্ট কাজের বিচারে একে লুপ্তপ্রায় প্রাথমিক বা আদিম অঙ্গ বলা যেতে পারে। মনুষ্যকরোটির যে-কোন বিশাল সংগ্রহে কোন কোনটিতে দেখা যায়, যেমন অধ্যাপক হ্যাকেলও লক্ষ্য করেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে ছেদক দন্ত, তুলনায় সামান্য হলেও, বনমানুষের (anthropomorphus apes) মতোই অন্যান্য দাঁতগুলির চেয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে চোয়ালের দাঁতের সারির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকে যাতে করে বিপরীত দন্তপংক্তির ছেদক দন্ত ঐ জায়গায় বসতে পারে। অধ্যাপক ভাগ্‌নারের উদাহরণে, এক কাফ্রীর (আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশের অধিবাসী) চোয়ালের দাঁতের সারিতে এই ফাঁক যথেষ্ট বড়। আদিম কালের পরীক্ষিত করোটিগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে ছেদক দন্ত খুব বেশী সামনের দিকে এগিয়ে আছে (যদি এখানকার সঙ্গে তার তুলনা করা যায়) এবং নাউলেট মাড়ীর (Naulette) এর ক্ষেত্রে বলা হয় যে তা একেবারে বিশালাকৃতি।

বনমানুষদের মধ্যে দেখা যায় যে শুধু পুরুষ বনমানুষদের ছেদক দন্তই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু স্ত্রী গরিলাদের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে এবং স্ত্রী ওরাংওটাং-এর মধ্যে এই দাঁত অন্যান্য দাঁতের চেয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। তাই নারীদের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা বেরিয়ে থাকা কেনাইন দাঁত দেখা যাওয়ার ব্যাপারটা সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন মারাত্মক বাধা হয়ে ওঠে না যে, এইসব দাঁতের (কেনাইন দাঁত) হঠাৎই বিশাল উন্নতি মানুষের বাঁদরসদৃশ পূর্বপুরুষের কাছে ফিরে যাবার একটি ঘটনা মাত্র। যে ব্যক্তি অতি অবজ্ঞার সাথে এই সিদ্ধান্তকে নাকচ করেন যে, তাঁর নিজের ছেদক দাঁতের আকার

অংশগুলিতে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত থেকেও বৈসাদৃশ্য ঘটে না? তথাপি এই ধরনের বৈসাদৃশ্য সংরক্ষিত হয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় যদি কোন ভাবে তা কার্যকরী হতে পারে, যেমন বিকাশের সময়সীমা কমিয়ে বা সরলীকরণের দ্বারা। আবার কেনই বা অস্তিত্বের পূর্বাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন অপুষ্টিজনিত ক্ষয়কারক অংশ বা অত্যধিক পুষ্টির ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশের মতো ক্ষতিকারক অস্বাভাবিকতা প্রাথমিক অবস্থায় বা পূর্ণতা-প্রাপ্তির সময় দেখা যায় না?

ও অন্যদের মধ্যে ঐ দাঁতের (কেনাইন দাঁত) হঠাৎ-ই বিশাল উন্নতির জন্য দায়ী (আমাদের অতি পূর্বপুরুষরাই যারা এই দাঁতকে ভয়ানক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন) তিনি হয়তো অজান্তেই নিজের ক্রমবিকাশের ধারাকে প্রকাশ করেন। যদিও এই দাঁতগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছে বা ক্ষমতা তাঁর আর না থাকলেও, অবচেতন ভাবেই তিনি তাঁর দাঁত-খেঁচানো পেশী বা "স্ন্যারলিং মাস্‌লস" কে (স্যার সি, বেল কর্তৃক নামাঙ্কিত) কুঁচকিয়ে দাঁতগুলোকে আক্রমণের জন্য উদ্যোগী করে দেখাবেন, ঠিক যেভাবে কুকুরেরা ঝগড়ার জন্য প্রস্তুত হয় আর কি। মানুষের দেহে মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি পেশী বিকাশলাভ করে যেগুলি কেবলমাত্র বাঁদর জাতীয় বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেই থাকার কথা। অধ্যাপক ভ্ল্যাকোভিচ্ চল্লিশজন পুরুষকে পরীক্ষা করে তাদের উনিশ জনের মধ্যে একটি পেশী দেখতে পান যাকে তিনি নাম দেন ইশ্চিও পিউবিক (ischio-pubic) বলে ; আরো তিনজনের মধ্যে এই পেশীর কিছু অস্তিত্ব থাকলেও অবশিষ্ট আঠারো জনের মধ্যে তার কোন চিহ্ন ছিল না। বত্রিশ জন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করে কেবলমাত্র তিনজনের শরীরের উভয় পাশে এই পেশী বিকশিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল ; অবশ্য আরো তিনজনের মধ্যে প্রাথমিক বন্ধনীর (ligament) আকারে এর অস্তিত্ব ছিল, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে এই পেশীর উপস্থিতি স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী এবং নিম্নশ্রেণীর কোন আকার থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারণার সঙ্গে মেলালে এই বিষয়টিকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় কারণ, নিম্নশ্রেণীর বহু প্রাণীর মধ্যেই এই পেশীটির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাদের সকলের ক্ষেত্রেই জননক্রিয়ায় পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক পেশী হিসাবে এটি কাজ করে।

মিঃ জে উড তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রের [১৪] অত্যন্ত যথাযথ ভাবেই মানুষের মধ্যে পেশীর বিপুল সংখ্যক অস্বাভাবিকতা (muscular variations)

১৪। এই নথিপত্রগুলি অত্যন্ত মনযোগী অধ্যয়নের দাবি রাখে, যদি কেউ জানতে আগ্রহী হন কিভাবে আমাদের মাংসপেশীগুলি বারংবার প্রভেদ সৃষ্টি করে এবং প্রভেদ সৃষ্টি করতে গিয়ে চতুষ্পদী প্রাণীদের সাথে সাদৃশ্য গড়ে তোলে। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি আমার মূল বইতে উল্লিখিত বেশ কিছু দৃষ্টি আকর্ষণকারী বস্তুর সাথে সম্পর্ক যুক্ত (দ্রঃ "প্রক্. রয়্যাল সস্. ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯—৩৮৪ ; ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ২৪১—৪২, ৫৪৪ ; ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ৫২৪)। আমার এখানে এটুকুই বলার আছে যে ডঃ মারী ও মিঃ সেণ্ট জর্জ মাইভার্ট তাদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্থানীয় প্রাণী লেমুর জাতীয় বাঁদরদের কিছু মাংসপেশী কেমন অস্বাভাবিক ভাবে পরিবর্তনশীল। এমনকি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মাংসপেশীর কাঠামোগত পরিবর্তন লেমুরজাতীয় বাঁদরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে ;

সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যেগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের স্বাভাবিক পেশীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। যে পেশীগুলি নিয়মিত আমাদের নিকটতম সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বাঁদর জাতীর প্রাণীদের সাথে সাদৃশ্যমূলক, তাদের সংখ্যা এত বেশী যে আলাদা করে সেগুলির কথা উল্লেখ করাও সম্ভব নয়। শক্তিশালী দৈহিক কাঠামো ও সু-নির্মিত করোটি যুক্ত একজন পুরুষের দেহে কম করে সাতটি অস্বাভাবিক পেশী (muscular variations) লক্ষ্য করা গেছে, যেগুলি সাধারণ ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বনমানুষ জাতীয় বাঁদরের মধ্যে থাকে। যেমন, একজন লোকের গলার দু'পাশে একটা প্রকৃত-শক্তিশালী "লেভাটর ক্ল্যাভিকুলা (Levator claviculae)" পেশী ছিল, যা প্রায় সমস্ত বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় এবং বলা হয় যে প্রতি ষাট জন মানুষের মধ্যে অন্তত একজনের শরীরে এটা থাকে। আবার দেখা যায় ঐ লোকটির পায়ের কড়ে আঙুলের (fifth digit) হাড়ে (metatarsal bone) একটি বিশেষ অ্যাবডাক্টার (একটা পিছন দিকে সরে যাওয়া পেশী) ছিল, যা অধ্যাপক হাক্সলি ও মিঃ ফ্লাওয়ার-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী নিম্নশ্রেণীর প্রায় সব বাঁদরের মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। আমি আর মাত্র দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। একটি হল অ্যাক্রোমিয়ো-ব্যাসিলার (acromio-basilar) পেশী, যা মানুষের থেকে নিম্নশ্রেণীর আর সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আছে এবং মনে হয় এটা চতুষ্পদী প্রাণীদের চলাফেরার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতি ষাট জন মানুষের মধ্যে একজনের শরীরে এটার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরেরটি হল মিঃ ব্রাণ্ডলি কর্তৃক আবিষ্কৃত মানুষের দুই পায়ে অবস্থিত একটা পেশী—অ্যাবডাক্টর ওসিস মেটাটারসি কোয়ান্তই (abductor ossis metatarsi quinti)। এর আগে পর্যন্ত এই পেশীটি মানুষের শরীরে বর্তমান আছে বলে জানা যায় নি। কিন্তু জানা ছিল যে এটা বনমানুষদের শরীরে সর্বদাই থাকে। হাত ও বাহুর পেশীগুলি, যা মানুষের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সেগুলি মাঝে মাঝে এমনি ভাবে পরিবর্তিত হয় যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের অনুরূপ পেশীর সঙ্গে সাদৃশ্য গড়ে ওঠে।[১৫] এই ধরনের সাদৃশ্য ত্রুটি মুক্ত নতুবা ত্রুটিযুক্ত হয়। তথাপি ত্রুটিযুক্ত ক্ষেত্রেও এরা (পেশী) স্পষ্টতই পরিবর্তনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। পুরুষের শরীরে যেমন নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনি মেয়েদের শরীরেও নির্দিষ্ট কিছু

১৫। অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টার তার পর্যবেক্ষণগুলিকে তালিকা করে সাজিয়ে দেখেছেন যে পেশীগত অস্বাভাবিকতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় অগ্রবাহুতে, তারপর যথাক্রমে মুখমণ্ডল ও পায়েতে।

পরিবর্তন জায়গা করে নেয়, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কারণ অজানা। অসংখ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে মিঃ উড্ অবশেষে এই চমৎকার মন্তব্যটি করেন, "পেশীর গঠনের সাধারণ অবস্থা থেকে কোন নির্দিষ্ট খাতে বা দিকে পরিচালিত কোন বিচ্যুতিক বুঝতে হলে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক শারীরসংস্থানের ব্যাপক জ্ঞানের দ্বারা তার পিছনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অজানা কারণটিকে বুঝতে হবে।"[১৬]

মানুষের ক্ষেত্রে এই অজানা কারণটি বলা যেতে পারে অস্তিত্বের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যাবর্তন।[১৭] যথেষ্ট নিশ্চিত ভাবেই কোন জিনঘটিত সম্পর্ক (genetic conmeetson) না থাকলে একজন মানুষের কম করে সাতটি পেশীর সঙ্গে কিছু বাঁদরের পেশীর সাদৃশ্যকে কোনভাবেই শুধু সমাপতন বলে বোঝা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, বাঁদর সদৃশ কোন জীব থেকে মানুষ ক্রমবিকশিত না হয়ে থাকলে কোন বৈধ যুক্তি খাড়া করা যাচ্ছে না যে কেন কিছু পেশী কয়েক হাজার বছর বিরতির পর আবার আকস্মিক ভাবে ফিরে আসছে, ঠিক যেভাবে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের পায়ে ও কাঁধের উজ্জ্বল

১৬। রেভারেণ্ড ডঃ হগ্‌টন মানুষের হাতে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙগাস (flexor pollicis longus) পেশীটির একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য জানিয়ে (দ্রঃ "প্রক্. আর. আইরিশ অ্যাকাদেমী", ২৭শে জুন, ১৮৬৪, পৃঃ ৭১৫) বলেছেন, "এই চমৎকার উদাহরণটি থেকে বোঝা যায় যে মানুষ কখনো কখনো ম্যাকাকাস জাতীয় বাঁদরদের (macaque) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হাতের বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলের পেশীবন্ধ (tendons) ব্যবস্থা ধারণ করে ; কিন্তু আমার নিশ্চিত ভাবে জানা নেই এরকম কোন ঘটনা থেকে এটা মনে হতে পারে কি না যে ম্যাকাকাস মানুষকে উর্দ্ধমুখে ঠেলে দিচ্ছে বা মানুষ ম্যাকাকাসকে নিম্নমুখে ঠেলে দিচ্ছে অথবা এটা প্রকৃতির সম্পূর্ণ সহজাত একটি খেয়াল।" অবশ্যই এটা আশাব্যঞ্জক যে একজন যোগ শারীরতত্ত্ববিদ ও বিবর্তনবাদের একজন তীব্র বিরোধীপক্ষ প্রথম দুটি উক্তির মধ্যে যে কোন একটির সম্ভাব্যতা আছে বলে স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক ম্যাকালিস্টারও চতুষ্পদী বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের ফ্লেক্সর পলিসিস্ লঙগাস পেশীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উল্লেখযোগ্য নানা বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন (দ্রঃ "প্রক্, আর. আইরিশ অ্যাকাদেমী", ১০ম খণ্ড, ১৮৬৪, পৃঃ ১৩৮)।

১৭। এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পূর্বে মিঃ উড অপর একটি প্রবন্ধে গলা, ঘাড় ও বুকের কিছু পেশীর বৈসাদৃশ্যের কথা বলেছেন (দ্রঃ "রিল ট্রানজাক্শনস্," ১৮৭০ দ্রঃ, পৃঃ ৮৩) তিনি এখানে দেখান যে এই পেশীগুলি কী ভীষণ পরিবর্তনশীল এবং নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের স্বাভাবিক পেশীগুলির সঙ্গে এরা কত বেশী নিকট সাদৃশ্য যুক্ত। অবশেষে তিনি বিষয়টি উপসংহার টানেন এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে "আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে যদি আমি দেখাতে সমর্থ হই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গঠন-আকৃতি মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে বৈচিত্রতা আনার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্পষ্ট কার্যের ধারা প্রদর্শনি করে এবং তাকে শারীরতত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে ডারউইনের প্রত্যাবর্তন নীতি বা বংশগতির সূত্রের প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

বর্ণের ডোরাকাটা দাগের হঠাৎ-ই আবির্ভাব হচ্ছে কয়েকশ অথবা বলা যায় হাজার পুরুষের বিরতির পরে।

পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার এইসব বিভিন্ন ঘটনাগুলি প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বা প্রাথমিক অঙ্গের সাথে এত ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত যে তাদের অনেকগুলির এখানে-সেখানে অসতর্ক ভাবে বলা হয়ে গেছে। এইভাবে করনুয়া (furnished with cornua) দিয়ে গঠিত মানুষের জরায়ুকে বলা যেতে পারে যে এটা প্রাথমিক বা আদিম অবস্থাকে প্রকাশ করছে, কারণ ঐ একই অঙ্গ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় বর্তমান আছে। মানুষের মধ্যে কিছু লুপ্তাঙ্গ বা আদিম অঙ্গ, যেমন উভয় লিঙ্গে অনুত্রিকাস্থি (os coccyx) ও কেবল পুংলিঙ্গে দুগ্ধ গ্রন্থি (mammae) প্রায় সবসময় দেখা যায়। আবার অন্য কিছু অংশ, যেমন সুপ্রা-কণ্ডিলয়েড ফোরামেন (হিউমারাস-এ অবস্থিত একটি ছিদ্র) কেবলমাত্র মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং সেই জন্য এগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া বা প্রত্যবর্তনের বিষয় হিসেবে বলা যেতে পারে। স্বতন্ত্র এই প্রত্যাবর্তিত গঠন-আকৃতি (reversionary structures) যা নিশ্চিতভাবে আদিম বা লুপ্তপ্রায় (rudimentory) অঙ্গ তা নিম্নশ্রেণীর কোন জীবের আকার থেকে ত্রুটিমুক্ত উপায়ে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারণাকে ব্যক্ত করে।

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরিবর্তন : মানুষের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কিছু গঠন-আকৃতি এত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে একটি অংশ পরিবর্তিত হলে অন্যটিওপরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা তার কারণ দর্শাতে অসমর্থ হই। অথচ আমরা বলতে পারি না যে একটি অংশ আর একটিকে পরিচালিত করছে কিনা অথবা উভয়েই প্রাথমিক দশায় বিকশিত তৃতীয় কোন অংশ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা। তাই অধ্যাপক আই জিওফ্রয় বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে দেহের বিভিন্ন অস্বাভাবিক অংশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। অনুরূপ গঠন-আকৃতিযুক্ত অংশ একসাথে পরিবর্তিত হতে বাধ্য, ঠিক যেমন আমরা দেখি দেহের দুই বিপরীত অংশে এবং উপর ও নীচের হাত-পায়ের মধ্যে। অধ্যাপক মেকেল্ অনেক আগে মন্তব্য করেছিলেন—যখন বাহুর পেশী তাদের প্রকৃত অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়, তখম তারা অধিকাংশই প্রায় পায়ের পেশীকে অনুকরণ করে এবং বিপরীতক্রমে পায়ের পেশীও হাতের পেশীকে নকল করে। দেখা ও শোনার অঙ্গ, দাঁত ও চুল, চামড়ার রঙ, চুলের রঙ ও গঠন সকলেই কম-বেশী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক শ্যাফহাউসেন সর্ব প্রথম পেশীর গঠন ও বলিষ্ঠ সুপ্রা-অরবিটাল রিজের মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক সম্বন্ধে দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন যা নিম্নজাতির মানুষদের মধ্যে খুব বেশী চোখে পড়ে। যে সমস্ত বৈসাদৃশ্যগুলিকে কম-বেশী সম্ভাব্যতা সহ পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলির শিরোনামে বিন্যস্ত কর যায়, তাছাড়াও তাদের একটি বড় অংশকে শর্তসাপেক্ষে বলা যেতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত ; কারণ তাদের আবির্ভাব সম্পর্কে উপযুক্ত কারণ আমাদের অজ্ঞানতার জন্য অজানাই রয়ে গেছে। তথাপি দেখানো যেতে পারে যে এই ধরনের বৈসাদৃশ্য, তা সে একক প্রতি সামান্য পার্থক্য অথবা গঠন-আকৃতির উল্লেখযোগ্য ও আকস্মিক বিচ্যুতিসহ যুক্ত পার্থক্য যাই হোক না কেন, অনেক বেশী নির্ভর করে পরিবেশগত অবস্থার উপর, যার মধ্যে দিয়ে সে বেড়ে ওঠে এবং তার চেয়েও প্রাণীর নিজস্ব গঠন আকৃতির উপর।

প্রজনন সংখ্যা বৃদ্ধির হার : অনুকূল অবস্থায় সভ্য মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত পঁচিশ বছরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং অধ্যাপক ইউলার-এর হিসেব অনুযায়ী আগামী বারো বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও কিছু বেশী হবে। যদি পঁচিশ বছরের হিসেব ধরি তবে আমেরিকার বর্তমান লোকসংখ্যা (প্রায় তিন কোটি) ৬৫৭ বছরের মধ্যে জল-স্থল সর্বক্ষেত্রে এত ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে যাবে যে চারজন লোকের জন্য একবর্গগজ জমি বরাদ্দ হবে। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাথমিক বা মৌলিক বাধা হয়ে দাঁড়ায় জীবিকা নির্বাহ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্যা। এই বিষয়টি অনুমান করতে আমাদের বেগ পেতে হয় না যখন দেখি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জীবন নির্বাহ করা অনেক সহজ এবং প্রচুর জমি জায়গাও এখানে রয়েছে। যদি এই সমস্ত জিনিস—জমি, জীবিকা নির্বাহের উপায় ইত্যাদি ব্রিটেনে হঠাৎ-ই দ্বিগুণ হয়ে যেত, তবে আমাদের লোকসংখ্যাও দ্বিগুণ হয়ে যেত। সভ্য জাতিগুলি প্রধানত সংযত বিবাহ প্রথার মধ্যে দিয়ে এই প্রাথমিক বাধাকে কার্যকরী করে। এছাড়া অত্যন্ত দরিদ্র জাতিগুলির মধ্যে খুব বেশী মাত্রায় শিশু-মৃত্যুর হারও লক্ষণীয়। একই সাথে লক্ষণীয় নানা রোগে আক্রান্ত প্রায় সকল বয়সের মানুষের একটি বড় সংখ্যার মৃত্যু, যারা খুব স্বল্প জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে বসবাস করে। আবার মহামারী ও যুদ্ধের ফলে যে লোক সংখ্যা হ্রাস পায়, শীঘ্রই তা পরিপূরণ হয়ে যায় এবং জাতিগুলি অনুকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেলে সেই সংখ্যা পরিপূরণকেও ছাড়িয়ে যায়। দেশত্যাগের সংখ্যা সাময়িক বাধার পক্ষে কিছু সহায়ক হলেও সত্যিকারের গরিব লোকদের কাছে তার বিশেষ কোন প্রভাব নেই।

সভ্য লোকদের তুলনায় অসভ্য বা বুনো লোকদের প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কম—অধ্যাপক ম্যালথাস এই মন্তব্য করলেও তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

কারণ আমরা এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য কিছু জানিনা, যেহেতু অসভ্য লোকদের জন্যে আদমসুমারের কোন ব্যবস্থা নেই। অবশ্য পাদ্রী বা অন্যান্য যারা দীর্ঘকাল এই ধরনের লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছেন, তাঁদের নানা সাক্ষ্য থেকে মনে হয়। এদের পরিবারগুলি সাধারণত ছোট, বড় পরিবার ক্বচিৎ দেখা যায়। এদের স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ সময় যাবৎ শিশুদের স্তন্য পান করায়—এই 'ঘটনা আংশিকভাবে বিবেচনাধীন হলেও এটা ঠিক যে অসভ্য লোকেরা প্রায় সব সময়ই নানা দুঃখ-দুর্দশায় ভোগার জন্য ও সভ্য লোকেদের মত পুষ্টিকর খাদ্য না না পাওয়ার জন্য এদের প্রজনন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পায়। আমি আমার আগের একটি রচনায় দেখিয়েছি যে সমস্ত গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ও পাখী এবং কৃষিকার্য দ্বারা উৎপন্ন উদ্ভিদের প্রজননক্ষমতা প্রকৃতির মুক্ত অবস্থায় থাকা ঐ একই শ্রেণীর প্রজাতি অপেক্ষা অনেক বেশী। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এটা কোন বৈধ আপত্তি বলে গ্রাহ্য হতে পারে না যে পশুপাখীদের জন্য হঠাৎ-ই অত্যধিক খাবারের যোগান বা খুব মোটা হয়ে পড়া এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আকস্মিক অত্যন্ত খারাপ মাটি থেকে অত্যন্ত উর্বর মাটিতে স্থানান্তরকরণ, তাদের কম-বেশী বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। বরং আমরা দেখি সভ্য লোকেরা, যারা একদিক থেকে খুব বেশী গৃহপালিত, তাদের প্রজনন ক্ষমতা বুনো বা অসভ্য লোকেদের তুলনায় অনেক বেশী। আরো মনে হয় যে সভ্যজাতিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রজননক্ষমতা আমাদের গৃহপালিত পশুর মতন একটি বংশগত বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া আমরা তো জানিই মানুষের মধ্যে যমজ সন্তান উৎপাদন একটি বংশগত প্রবণতা।

অ-সভ্য লোকেরা সভ্য লোকেদের তুলনায় কম প্রজননক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা অবশ্যই দ্রুত বৃদ্ধি পেত যদিনা তাদের জনসংখ্যা বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। সম্প্রতি মিঃ হাণ্টারের অনুসন্ধানে ভারতের সাঁওতাল বা পাহাড়ী উপজাতিদের (hill tribes) মধ্যে এই ব্যাপারে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। বসন্ত রোগের টীকা আবিষ্কার হওয়ায়, প্লেগ ইত্যাদি মহামারী প্রশমিত হওয়ায় এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই-টড়াই কমে যাওয়ার ফলে তাদের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। অবশ্য এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হত না যদি তারা পার্শ্ববর্তী জেলা বা প্রদেশগুলোতে ভাড়া-খাটার কাজে ছড়িয়ে না পড়ত। বুনো বা অসভ্য লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই বিয়ে করে; তথাপি তাদের ক্ষেত্রেও কিছু বাধা আছে, কারণ তাদেরা সাধারণত খুব কম বয়সে বিয়ে করা সম্ভব হয় না। বিবাহেচ্ছুদের প্রমাণ করতে হয় যে যারা তাদের স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ যোগাতে সমর্থ এবং সাধারণত বিয়ের কনেকে তার বাপ মায়ের

কাছ থেকে কিনে নেবার জন্য উপযুক্ত টাকা উপার্জন করতে হয় তাদের। বেঁচে থাকবার জন্য উপকরণ সংগ্রহের সমস্যা সভ্য জাতিগুলোর তুলনায় অসভ্য জাতিগুলির জনসংখ্যাকে অনেক বেশী সরাসরি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন প্রায় সমস্ত উপজাতিরাই (tribes) কয়েক বছর অন্তর (periodically) সাংঘাতিক ভাবে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। দুর্ভিক্ষের সময় তারা অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে বাধ্য হয় এবং অচিরেই তাদের শরীর ভেঙে পড়ে। দুর্ভিক্ষের সময় এবং পরে তাদের পেটের অস্বাভাবিক আকার ও কৃশকায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে অনেক পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। এই সময় তারা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের শিশুদের একটি বড় অংশ, অস্ট্রেলিয়ায় আমার নিজের চোখে দেখা, অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। যেহেতু দুর্ভিক্ষগুলি কয়েকবছর অন্তর কিছু বিশেষ ঋতুর উপর নির্ভরশীল, সেইজন্য তাদের জনসংখ্যাও এই সঙ্গেই বাড়ে-কমে। আবার তারা যখন খাদ্য সংগ্রহর জন্য বাধ্য হয়ে একে অপরের এলাকায় ঢুকে পড়ে, তখন তার মীমাংসা হয় লড়াইয়ের মাধ্যমে, অবশ্য প্রায় সকল সময়ই তাদের মধ্যে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এছাড়া খাদ্য অন্বেষণের সময় তারা জলে স্থলে নানান বিপদের সম্মুখীন হয় এবং কোন কোন দেশে জন্তু জানোয়ারের আক্রমণে প্রাণ-সংশয় হতে দেখা যায়। এমনকি ভারতবর্ষের কোন কোন লোকালয় বাঘের আক্রমণে জনশূন্য হয়ে গেছে বলে জানা যায়।

অধ্যাপক ম্যালথাস্ জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই সমস্ত বাধা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি শিশুহত্যা, বিশেষ করে কন্যা শিশু হত্যার বিষয়টির উপর যথেষ্ট জোর দেননি, সম্ভবত যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং গর্ভপাত ঘটানোর বিষয়টি সম্পর্কে তিনি প্রায় অনুচ্চারিত থেকে গেছেন। এই রীতিগুলি এখনো পৃথিবীর নানা অঞ্চলে টিকে আছে এবং শিশুহত্যা মনে হয়, মিঃ ম্লেন্যান্-এর তথ্যানুযায়ী, অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এখনো তা ব্যাপক আকারে প্রথা হিসাবে চালিত রয়ে গেছে। এই রীতি (শিশুহত্যা) অ-সভ্য জাতিগুলির মধ্যে প্রবর্তিত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা বুঝতে পেরেছিল জন্ম নেওয়া সমস্ত শিশুকে প্রতিপালন করার সামর্থ তাদের নেই। এই প্রচলিত ব্যবস্থাবিরুদ্ধতা পূর্বোল্লিখিত বাধাদানের পক্ষে সহায়ক হলেও, এটা ঠিক যে বেঁচে থাকা যে অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়ে তাকে সহায়তা করে না, যদিও এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে কোথাও (জাপানে) জনসংখ্যা অবদমনের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই প্ররোচনা (শিশুহত্যা) দেওয়া হয়।

মানুষ তার মনুষ্যত্বের উপলব্ধিতে পেঁছানোর পূর্বেকার সুদূর সেই যুগে

যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাব তারা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা যতখানি পরিচালিত হত যুক্তি দিয়ে ততটা নয়, এমনকি আজকের দিনের নিম্নশ্রেণীর অ-সভ্য লোকেদের তুলনায় তাদের যুক্তিবুদ্ধির পরিমাণ ছিল অনেক কম। সেইসময় আমাদের আধা-মানুষ পূর্বপুরুষেরা শিশুহত্যা বা মেয়েদের বহু বিবাহ প্রথা রপ্ত করেনি, কারণ, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি কখনো এত বিকৃত[১৮] নয় যে তারা নিয়মিত তাদের নিজ সন্তানকে হত্যা করবে বা তাদের স্ত্রীর উপর অন্যের আধিপত্য নির্দ্বিধায় মেনে নেবে। তাদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে কোন পরিণামজ্ঞাপক বাধা ছিল না এবং অল্প বয়সেই দুই বিপরীত লিঙ্গ একে অপরের সঙ্গে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হত। তাই মানুষের পূর্বপুরুষেরা দ্রুত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল, কিন্তু নিয়ন্ত্রণেরও জন্য নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রাকৃতিক বাধাদানের ব্যবস্থা ছিল, তা সে কয়েকবছর অন্তর বা ঘন ঘন যাই হোক না কেন, এমনকি বর্তমানে অ-সভ্যজাতিগুলির তুলনায় তাদের ক্ষেত্রে বাধা আরো বেশী ছিল। অবশ্য অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বাধাদানের যথাযথ প্রকৃতি কী ছিল সেটা আমরা খুব ভালো জানি না। গৃহপালিত ঘোড়া ও গবাদি পশুদের প্রজনন ক্ষমতা বেশ কম, কিন্তু যখন তাদের দক্ষিণ আমেরিকার খোলামেলা পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হল, দেখা গেল ব্যাপক হারে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিচিত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম সন্তান উৎপাদক হাতি,এখন যে হারে প্রসব করছে যদি এইভাবে করে যায় তাহলে কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী হাতিতে ভরে যাবে। বাঁদরদের প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে, সংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যই কিছু উপায় দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, তা বলে অধ্যাপক ব্রেহাম নির্দেশিত শুধু মাত্র শিকারী জন্তুদের আক্রমণের দ্বারা নয়। এটা অচিন্তনীয় ঘটনা যে আমেরিকার বন্য ঘোড়া ও গবাদি পশুর প্রকৃত বংশবৃদ্ধি করায় ক্ষমতা প্রথম দিকে স্বাভাবিক

১৮। স্পেকটেটর পত্রিকায় (মার্চ ১২, ১৮৭১, পৃঃ ৩২০) একজন লেখক নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন—"মিঃ ডারউইন মানুষের বিকাশের অধঃগমনের একটি নতুন মতবাদ পুনরুত্থাপিত করতে বাধ্য হয়েছেন। উচ্চশ্রেণীর জন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি যে মানুষের বন্য জাতিগুলির আচার আচরণের তুলনায় অনেক উন্নতমানের এটা দেখিয়েছেন তিনি। এবং সেই কারণে তিনি নিজেকে প্রচলিত গোঁড়া ধ্যানধারণা অনুযায়ী এই তথ্য পুনরুত্থাপিত করতে বাধ্য করেছেন, যদিও সে ধ্যানধারণা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। মানুষের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারটি সাময়িক অথচ দীর্ঘকাল ধরে কার্যকরী নৈতিক অধঃপতনের কারণে ঘটেছিল—এই সম্পর্কে, একটি বৈজ্ঞানিক অনুমানসিদ্ধ তত্ত্ব তিনি পুনরুত্থাপিত করেছেন, এবং বন্য জাতিগুলির খারাপ রীতিনীতি সমূহ বিশেষত তাদের বিবাহপ্রথা যে এর মূল স্বরূপ এটা দেখিয়েছেন। মানুষের নৈতিক অধঃপতনের ইহুদীধারা তার সর্বোচ্চ সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অর্জিত নিষিদ্ধ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এর বাইরে কিছু করতে পারে কি?

ভাবেই অত্যন্ত বেশী ছিল এবং প্রতিটি অঞ্চল তাদের বংশবৃদ্ধিতে ভরে যাওয়ার পর সেই ক্ষমতাই শেষে সীমিত হয়ে গেল। সন্দেহ নেই যে এইরূপ বা অন্যান্য বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা এসেছে এবং এই বাধাগুলির প্রকার ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; সম্ভবত কয়েক বছর অন্তর খাদ্যাভাব, প্রতিকূল ঋতু ও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীলতা এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, এইসব কারণে হয়তো মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের সংখ্যা তেমন বাড়তে পারেনি।

প্রাকৃতিক নির্বাচন: এখানে আমরা দেখলাম শারীরিক ও মানসিক গঠনে মানুষ বিভিন্ন হয় এবং এই বৈসাদৃশ্য ঘটে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে একই স্বাভাবিক কারণে ও একই স্বাভাবিক নিয়ম মেনে, ঠিক যেমনটি দেখা যায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে। মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অবিরাম ছড়িয়ে পড়ার সময় সে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। একই গোলার্ধের একদিকে টিয়েরা দেল ফুয়েগো (Tierra del Fuego) উত্তমাশা অন্তরীপ (the Cape of Good Hope) ও তাসমানিয়া (Tasmania), এবং অন্যদিকে উত্তরমেরু অঞ্চলের অধিবাসীরা নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর আগে তারা নিশ্চয়ই বহুবার ও বিভিন্ন সময়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরাও অন্যান্য জীবজন্তুর মত সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নজর দিত নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই। সেই কারণে তারা ঘটনাক্রমে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে সামিল হত এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃঢ় নিয়ম মেনে চলত। এইভাবে সমস্ত রকমের সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটনাক্রমে বা নিয়মিতভাবে রক্ষা করা হয়েছে এবং যেগুলি ক্ষতিকারক তাদের ত্যাগ করা হয়েছে। আমি দৈহিক গঠনের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির কথা বলছি না যা দীর্ঘ সময়ের অবকাশে ঘটে থাকে, এখানে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথা বলব। আমরা জানি, যেমন আমাদের হাত ও পায়ের পেশী যা আমাদের চলতে ফিরতে সাহায্য করে, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের[১৯] মতই তা নিরন্তর

১৯। মেসার্স মূরী ও মাইভার্ট তাদের "অ্যানাটমি অবদি লেমুরওডিয়া" (দ্রঃ "ট্রানজ্যাকট জুওলজিক্যাল সোসাইটি" ৭ম খণ্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ৯৬-৯৮) প্রবন্ধে বলেছেন, "শরীরে কিছু কিছু মাংসপেশীর উপস্থিতি এত অনিয়মিত যে তারা উপরোক্ত শ্রেণীর কোন একটিতেও ভালোভাবে পড়ে না।" এমনকি এই মাংসপেশীগুলি একই শরীরের দুই বিপরীত পাশে থেকেও ভিন্নতা প্রকাশ করে।

পরিবর্তনশীল। যদি তাই হয়, তাহলে কোন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের পূর্বপুরুষেরা, বিশেষত যে অঞ্চলে অবস্থানগত পরিবেশে কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, দুটি সমান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ত ; অর্ধাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা তাদের জীবিকা নির্বাহ বা আত্মরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ভালোভাবে উপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং গড়পড়তায় তাদের অংশের অধিকাংশ জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল এবং কম মানসিক উৎকর্ষযুক্ত অন্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী বংশবৃদ্ধি করতে পেরেছিল।

পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকে মানুষ যে সকল কঠিন বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এখনও টিকে রয়েছে, তার থেকে বলা যায় সে জীবজগতের সবচেয়ে প্রবল প্রাণী। অত্যন্ত সংঘবদ্ধ আকারে অনেক ব্যাপকভাবে সে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণী তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। স্পষ্টতই সে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার উন্নত বুদ্ধি-বিবেচনা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে যা তাকে তার সঙ্গী সাথী এবং আপন শরীরকে সাহায্য ও রক্ষা করতে প্রণোদিত করে থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সুগভীর তাৎপর্য জীবন যুদ্ধের চূড়ান্ত রায় দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। আবার তার বুদ্ধিমত্তার শক্তি দিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে স্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত কথা বলবার ভাষা এবং যার উপর মূলত তার চমৎকার অগ্রগতি নির্ভরশীল। মিঃ চোন্সে রাইট্ মন্তব্য করেছেন, "কথা বলবার জন্য ভাষাকে রপ্ত করবার প্রক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে এটা দেখা গেছে যে, এমন কি এতে যদি খুব সামান্য পারদর্শিতাও অর্জন করতে হয় তার জন্য যে মস্তিষ্ক-খরচ প্রয়োজন তা অন্য যে কোন ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় মস্তিষ্ক-খরচের তুলনায় অনেক বেশী।" সে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, পশুধরার ফাঁদ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে, এবং তাদের ব্যবহার করতেও শিখেছে ; এসব দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, জীবজন্তু ধরেছে বা শিকার করেছে, এবং অন্য ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করেছে। ভেলা বা ডোঙা তৈরী করেছে মাছ বা পার্শ্ববর্তী উর্বর দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে। সে আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কার করেছে, যার দ্বারা কঠিন শিকড়বাকড়কে খাওয়ার উপযুক্ত এবং বিষাক্ত ফলমূলকে ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে একমাত্র ভাষা আবিষ্কার বাদে এই আগুন জ্বালানোর কৌশল আবিষ্কারই মানুষকৃত আর সমস্ত আবিষ্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এই সমস্ত আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ কঠিনতম পরিবেশ বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

করেছে। এই আবিষ্কারগুলো নিঃসন্দেহেই তার পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্তি, কৌতূহলস্পৃহা, কল্পনাপ্রবনতা ও যুক্তিনির্ভর কাজকর্মের ক্রমোন্নতির প্রত্যক্ষ ফল। আর তাই আমি বুঝে উঠতে পারি না কি ভাবে মিঃ ওয়ালেস[20] মন্তব্য করেন যে, "প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা মানুষের আদি পূর্বপুরুষের (savage) মস্তিষ্ক বাঁদরের তুলনায় সামান্যই উন্নত হয়েছিল।"

যদিও মানুষের মননগত ক্ষমতা ও সামাজিক আচার-ব্যবহার তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা বলে তার দৈহিক গঠন-আকৃতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না, সেই কারণে এই বিষয়টিকে এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে আলোচনা করা হয়েছে এবং জননগত ও সামাজিক বা নৈতিক বিষয়ের উন্নতি সংক্রান্ত আলোচনা রাখা হয়েছে অন্য একটি পরিচ্ছেদে।

একটি হাতুড়িকে ঠিকঠাক চালানোও যে খুব সহজ কাজ নয়, তা ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ শিখতে যাওয়া যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। একজন ফুজিয়ানের মত অব্যর্থ নিশানায় পাথর ছুঁড়ে নিজেকে রক্ষা করা বা পাখী শিকার করা, আসলে হাত, বাহু ও কাঁধের পেশীগুলির আন্তঃসম্পর্কিত কাজের চূড়ান্ত নৈপুণ্যেরই ফল এবং সেই সঙ্গেই একটি চমৎকার শিল্পগুণও বটে। একটি পাথর বা বর্শা ছোঁড়ার সময় এবং অন্যান্য অনেক কাজের সময় একজন মানুষকে দৃঢ় পায়ে দাঁড়াতে হয় এবং সেখানেও একই সময়ে যুগপৎ অসংখ্য পেশীর পূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। স্থূল যন্ত্র বানানোর জন্য চকমকি পাথরকে ভেঙে একটি ছোট্ট টুকরো বের করা অথবা হাড় দিয়ে কোন ধারালো বর্শা বা বঁড়শি তৈরী করার জন্যও অত্যন্ত নিখুঁত কারিগরী জ্ঞানের দরকার হয়। মিঃ স্কুলক্রাফ্‌ট্[21]এর মত একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো ছুরি, বল্লম বা তীরের ফলাগুলো তৈরী করার জন্য প্রয়োজন হয় "অসাধারণ

২০। যারা মিঃ ওয়ালেসের "অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিউ"তে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গবেষণাপত্র "দি অরিজিন্ অব্‌ হিউম্যান রেসেস্ ডিডিউস্‌ড ফ্রম্ দি থিওরি অব্‌ ন্যাচারাল সিলেক্‌শন" পড়েছেন, তারা সম্ভবত আমার মূল বইতে তার মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করবেন। আমি এখানে মিঃ ওয়ালেসের এই কাজটির প্রসঙ্গে স্যার জে. লুবক্-এর অত্যন্ত সঠিক মন্তব্যটি (দ্রঃ "প্রিহিস্টোরিক্ টাইমস্" পৃঃ ৪৭৯) উল্লেখ না করে পারলাম না—"কোনরকম একদেশদর্শীতার মধ্যে না গিয়ে মিঃ ডারউইন একে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণা) ব্যক্ত করেছেন, যদিও সকলেরই জানা যে তিনি একা একাই এই ধারণাকে আয়ত্ত করেছেন ও প্রকাশ করেছেন তবু সব সময় তিনি একই যুক্তি বা ব্যাখ্যা রাখেন নি।"

২১। "ডাবলিন কোয়ার্টারলি জার্নাল অব্‌ মেডিক্যাল সাইন্স"-এ প্রকাশিত মিঃ লসন্ জেইত-এর "ল অব্‌ ন্যাচারাল সিলেকশন্" থেকে উদ্ধৃত। ঐ একই রিপোর্ট থেকে ডঃ কেলারকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দক্ষতা ও সুদীর্ঘ অনুশীলন"। আদিম মানুষের মধ্যে যে শ্রম-বিভাজন ছিল, তা এই কথার সত্যতাকেই প্রমাণ করে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের প্রয়োজনমত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বা মৃৎপাত্র তৈরী করে নিতো না বরং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি এই সমস্ত কাজে ব্যাপৃত থাকত, এবং তার বিনিময়ে অবশ্যই সে শিকারের ভাগ পেত। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, ঘষা পাথরের অংশ থেকে মসৃণ যন্ত্র তৈরী করবার জন্যে আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, নিখুঁত নিশানায় পাথর ছোঁড়ার জন্য অথবা পাথর দিয়ে নানান স্থূল যন্ত্র তৈরী করার জন্য মানুষ সদৃশ প্রাণীরা হাত ও বাহুর এক দারুণ উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল; এবং যথেষ্ট অনুশীলন করলে যান্ত্রিক দক্ষতার ব্যাপারে সে অবশ্যই সুসভ্য মানুষের মত প্রায় সব কিছুই তৈরী করতে পারত। এই প্রসঙ্গে হাতের গড়নের সঙ্গে স্বরযন্ত্রের তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, বাঁদরের স্বরযন্ত্র চিৎকার করে নানা সংকেত জানানোর কাজে লাগে, বা একটি প্রজাতির (genus) ক্ষেত্রে সুশ্রাব্য স্বরপ্রবাহ সৃষ্টি করে। মানুষের স্বরযন্ত্রও প্রায় একইরকম। কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহারের ফলে তা স্পষ্ট করে কথা বলার কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মানুষের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্য আছে এমন চার হাত-পা যুক্ত প্রাণীদের বা আমাদের পূর্বপুরুষদের সবচেয়ে চমৎকার প্রতিনিধিদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব ঐ সমস্ত প্রাণীদের হাত আমাদের হাতের মত একই সাধারণ নিয়মে গঠিত, কিন্তু বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের হাত ততটা উপযোগী হয়ে ওঠেনি। নিজেদের হাতকে তারা কুকুরের সামনের পায়ের মত একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার কাজে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে না। যেমন, শিম্পাঞ্জি ও ওরাংওটাং-এর মত বানরেরা হাঁটার সময় হাতের তালুর বহিরাংশ বা আঙুলের গাঁট ব্যবহার করে থাকে। তাদের হাত গাছে ওঠার পক্ষেই সবথেকে উপযোগী। বাঁদরেরা ঠিক আমাদের মত যখন গাছের ডাল বা ঝুরি আঁকড়ে ধরে, বুড়ো আঙুল থাকে একপাশে আর অন্যপাশে থাকে বাকি চারটি আঙুল ও হাতের তালু। এইভাবে তারা অনেক বড় বড় জিনিস-পত্র ও মুখের কাছে তুলতে পারে, যেমন বোতলের গলা ধরে মুখের মধ্যে জল ঢেলে দিতে পারে। বেবুনরা হাত দিয়ে পাথর সরাতে সক্ষম এবং মাটি আঁচড়ে গাছের শিকড় টেনে তুলতে পারে। এরা আবার বুড়ো আঙুলের সাহায্যে অন্যান্য আঙুলের বিপরীত দিক দিয়ে বাদাম পোকামাকড় ও নানারকম ছোট জিনিস ধরতে পারে এবং এই ভাবে তারা পাখীর বাসা থেকে ডিম ও বাচ্চা তুলে আনে। আমেরিকায় বাঁদররা বুনো

কমলালেবুকে গাছের ডালে জোরে জোরে ঠুকতে থাকে যতক্ষণ না ফলটার খোসাতে চিড় ধরে। তারপর দু'হাতের আঙুল দিয়ে খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলে। শক্ত খোসাওয়ালা ফলগুলোকে পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে খোসাটা ভেঙে ফেলে ফলটা বার করে নেয়। কিছু কিছু বাঁদর শম্বুক-জাতীয় প্রাণীর খোলা (mussel-shells) দুই বুড়ো আঙুলের সাহায্যে ছাড়ায়। তাছাড়া আঙুল দিয়ে এরা শরীরের কোন অংশে ফুটে খাওয়া কাঁটা জাতীয় কিছু টেনে তোলে এবং একে অপরের শরীরের উকুন ইত্যাদি (parasites) বেছে দেয়। এরা পাথর গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, অথবা শত্রুকে লক্ষ্য করে তা ছুঁড়ে দিতেও পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা বলতেই হয় যে এই সমস্ত কাজ এরা খুব একটা পরিপাটিভাবে করতে পারে না, এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি যে নিখুঁত লক্ষে পাথর ছুঁড়তে এরা নিতান্তই অক্ষম।

যেহেতু বাঁদররা "কোন কিছুকে ঠিকমত আঁকড়ে ধরতে পারে না," অতএব "আঁকড়ে ধরার জন্য তাদের কোন নিম্নতর মানের অঙ্গ থাকলে" সেটাই তাদের বর্তমান হাতের মত একই কাজ করতে পারত—এই কথাটাকে আমার মোটেই সত্য বলে মনে হয় না। বরং নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, আরো যথাযথভাবে গঠিত হাত তাদের পক্ষে যথেষ্টই সুবিধাজনক হতে পারত, তার ফলে অবশ্য তাদের গাছে চড়ার ক্ষমতা কমে গেলে আলাদা কথা। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, যদি কোন হাত মানুষের মত এমন নিখুঁত-গড়নের হত, তাহলে গাছে চড়াটা তার পক্ষে খুব সহজ কাজ হত না। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ বৃক্ষবাসী বাঁদরদের ক্ষেত্রে—যেমন আমেরিকার এটেল্স্, আফ্রিকার কলোবাস্ এবং এশিয়ার হাইলোবেত্স্—দেখা যায় যে হয় তাদের বুড়ো আঙুল নেই, অথবা আঙুলগুলো এমন ভাবে জুড়ে থাকে যে হাত-পাগুলো স্রেফ ঝুলে থাকার আঁকশি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।[২২]

২২। হাইলোবেতস সিন্ডাক্টিলাস বাঁদরদের নাম থেকে বোঝা যায় এদের পায়ের দুটি আঙুল জুড়ে থাকে এবং লার ও লোসিস্কাস বাঁদরদের পায়ের আঙুলেও এটা লক্ষ্য করা যায়, এই বিষয়টি আমাকে জানান মিঃ বিথ্-এর তথ্য অনুযায়ী এইচ. এজিলিস্। কলোবাস্ বাঁদররা প্রধানত বৃক্ষবাসী ও অস্বাভাবিক রকমের কর্মঠ (দ্রঃ ব্রেহাম, "থিয়েরলেবেন", বি. ১ম. এস. ৫০), কিন্তু তারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত অন্য কোন প্রজাতির তুলনায় গাছে উঠতে বেশী পারদর্শী কিনা আমার জানা নেই। তাছাড়া দেখা গেছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশীমাত্রায় বৃক্ষবাসী প্রাণী শ্লথের (দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের বৃক্ষবাসী জন্তু) পায়ের পাতা বিস্ময়কর ভাবে আঁকশি-সদৃশ।

যেদিন থেকে জীবিকা-নির্বাহের ধারা পরিবর্তনের ফলে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের দরুণ উচ্চশ্রেণীর বনমানুষদের (Primetes) পূর্বপুরুষেরা গাছ থেকে নেমে এল, সেদিন থেকেই তাদের অভ্যাসগত আচরণের উন্নতিও বদলাতে শুরু করল এবং তার ফলে তারা আরো নির্দিষ্ট ভাবে চতুষ্পদী বা দ্বিপদী হয়ে উঠল। বেবুনরা সাধারণত পাথুরে আর পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে; খুব প্রয়োজন না হলে উঁচু গাছে ওঠে না এবং তাদের চলনভঙ্গী প্রায় কুকুরের মতই। একমাত্র মানুষই দ্বিপদী জীবে উন্নীত হয়েছে, এবং আমরা এখন অন্তত খানিকটা বুঝতে পারছি কিভাবে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছিল, যা তার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। হাতের ব্যবহার না শিখলে মানুষ আজকের পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারত না, কারণ মানুষের হাত তার ইচ্ছার সঙ্গে তাল রেখে কাজ করার ব্যাপারে দারুণ উপযোগী হয়ে উঠেছে। স্যার সি· বেল জোর দিয়ে বলেন যে, "(মানুষের) হাত সমস্ত রসদ যোগান দেয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হাতের নিবিড় সংযোগ মানুষকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য অর্জনের ক্ষমতা।"

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষের হাত ও বাহু শুধুমাত্র একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া আসার জন্য এবং শরীরের পুরো ভার বহন করার জন্য ব্যবহৃত হত অথবা যতদিন পর্যন্ত এগুলো গাছে চড়ার পক্ষে দারুণ উপযোগী ছিল, ততদিন পর্যন্ত মানুষের হাত ও বাহু অস্ত্র বানানো অথবা নিখুঁত লক্ষে পাথর ও বর্শা ছোঁড়ার মত কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ গাছে চড়ার মত রুক্ষ কাজকর্মের ফলে হাত ও বাহুর স্পর্শানুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়, আর এই অনুভূতির ওপরেই ওগুলোর চমৎকার ব্যবহার বহুলাংশে নির্ভর করে। এই সমস্ত কারণসমূহ নিঃসন্দেহে মানুষকে দ্বি-পদী হতে বাড়তি সাহায্য করেছে। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলো করার জন্য বাহু তথা শরীরের উর্ধ্বাংশ মুক্ত থাকা একান্তই অপরিহার্য, আর মানুষকে তাই দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখতে হয়েছে। এই বিশাল সুবিধাটা অর্জন করার জন্য তার পায়ের পাতা চ্যাটালো হয়ে উঠল এবং পায়ের বুড়ো আঙুলও দারুণ রকম বদলে গেল। কিন্তু এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তার গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার বিশেষ ক্ষমতাটি প্রায় পুরোপুরি ভাবে লোপ পেল। জীবজগতের সর্বত্র শারীরবৃত্তির শ্রমবিভাজনের যে নীতি চোখে পড়ে, এই ঘটনা তার সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্য-পূর্ণ। নীতিটি হল—আঁকড়ে ধরার কাজে হাত যতই পোক্ত হয়ে ওঠে, শরীরের ভার বহন করা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার কাজে পা-ও ততই

পরিশীলিত হয়ে ওঠে। অবশ্য কিছু কিছু বন্য মানুষের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের পায়ের আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা এখনো পুরোপুরি ভাবে লোপ পায়নি। তাদের গাছে ওঠার ধরণ ও আরো অনেক কাজের মধ্যে এটা লক্ষ্য করা যায়।[২৩] দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এবং হাত ও বাহু মুক্ত হয়ে যাওয়া যদি মানুষের পক্ষে সুবিধেজনক হয় এবং জীবনযুদ্ধে তার দারুণ সাফল্যের দিকে তাকালে যখন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকে না, তখন আমি এমন কোন কার্যকারণ দেখতে পাই না যে কেন সেকালে মানুষের পূর্বপুরুষদের পক্ষে ক্রমশ সোজা হয়ে দাঁড়ানো বা দ্বিপদী হয়ে ওঠাটা সুবিধেজনক হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্যই তারা আরো ভালোভাবে সমর্থ হয়েছে পাথর বা লাঠি দিয়ে আত্মরক্ষা করতে, শিকারের জন্তুজানোয়ারদের আক্রমণ করতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করতে। এবং সেই কারণেই সবচেয়ে উন্নত প্রাণীরাই পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছে এবং সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় টিঁকে থেকেছে। যদি গরিলা ও তাদের সমগোত্রীয় কিছু প্রাণী পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তাহলে খুব জোরগলায় ও আপাত সত্যতার সঙ্গে বলা যেত যে, কোন প্রাণী তার চতুষ্পদ অবস্থা থেকে ক্রমশ দ্বিপদে রূপান্তরিত হতে পারে না, কারণ এই পরিবর্তনের কোন একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় সেই প্রজাতির সকল প্রাণীই প্রগতির পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা জানি (এবং এটা সত্যিই ভাববার মত বিষয়) যে বনমানুষেরা প্রকৃতপক্ষে এখন একটি মধ্যবর্তী অবস্থাতেই রয়েছে এবং তারা মোটের উপর জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে বেশ ভালোভাবে খাপ খাইয়েও নিয়েছে। গরিলারা সামনের দিকে এঁকেবেঁকে টলতে টলতে এগোয়, কিন্তু বেশীরভাগ সময় অগ্রসর হয় তাদের ঝুলে থাকা হাতের সাহায্যে। আবার দীর্ঘ-বাহু বাঁদররা মাঝে-মাঝে তাদের হাতদুটোকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে, দুই হাতের মাঝখানে শরীরটাকে এদিক-ওদিক দুলিয়ে অগ্রসর হয়। কয়েকপ্রকার হাইলোবেতস্ বাঁদর আছে, যাদেরকে না শেখালেও বেশ জোরে হাঁটতে বা দৌড়তে পারে। অবশ্য তাদের এই হাঁটা বা দৌড়ানো খানিকটা এলোমেলো, মানুষের মত

২৩। মানুষ কিভাবে দ্বি-পদে উন্নীত হলো—এই বিষয়ে অধ্যাপক হ্যাকেল-এর একটি চমৎকার আলোচনা রয়েছে (দ্রঃ "Naturliche Scopfungsgeschichte", ১৮৬৮ এস. ৫০৭)। ডঃ বার্নার মানুষের মধ্যে এখনও বর্তমান এরকম অঙ্গ হিসেবে পায়ের ব্যবহারের কয়েকটি চমৎকার ঘটনার কথা বলেছেন (দ্রঃ "Conferences sur la Theorie Darwinienne", ১৮৬৯ পৃষ্ঠা ১৩৫); তিনি উচ্চশ্রেণীর বাঁদরদের উন্নতির ধারা সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন যা আমি প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলেছি। শেষোক্ত এই বিষয়টির জন্য দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ওয়েনের "অ্যানাটমি অব্ ভার্টিব্রেটস্", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭১।

দৃঢ়ভাবে পা ফেলার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে বিদ্যমান বাঁদররা চতুষ্পদী ও দ্বি-পদী এর মধ্যবর্তী একটি প্রগতির ধারায় অবস্থান করছে, এবং কুসংস্কার মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বনমানুষ জাতীয় বাঁদরেরা আকৃতির দিক থেকে চতুষ্পদীর তুলনায় দ্বি-পদীর (মানুষের) সঙ্গেই অনেক বেশী সাদৃশ্যযুক্ত।

মানুষের পূর্বপুরুষেরা যত বেশী সোজা সিধে হয়ে দাঁড়াতে শিখল, তাদের হাত ও বাহু যত বেশী মুঠো করে ধরা ও অন্যান্য কাজের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগল ; তাদের পা ও পায়ের পাতা যত বেশী করে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ও হেঁটে চলার উপযুক্ত হয়ে উঠল, ততই তাদের এইভাবে আরো অসংখ্য শারীরিক গঠনের পরিবর্তন জরুরী হয়ে উঠল। কোমরের হাড়, বস্তিদেশ (pelvis) আরো চওড়া হতে লাগল, মেরুদণ্ড অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেল, এবং মাথার অবস্থানও পরিবর্তিত হল। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলো মূর্ত হয়ে উঠল মানুষের শরীরে। অধ্যাপক শ্যাফহাউসেন লিখছেন যে, "মানব করোটির শক্তিশালী মাষ্টয়েড প্রক্রিয়া (mastoid processes, কানের ঠিক পিছনে মধ্যকর্ণের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য স্নায়ু কোষপূর্ণ ছোট ঢিবি) তার সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলস্বরূপই সৃষ্টি হয়েছে", এবং এই প্রক্রিয়াটি ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদির মধ্যে অনুপস্থিত, আর গরিলাদের মধ্যে এর দেখা মিললেও মানুষের তুলনায় তা বেশ ছোটই। মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো কিছু গঠনগত পরিবর্তনের কথাও এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই পরিবর্তন-গুলি কতটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, আর কতটা কতকগুলি অঙ্গের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের অথবা একটা অঙ্গের ওপর আরেকটা অঙ্গের ক্রিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ফলাফল—সেটা বলা মুস্কিল। পরিবর্তনের এইসব উপায়গুলি প্রায়শই একে অপরকে সহযোগিতা করে থাকে। তাই যখন হাড়ের অন্তাংশ (crest) ও তার সাথে যুক্ত পেশীসমূহ নিয়মিত ব্যবহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন বোঝা যায় যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ অভ্যাসগত ভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং অবশ্যই কার্যকরী ভাবে। তাই যে সমস্ত প্রাণীরা এইসব কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পাদন করতে পেরেছিল, তারা অনেক বেশী সংখ্যায় টিঁকে থাকতে পেরেছে।

হাত ও বাহুর স্বাধীন ব্যবহার, যা মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আংশিক কারণ ও আংশিক ফলাফল, তা দৈহিক গঠনের অন্যান্য রূপান্তরগুলিকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের আদি উত্তর

স্ত্রীদের মধ্যে পুরুষদের সম্ভবত বড় বড় কেনাইন বা ছেদক দাঁত ছিল। কিন্তু শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তাদের মধ্যে পাথর, লাঠি ও অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে ওঠার ফলে তাদের চোয়াল ও দাঁতের ব্যবহার ক্রমশ কমে এল। এক্ষেত্রে দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের আকারও হ্রাস পেল। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনাকে লক্ষ্য করলে একথার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এর সাথে নিকট সাদৃশ্য যুক্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখতে পাবো যে রোমন্থক গ্রন্থীযুক্ত প্রাণীদের (যেমন, গরু) মধ্যে পুরুষদের কেনাইন দাঁতের ক্রমহ্রাস প্রাপ্তি বা সম্পূর্ণ অবলুপ্তি আপাতভাবে তাদের শিঙের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে ইনসাইসর বা কৃন্তক দাঁত ও ক্ষুরের সাহায্যে লড়াই করার অভ্যাসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাদের কেনাইন দাঁত হ্রাসপ্রাপ্ত বা অবলুপ্ত হয়েছে।

অধ্যাপক রুতিমেয়ার এবং অন্যান্য আরো অনেকে জোর দিয়ে বলেছেন, পরিণত পুরুষ বনমানুষদের মধ্যে চোয়ালের পেশী যখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় পেঁছায়, তখন সেটা করোটির উপর অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করে, এবং তার ফলেই মানুষের সঙ্গে নানান বিষয়ে তাদের অনেক পার্থক্য দেখা দেয়, আর এই প্রজাতির প্রাণীদের "যথার্থই ভয়ানক মুখমন্ডল" গড়ে তোলে। মানুষের পূর্বপুরুষদের চোয়াল ও দাঁত আকারে ছোট হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিণত করোটি ক্রমশ বেশী করে আজকের মানুষের করোটির মত হয়ে উঠল। পরে আমরা এ-ও দেখব যে, পুরুষ মানুষদের কেনাইন দাঁতের ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি বংশগতির মাধ্যমে নারীদের দাঁতকেও প্রভাবিত করেছে।

বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের আয়তনও বেড়ে গেল। এ-কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে, গরিলা বা ওরাংওটাং-এর শরীরে মস্তিষ্কের যা আয়তন, তার তুলনায় মানুষের শরীরে মস্তিষ্ক অনুপাতে অনেক বড়, এবং তার উন্নততর মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে এই ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। পোকামাকড়দের মধ্যেও প্রায় একইরকম ব্যাপার দেখা যায়। পিঁপড়েদের সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া (মস্তিষ্কের স্নায়ু) অস্বাভাবিক রকম বড় হয় এবং সমস্ত হাইমেনোপটেরার (Hymenoptora, পিঁপড়ে, বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি) মধ্যেই এই গ্যাংলিয়া অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণীদের চেয়ে (যেমন, গুবরে পোকা) অনেক গুণ বড় হয়ে থাকে।[২৪] অন্যদিকে, দুটি জন্তুর

২৪। আমার ছেলে, মিঃ এফ. ডারউইন আমাকে ফর্মিকা রুফার (Formica rufa) সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখায়।

কিংবা দু'জন মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে তাদের করোটির ঘনক মাপের সাহায্যে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায় বলে কেউ মনে করে না। অত্যন্ত ছোট অথচ পূর্ণাঙ্গ স্নায়বিক উপাদানের সাহায্যে কোন অস্বাভাবিক মানসিক ক্রিয়াকলাপ চলতেই পারে। তাই দেখা যায় পিঁপড়ের বিভিন্ন সহজাত প্রকৃতি, মানসিক ক্ষমতা ও সঙ্গী প্রীতি অত্যন্ত উন্নত ধরনের হয়ে থাকে, যদিও তাদের সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া একটি পিনের মাথার এক চতুর্থাংশের চেয়ে বড় নয়। এই বিচারে পিঁপড়ের মস্তিষ্ক পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার পরমাণুগুলির (atoms) অন্যতম, এমনকি হয়তো মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও চমৎকার।

মানুষের মস্তিষ্কের আকার এবং তার ধীশক্তির উন্নতির মধ্যে যে একটি নিকট সম্পর্ক রয়েছে—এই ধারণার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় সভ্য ও অ-সভ্য জাতি, আদিম ও আধুনিক মানুষের করোটির তুলনা করলে এবং অন্য সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের করোটির সঙ্গে মানুষের করোটির তুলনা করলে। ডঃ জে. বানার্ড ডেভিস্ অত্যন্ত সযত্ন পরিমাপের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, ইউরোপীয়ানদের করোটির গড়পড়তা আভ্যন্তরীণ আয়তন ৯২·৩ ঘন ইঞ্চি, আমেরিকানদের ৮৭·৫ ঘন ইঞ্চি, এশিয়ানদের ৮৭·১ ঘন ইঞ্চি এবং অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে এই আয়তন মাত্র ৮১·৯ ঘন ইঞ্চি। অধ্যাপক ব্রকা লক্ষ্য করেছেন, প্যারীর ঊনবিংশ শতাব্দীর কবরখানা থেকে পাওয়া করোটি দ্বাদশ শতাব্দীর ভল্টগুলি (পারিবারিক কবরখানা) থেকে পাওয়া করোটির তুলনায় আকারে বড় এবং এই দুই ভিন্ন সময়ের করোটির অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৪৮৬ ও ১৪২৬ ; ব্রকা আরও বলেছেন যে, পরিমাপ করে দেখা গেছে এই পরিবর্ধনটা ঘটেছে শুধুমাত্র করোটির সম্মুখ অংশেই—অর্থাৎ যে অঞ্চলটায় মানুষের বুদ্ধিমত্তা সঞ্চিত থাকে। অধ্যাপক প্রিচার্ড অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, ব্রিটেনের প্রাচীন অধিবাসীদের তুলনায় বর্তমান অধিবাসীদের "মস্তিষ্কের কোটর অনেক বেশী প্রশস্ত। তাসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে বহু প্রাচীন-কালের কিছু করোটি, যেমন নিয়ানডারথালদের বিখ্যাত করোটি, যথেষ্ট উন্নত ও প্রশস্তই ছিল। অধ্যাপক এম, ই. ল্যারটেট[২৫] আজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর

২৫। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে অধ্যাপক ব্রকা মন্তব্য করেছেন যে সভ্য জাতিগুলির মধ্যে বেশ কিছু মানুষের করোটির গড় ধারণক্ষমতা বেশ কমে যায় যেহেতু সেখানে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল একদল মানুষকে সংরক্ষণ করা হয় যারা বন্য সময়ে অতি সহজেই ধ্বংস হতে বাধ্য। অন্যদিকে, অ-সভ্যদের ক্ষেত্রে গড় ধারণক্ষমতা শুধুমাত্র অত্যন্ত সক্ষম ব্যক্তিদের দিয়ে যারা জীবনের চরম কঠিন অবস্থায়ও বেঁচে থাকতে সমর্থ। তাই তিনি বলেছেন অন্যথায় এটা ব্যাখ্যাতীত হয়ে পড়ে যে কিভাবে লজ্যার-এর প্রাচীন ট্রগলোডাইটদের (Troglodytes) অনুন্নত মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা আধুনিক ফরাসীদের চেয়ে বড় হয়।

পূর্বেকার (tertiary) ও বর্তমানের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের করোটির তুলনা করে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ব্যাপারে এই উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাম্প্রতিক কালের প্রাণীদের মস্তিষ্কের আয়তন সাধারণত বড় এবং তাদের মস্তিষ্কের ভাঁজ (convolutions)অনেক বেশী জটিল। অন্যদিকে, আমি আগেই দেখিয়েছি যে গৃহপালিত খরগোশের মস্তিষ্কের আয়তন বন্য খরগোশের তুলনায় যথেষ্ট ছোট, বহুপ্রজন্ম ধরে এক জায়গায় আবদ্ধ থাকার ফলেই তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, সহজাত প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও স্বেচ্ছামত চলা-ফেরা করার ক্ষমতাকে প্রায় কাজে লাগাতে পারে নি, আর তার জন্যই হয়ত এমনটা ঘটেছে।

মানুষের করোটি ও মস্তিষ্কের ওজন ক্রমশ বৃদ্ধি তার মেরুদণ্ডের বিকাশকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখছিল, তখন তো বটেই। অবস্থানের এই পরিবর্তন (সোজা হয়ে দাড়ানো) ঘটার দরুণ মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ চাপ করোটির আকারকেও পরিবর্তিত করে থাকে। এরকম ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে করোটি কত সহজে পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য মানব-জাতিতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে শিশুদের ঘুমোনোর দোলনার প্রকার অনুযায়ীই করোটির এই আকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আবার অভ্যাসগত পেশী-সংকোচন ও আগুনে পোড়া ক্ষত মুখের হাড়কে চিরদিনের জন্য বদলে দেয়। যুবকদের মাথা কোন অসুখের জন্য পাশের দিকে বা পিছনের দিকে হেলে গেলে তাদের যে কোন একটি চোখ তার নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন করে এবং মস্তিষ্কের চাপের ফলে করোটির আকার আপাতভাবে পরিবর্তিত হয়। ২৬ আমি দেখিয়েছি যে দীর্ঘ-কর্ণযুক্ত খরগোশরা যখন একটি কানকে দ্রুত সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়, তখন সেই সামান্য কারণেও সেই পাশের করোটির প্রায় প্রতিটি হাড় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ফলে বিপরীত পাশের হাড়গুলি আর কিছুতেই ঐ হাড়গুলির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ থাকে না। শেষত, যদি মানসিকশক্তির কোন পরিবর্তন ছাড়াই কোন প্রাণীর সাধারণ আকার বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় অথবা দৈহিক আকৃতির কোন বড়

২৬। জ্যারোল্ড (দ্রঃ "অ্যানথ্রোপলজিয়া" পৃঃ ১১৫-১৬) অধ্যাপক ক্যাম্পারও তার নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি দেখিয়েছেন যে মাথার অস্বাভাবিক অবস্থানের জন্য করোটির আকারগত পরিবর্তন হয়। তিনি মনে করেন কিছু কিছু পেশীর ক্ষেত্রে যেমন জুতো তৈরীর সময় মাথা সবসময় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে ফলে কপাল আরো বেশী গোল ও প্রক্ষিপ্ত হয়।

রকমের পরিবর্তন ছাড়াই তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে তার করোটির আকারও অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। গৃহপালিত খরগোশদের পর্যবেক্ষণ করেই আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি। তাদের কেউ কেউ বন্য খরগোশের চেয়েও আকারে বড় হয় আর বাদবাকীরা তাদের স্ব-আকারেই থেকে যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শরীরের আকারের তুলনায় মস্তিষ্কের আয়তন যথেষ্ট হ্রাস পায়। ঐ সমস্ত খরগোশের করোটি যে দীর্ঘায়িত বা দীর্ঘ চোয়াল যুক্ত, তা দেখে প্রথমে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। উদাহরণস্বরূপ প্রায় সমান বিস্তৃতি বিশিষ্ট দুটি খরগোশের করোটির কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের একটি বন্য ও অপরটি বেশ বড় জাতের গৃহপালিত খরগোশ, এদের করোটির দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৩·১৫ ইঞ্চি ও ৪·৩ ইঞ্চি। বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে একটি বিশিষ্টতম পার্থক্য দেখা যায় তাদের করোটির আকারে, কারো কারো ক্ষেত্রে তা যেমন দীর্ঘ, কারো কারো ক্ষেত্রে গোল এবং এখানে খরগোশদের ঘটনা দিয়ে বিষয়টিকে বেশ ভালো ভাবে বোঝা যেতে পারে বলে মনে হয়। কারণ, ওয়েলকার লক্ষ্য করেছেন যে, "খাটো লোকেরা অনেক বেশী ছোট চোয়াল যুক্ত (brachy cephaly) হয়, আর লম্বা লোকেদের চোয়াল বেশ দীর্ঘ (dolichocephaly)", আর সেইজন্য লম্বা লোকেদের তুলনা করা যেতে পারে চওড়া ও দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট খরগোশদের সঙ্গে, যাদের প্রায় সকলের মধ্যেই দীর্ঘায়িত করোটি বা দীর্ঘ চোয়াল দেখা যায়।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা খানিকটা হলেও বুঝতে পারছি কিভাবে মানুষ বৃহদাকার ও কম বেশী গোলাকৃতি করোটি লাভ করেছে এবং স্পষ্টতই এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের থেকে স্বাতন্ত্র দান করেছে।

মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে আর একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য হলো মানুষের নির্লোম দেহ-ত্বক। তিমিমাছ, শুশুক (সেটাসিয়া), তৃণভোজী সামুদ্রিক-স্তন্যপায়ী প্রাণী (সাইরেনিয়া) ও জলহস্তীর দেহে লোম থাকে না এবং এই লোম-না-থাকার ফলে জলের মধ্যে চলা-ফেরা করতে তাদের সুবিধে হয়। সেই জন্য অবশ্য তাদের শারীরিক উষ্ণতায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, ঠাণ্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী প্রজাতির প্রাণীদের দেহে ঘন চর্বির স্তর থাকে, যা সীল মাছ ও ভোঁদড়ের লোমের মত একই কাজ করে থাকে। হাতি ও গণ্ডারের দেহ প্রায় লোমশূন্য আবার কিছু কিছু বিলুপ্ত প্রজাতি, যারা আগে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পরিবেশে বাস করত, তাদের দেহ লম্বা পশম বা লোম দ্বারা আবৃত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে এই উভয় ধরনের প্রাণীদের বর্তমান প্রজাতি প্রখর তাপের

দরুণ নিজেদের লোম আচ্ছাদন হারিয়েছে। সম্ভাব্যতার এই ভিত্তি আরো দৃঢ় হয় যখন দেখি যে ভারতীয় হাতিদের মধ্যে উচ্চভূমি ও ঠাণ্ডা অঞ্চলে বসবাসকারী হাতিরা নিম্ন ভূমির হাতিদের তুলনায় অনেক বেশী লোমাবৃত। তাহলে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আদিম যুগে কোন উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করার জন্যই মানুষ লোমবর্জিত হয়েছে? লোম বা চুল যা প্রধানত পুরুষের বুকে ও মুখমণ্ডলে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে মধ্য শরীরসহ চারটি প্রত্যঙ্গের (হাত ও পা) সন্ধিঃস্থলে থাকে, তা এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে. অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখার আগে থেকেই তার দেহে চুল বা লোমের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, আর শরীরের যে সমস্ত অংশে এখন সবচেয়ে বেশী চুল দেখা যায়, সেগুলি নিঃসন্দেহেই সূর্যের তাপ না' লাগতে পারে এমন অঞ্চলেই থাকত। কিন্তু এক্ষেত্রে মাথার চাঁদি একটি অদ্ভুত ব্যতিক্রম, কারণ প্রায় সব সময়ই চাঁদিতে সূর্যের তাপ লেগেছে, অথচ জায়গাটা ঘন চুল দ্বারা আবৃত। আবার, উন্নত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীরা (মানুষও যার অন্তর্ভুক্ত) বিভিন্ন গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে বসবাস করলেও তাদের শরীরে যথেষ্ট লোম বা চুল দেখা যায়, সাধারণত শরীরের উপরাংশে বেশী ঘন[২৭] হয়। এই ঘটনা স্বভাবতই মানুষের দেহ প্রায় লোমশূন্য হওয়ার পিছনে সূর্যের ভূমিকা রয়েছে এহেন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। মিঃ বেল্ট[২৮] মনে করেন যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে লোমহীন হতে পারাটা মানুষের পক্ষে একটা বিশেষ সুবিধে করে দিয়েছে। কারণ এর ফলে সে সম্ভবপর বেশ কিছু রক্তপায়ী কীট (acari) ও পরজীবি প্রাণীদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে, যারা নালী ঘা বা পচনের জন্য দায়ী। কিন্তু এই ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তার

২৭। ইজিডোর জিওফ্রে সেণ্ট হিলেয়ার (দ্রঃ "Hist. Nat. Generale") ২য় খণ্ড, ১৮৫৯ খ্রীঃ, পৃঃ ২১৫—২১৭) মানুষের মাথায় বড় বড় চুল থাকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন; সেই সঙ্গে আরো উল্লেখ করেছেন বাঁদর ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহের উপরের অংশ নিম্নাংশের তুলনায় বেশী ঘন চুল বা লোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরাও সহমত পোষণ করেন। অধ্যাপক পি. গার্ভেস (দ্রঃ "Hist Nat des Maommi fercs", ১ম খণ্ড, ১৮৫৪; পৃঃ ২৮) বলেন যে গরিলাদের পিঠে চুলের পরিমাণ নিম্নাংশের তুলনায় পাতলা এমনকি দু'এক জায়গায় নেই বললেও চলে।

২৮। দ্রষ্টব্য দি "ন্যাচারালিস্ট ইন্ নিকারাগুয়া" পৃঃ ২০৯। মিঃ বেল্টের মতবাদের সমর্থনে আমি এখানে স্যার ডব্লু ডেনিসন থেকে একটি অংশ (দ্রঃ ভ্যারাইটিস্ অব্ ভাইস্-রিগ্যাল লাইফ্," ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪০) উদ্ধৃত করছি, "অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের একটা অভ্যাস বলা যেতে পারে এটাকে যখন তারা ক্ষতিকারক পোকামাকড়দের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে ওঠে।"

দেহকে যথেষ্ট পরিমাণে নির্লোম করতে কার্যকরী হয়েছে কিনা, এবিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কেননা গ্রীষ্মমণ্ডলে বসবাসকারী অসংখ্য চতুষ্পদীদের মধ্যে কেউই উপশমকারী কোন বিশেষ উপায়ের অধিকারী হতে পারেনি। যে দৃষ্টি-ভঙ্গীটি আমার কাছে সব থেকে সম্ভব বলে মনে হয় তা হল—পুরুষেরা এবং বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা, লোমবর্জিত হয়েছে দেহের সৌন্দর্যবর্ধক কারণে, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, অন্যান্য উন্নত স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীর চেয়ে লোমশতার থেকে মানুষ যে এত আলাদা, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, লিঙ্গগত নির্বাচনের সাহায্যে চরিত্রের বিভিন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত রূপের মধ্যেও প্রায়শই বিপুল পার্থক্য দেখা যায়।

প্রচলিত ধারণা মতে, লেজ না থাকাটা মানুষের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত কিছু বাঁদরের মধ্যেও এই অঙ্গটির অস্তিত্ব নেই। অতএব, এটি কেবলমাত্র মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে লেজ দৈর্ঘ্যে কম-বেশী হয়। ম্যাকাকাস্ জাতের বাঁদরদের কোন কোন প্রজাতির লেজ তাদের শরীরের চেয়েও লম্বা এবং ২৪-টি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। আবার কারো কারো লেজ প্রায় অদৃশ্য, যা মাত্র তিনটি বা চারটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। কিছু কিছু বেবুনের লেজে ২৫-টি কশেরুকা থাকে, অথচ ম্যান্‌ড্রিল্‌দের বেলায় খুব ছোট ছোট অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ১০-টি করে কশেরুকা থাকে, যা কুভিয়ের-এর মতে, কখনো কখনো মাত্র পাঁচটি কশেরুকা দিয়ে গঠিত থাকে। ছোটবড় যে কোন লেজেরই প্রান্তভাগ ক্রমশ সরু হয়ে যায়, এবং আমার মনে হয় এর কারণ হল অন্ত পেশীর (terminal muscles) অপুষ্টিজনিত ক্ষয়, এবং ঐ অঞ্চলের ধমনী ও স্নায়ুতন্ত্রের অব্যবহারজনিত ক্ষয় প্রাপ্তি। এ-সবের ফলেই অন্ত-অস্থিও ক্ষয়ে যায়। লেজের দৈর্ঘ্যের রকমফের সম্বন্ধে কোন যথার্থ ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে এখানে আমরা মূলত বহিরাংশে লেজের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছি। অধ্যাপক ব্রকা সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণীর লেজ দুটি অংশে বিভক্ত। এই অংশ দুটি সাধারণত একে অপরের থেকে আকস্মিকভাবে পৃথক হয়ে পড়ে। উপরের অংশে যে কশেরুকা থাকে, সেগুলি কম-বেশী খাঁজকাটা ও সাধারণ কশেরুকার মতো রক্তবাহীনালী, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত, অন্যদিকে অন্তিম অংশের কশেরুকাগুলি খাঁজ-কাটা নয়, সমস্তটাই প্রায় মসৃণ এবং সত্যিকারের কশেরুকার সাথে মিল প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষ ও বনমানুষের দেহে লেজের কোন বাহ্য অস্তিত্ব না

থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা আছে, এবং উভয়ের এই অদৃশ্য লেজ একইভাবে গঠিত। আকার ও সংখ্যা অনেক ছোট হয়ে যেয়ে শিরদাঁড়ার অন্তিম অংশের কশেরুকারা গঠন করে অনুত্রিকাস্থি (os coccyx) যা একটি বিকাশরুদ্ধ অঙ্গ। লেজের গোড়ার অংশে কশেরুকারা সংখ্যায় অল্প, পরস্পরের গায়ে এরা শক্তভাবে আটকে থাকে এবং এদের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীদের লেজের এই ধরনের কশেরুকার তুলনায় এদের গুলি অনেক চওড়া ও চ্যাপ্টা। ব্রকার মতে, এগুলি অতিরিক্ত সেক্রাল কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এগুলি নির্দিষ্ট কিছু আভ্যন্তরীণ অঙ্গকে সহায়তা করে থাকে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে দেখা গেছে মানুষ ও বনমানুষদের সোজা বা আংশিক সোজা (semiercct) হয়ে দাঁড়াতে শেখার সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। এই সিদ্ধান্তটিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, যদিও পূর্বে ব্রকার অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, যা তিনি বর্তমানে পরিত্যাগ করেছেন। তাই বলা যায় যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর বাঁদরদের (বনমানুষ) লেজের উপরের অংশের কশেরুকারা (basal coudal vertebrae) পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু অনুত্রিকাস্থি (os coccyx) গঠনকারী লেজের অন্তিম অংশের লুপ্তপ্রায় ও পরিবর্তনশীল কশেরুকা সম্বন্ধে আমরা কী বলব? এ সম্বন্ধে একটি মত চালু আছে, যা বরাবর উপহাসের বস্তু হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। মতটি হল,—লেজের বহিরাংশ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে ঘর্ষণের একটা সম্পর্ক আছে। তবে আজ আর এই মতটাকে ঠিক উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ডঃ আণ্ডারসন্ বলেছেন যে, ম্যাকাকাস্ ব্রুনাস নামক বাঁদরদের লেজ অত্যন্ত ছোট, কিন্তু উপরাংশের কশেরুকাসহ দৃঢ় ভাবে সংস্থাপিত এবং মোট এগারোটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। লেজের অন্তিম অংশটি পেশীবন্ধ (tendon) দিয়ে তৈরী, সেখানে কোন কশেরুকা থাকে না। তারপরে থাকে ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচটি বিকাশরুদ্ধ লুপ্তপ্রায় কশেরুকা, ওগুলি এতই ছোট যে পাঁচটি কশেরুকার মোট দৈর্ঘ্য মাত্র ⅛ ইঞ্চি। এই অংশগুলি স্থায়ীভাবে আঁকশির আকারে একদিকে হেলে থাকে। লেজের মুক্ত অংশটি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির থেকে সামান্য বড়, এবং এটি মাত্র চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি কশেরুকা দিয়ে গঠিত। এই সংক্ষিপ্ত লেজটি খাড়া হয়ে থাকে, কিন্তু এর মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাঁ দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। আঁকশির মতো দেখতে অংশটি সহ এই শেষাংশটি উপরের বাঁকানো অংশের মধ্যবর্তী ব্যবধান কমাতে সাহায্য করে। ফলে প্রাণীরা এর ওপর ভর

দিয়ে বসতে পারে, আর তাই এটি রুক্ষ ও শক্ত হয়ে ওঠে। ডঃ আণ্ডারসন এইভাবে তার পর্যবেক্ষণগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন: "এই ঘটনাগুলির একটিই মাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ব্যাখ্যাটি হল—লেজের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে বাঁদরদের বসার সময় সেটা এগিয়ে আসে এবং প্রায়শই এই লেজের ওপরেই বাঁদররা বসে থাকে। কারণ ইস্কিয়াল টিউবারোসিটির (প্রাণীরা যে দুইটি হাড়ের উপর ভর দিয়ে বসে) শেষাংশ পেরিয়ে লেজের বাইরে বেরিয়ে থাকা সম্ভব নয়। এ থেকে মনে হয় যে, নিতম্বের আভ্যন্তরীণ স্থানে বাঁদরেরা ইচ্ছামত তাদের লেজকে গুটিয়ে নিতে পারত, যাতে মাটিতে চাপ না লাগে এবং এইভাবে বসার ফলে তাদের লেজের বক্রতা ক্রমে ক্রমে স্থায়ী রূপ নিয়েছিল, যার দরুণ বসার সময় তাদের আর অসুবিধে হত না।" এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঝা যায় যে বাঁদরদের গোটা লেজটার রুক্ষ ও শক্ত হয়ে যাওয়াটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ডঃ মুরী চিড়িয়াখানায় এদের (বাঁদরদের) এবং এদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত সামান্য বড় লেজবিশিষ্ট আরো তিন ধরনের প্রজাতিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন যে, "এই প্রাণীরা বসার সময় তাদের লেজটাকে সুবিধে মতো পশ্চাৎদেশের যে-কোন একদিকে ঠেলে দেয়; ফলে, লম্বা বা খাটো যাই হোক না কেন লেজের গোড়াতে ঘষা লাগে এবং ঘর্ষণ জনিত ক্ষতের সৃষ্টি হয়।" তাছাড়া অঙ্গহানির বংশগত প্রভাব[২৯] সম্পর্কিত তথ্যগুলি থেকে আমরা বলতে পারি যে খাটো লেজবিশিষ্ট বাঁদরদের লেজের বেরিয়ে থাকা অংশের তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা না থাকার দরুণ ঐ অংশটা বেশ কয়েক পুরুষ পরে লুপ্তপ্রায় অংশে পরিণত হওয়া বা অবিরত ঘর্ষণ ও ক্ষতের ফলে তার ক্রমবিকৃতি ঘটাও মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন ম্যাকাকাস ব্রুনাস্ বাঁদরদের লেজের বেরিয়ে থাকা অংশ (projecting part) এখন এই অবস্থায় এসে পেঁাছেছে এবং এম. ইকাউদেতাস (M. Ecaudatus) ও আরো অনেক উন্নত জাতের বাঁদরদের মধ্যে এই অংশটা পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেছে। আর শেষতঃ আমরা দেখতে পাই যে মানুষ ও বনমানুষের (anthropomorphous apes) মধ্যে লেজের আর

২৯। এই প্রসঙ্গে ডঃ ব্রাউন-সেকোয়ার্ড কৃত সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত গিনিপিগের অস্ত্রচিকিৎসার ফলে পরিবর্তিত প্রভাবের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য এবং সেই সঙ্গে এটা উল্লেখ করা যায় যে অতি সম্প্রতি তাদের গলার সংবেদনশীল স্নায়ুতন্তু কাটা যাওয়ায় অনুরূপ প্রভাব নিয়ে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ। পরে আমি সুযোগমতো মিঃ স্যালভিন-এর সাড়া জাগানো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে মো-মোরা (mot-mots) তাদের লেজের পালকগুচ্ছে কোন কাঁটা ফুটলে তা বংশগত প্রভাবের দ্বারা দাঁত দিয়ে তুলে ফেলে। এবিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য, "ভ্যারিয়েশান্ অব, অ্যানিম্যালস্ এ্যাণ্ড প্লান্টস্ আণ্ডার ডমষ্টিকেশন," ২য়খণ্ড, পৃঃ ২২-২৪।

অস্তিত্ব নেই, লেজের অন্তিম অংশে দীর্ঘদিন ধরে ঘর্ষণজনিত ক্ষত সৃষ্টি হবার ফলে তা অদৃশ্য হয়েছে। অন্যদিকে লেজের গোড়ার দিকের দৃঢ় অংশ আকারে হ্রাস ও পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে তারা পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমি এখন দেখাতে চেষ্টা করছি যে, মানুষ কিভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তার একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, যতখানি সম্ভবপর হয়ে ছিল, তা অর্জন করে নিয়েছে। মনে রাখা উচিত শরীরের কোন আকারগত বা গঠনগত পরিবর্তন, যদি কোন প্রাণীকে তার জীবন যাত্রার অভ্যাস, প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পক্ষে উপযোগী করে গড়ে না তোলে, সেটা এই ভাবে অর্জিত হতে পারে না। আবার প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে কোন্ কোন্ পরিবর্তন সুবিধাজনক, সে ব্যাপারেও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। কারণ শরীরে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও খুবই সীমিত। যেমন আমরা সত্যিই কি খুব ভালোভাবে জানি যে রক্ত ও কোষকলার মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটার ফলে প্রাণীরা কোন নতুন পরিবেশ বা নতুন ধরনের খাবারের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়? আন্তঃসম্পর্কের নীতির (principle of Correlation) কথাও আমাদের মনে রাখা উচিত। অধ্যাপক ইজিডোর জিওফ্রে দেখিয়েছেন যে মানুষের ক্ষেত্রে গঠনগত অনেক বিচিত্র বিচ্যুতি আসলে এই নীতি দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত। আন্তঃসম্পর্ক ব্যতিরেকেও, কোন একটি অংশের পরিবর্তন অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ধরনের আরও কিছু পরিবর্তনের জন্ম দেয় এবং সেটা ঘটে অন্যান্য অংশের বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যবহারের ফলস্বরূপ। বিষয়টি দু' একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। যেমন, কোন পোকামাকড়ের বিষে উদ্ভিদ কাণ্ডে একপ্রকার আশ্চর্য বৃদ্ধি (gall) ঘটে; আবার তোতাপাখী ইত্যাদিকে (parrots) বিশেষ একধরনের মাছ খাওয়ালে বা ব্যাঙজাতীয় প্রাণীর (toads) বিষ তাদের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের পালকের রঙ উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এগুলি থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে শরীরের তরল অংশকে পরিবর্তিত করলে তা থেকে অন্যান্য ধরনের পরিবর্তনও ঘটতে শুরু করে। আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত যে, কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে অতীতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল, সেগুলি সম্ভবত নির্দিষ্ট বা স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বংশগত হয়ে পড়েছিল।

কাজেই জীবজগতের অসংখ্য ঘটনাকে অনায়াসেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে, গাছপালা সম্পর্কে নাজেলির প্রবন্ধ, পশুপাখী সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের মন্তব্য এবং বিশেষ করে সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক ব্রকার প্রবন্ধ পড়ার পর আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমার "অরিজিন অব্ স্পেসিস" বইটির প্রথম দিককার সংস্করণগুলিতে আমি বোধ হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমের উদ্বর্তনের (Survival of the fittest) ভূমিকাকে বড় করে দেখেছিলাম। তাই বইটির পঞ্চম সংস্করণে আমি কিছু অদল বদল করেছি, শুধুমাত্র যাতে গঠন-আকৃতির অভিযোজনগত পরিবর্তনের (Adaptive Changes of Structure) ক্ষেত্রেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকে। অবশ্য গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, শরীরের অনেকগুলি অংশ যা আমাদের কাছে এখন অকেজো বলে মনে হচ্ছে, সেগুলিও পরে একসময় দরকারী হয়ে উঠবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতায় এসে পড়বে। তথাপি, ইতিপূর্বে আমি এই সমস্ত গঠন-আকৃতির অস্তিত্বকে যথাযথ ভাবে বিচার করে দেখিনি, যেগুলি আমাদের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী উপকারীও নয়, অপকারীও নয়, আর এটাকে আমি আমার সমস্ত কাজের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড় গাফিলতি বলে মনে করি। অজুহাত হিসেবে একথা অবশ্য বলতে পারি যে, এব্যাপারে আমার মধ্যে দুটি নির্দিষ্ট চিন্তা কাজ করেছিল। প্রথমত, আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, বিভিন্ন প্রজাতি আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয় নি, এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের কাজে প্রাকৃতিক নির্বাচনই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল ; যদিও এই কাজে অভ্যাসের বংশগত প্রভাব অনেকখানি এবং পরিপার্শ্বিক অবস্থার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সামান্য পরিমাণে সাহায্য করেছিল। তবে আমি কিছুতেই আমার এই পূর্বতন বিশ্বাসের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না (যে বিশ্বাস তখন প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল) যে, প্রত্যেকটি প্রজাতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই আমি এই গোপন অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, লুপ্তাংশ বাদে গঠন-আকৃতির প্রতিটি অংশেরই নিজস্ব কিছু বিশেষ কাজ রয়েছে, যদিও বেশ কিছু বিষয় আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। এই ধারণা থেকে যে-কেউই অতীত বা বর্তমানের ঘটনাবলীর প্রশ্নে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকাকে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বাড়িয়ে দেখতে বাধ্য। যাঁরা বিবর্তনের নীতিকে মেনে নেন অথচ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদকে মানেন না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বইটির সমালোচনা করার সময় বেমালুম ভুলে যান যে, উপরোক্ত চিন্তা দুটিকে মাথায় রেখেই

আমি বইটি লিখেছিলাম। অতএব, যদি আমি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভুল করে থাকি (অবশ্য তা মানতে আমি আদৌ রাজি নই) বা তার ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়ে থাকি, এই ব্যাপারটা অবশ্য হয়ে থাকতেই পারে, তবু বলব, আমি অন্তত একটি কাজ করতে পেরেছি,—আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টির মতবাদকে সমূলে উৎপাটিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছি।

মনে হয় যে সমস্ত জীবের এমনকি মানুষেরও গঠন-আকৃতির মধ্যে এমন কিছু অংশ আছে, যেগুলি আগে বা এখন কোন সময়ই তাদের কোন কাজে আসেনি বা আসে না, ফলে এগুলির কোনরকম শারীরবৃত্তিয় গুরুত্বও নেই। প্রত্যেকটি প্রজাতির প্রতিটি জীবের মধ্যে কেন অসংখ্য ছোট ছোট পার্থক্য দেখা যায়, তার সঠিক কারণ আমাদের জানা নেই, পূর্বানুবৃত্তি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আকার, স্বভাব ইত্যাদি পাওয়ার আলোয় বিচার করতে গেলে সমস্যাটা প্রায়শই আরও জটিলই হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের পিছনে উপযুক্ত কারণ তো থাকতেই হবে। এই কারণগুলি, তা সে যা-ই হোক না কেন, যদি আরো সম্মিলিতভাবে ও সজীবভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত (এর বিপরীতে কোন জোরাল যুক্তি দাঁড় করানো যায়নি), তবে তার ফল সম্ভবত শুধুমাত্র জীবে-জীবে সামান্য পার্থক্য না হয়ে একটি সুস্পষ্ট ও নিয়ত পরিবর্তনকে সূচিত করত, যদিও এই পরিবর্তনের তেমন কোন শারীরবৃত্তিয় গুরুত্ব থাকত না। পরিবর্তিত গঠন-আকৃতি, যেটা কোন ভাবেই শরীরের উপকারে লাগে না, সেটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কখনোই একই রকম হতে পারে না, তবে ক্ষতিকারক দিকগুলি এর মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে কতকগুলি উদ্দীপক কারণের অনুমানসিদ্ধ সমরূপকে অনুসরণ করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যসমূহ নিজেদের মধ্যে অবাধ যৌন মিলনের ফলেই ঘটে থাকে বলে মনে হয়। উত্তরকালব্যাপী একই প্রজাতির জীবের মধ্যে এইভাবে নানান পরিবর্তন ঘটতে থাকে, এবং যতদিন উদ্দীপক কারণগুলি একই থাকে ও অবাধ যৌনমিলন চালু থাকে, ততদিন এই পরিবর্তনগুলি প্রায় সমভাবে তাদের উত্তরপুরুষদের ওপরে বর্তায়। তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত বৈচিত্র্যের মতো এই উদ্দীপক কারণগুলি সম্বন্ধেও আমরা শুধু মাত্র বলতে পারি, যে অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তনশীল জীব প্রতিপালিত হয়, তার পরিবেশগত প্রকৃতির তুলনায় এগুলি তার শারীরিক গঠনাকৃতির সাথে অনেক বেশী নিকট সম্পর্কযুক্ত।

সিদ্ধান্ত ঃ এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখলাম যে, আজকের দিনে মানুষও অন্যান্য প্রাণীদের মতোই, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বহু ধরনের পার্থক্য বা সামান্য বৈসাদৃশ্য যুক্ত হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে মানুষের আদি পূর্বপুরুষের মধ্যেও এই সকল বৈসাদৃশ্য বর্তমান ছিল। আজকের দিনে এগুলি যে কারণে ঘটে থাকে তখনও সেই একই কারণেই এগুলি ঘটত, এবং একই সাধারণ ও জটিল নিয়মেই পরিচালিত হত। আবার সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই যেমন তাদের জীবন ধারণের উপায়কে বাঁচিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রবণতা রয়েছে, সুতরাং মানুষের পূর্বপুরুষরাও নিশ্চয়ই এই নিয়মের বাইরে ছিল না। আর এ থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, এবং দেখা দিয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে (প্রাকৃতিক নির্বাচন) দারুণভাবে সাহায্য করেছিল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ধিত ব্যবহারের বংশগত প্রভাব। এবং এই দুই প্রক্রিয়া (বেঁচে থাকার জন্য লড়াই ও প্রাকৃতিক নির্বাচন) একে অপরের উপর অবিরাম প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়াও মনে হয় যে, যৌন নির্বাচনের (sexual selection) মাধ্যমে মানুষের দেহে নানান অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সেইসব অজানা কার্যসাধন শক্তির অনুমানসিদ্ধ সমরূপ কার্যকলাপের পরিবর্তন সমূহের কিছু ব্যাখ্যাতীত অবশেষ অবশ্য থেকেই যায়, যেগুলি কখনো কখনো আমাদের দেহের গঠন-আকৃতিতে দারুণ উল্লেখযোগ্য ও আকস্মিক বিচ্যুতির সৃষ্টি করে থাকে।

বন্য জনসমষ্টি ও বিশাল সংখ্যক চতুষ্পদী প্রাণীদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালের মানুষ, এমনকি তাদের বনমানুষ-সদৃশ পূর্বপুরুষেরাও, সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করত। এই সমাজবদ্ধ প্রাণীদের কারো কারো ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনো কখনো সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বৈচিত্র্যগুলিকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে কার্যকরী হোত। তাই দেখা যায় যে সমাজে বহুগুণে ভূষিত বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ থাকে, সেই সমাজের লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা কমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সমাজের ওপর সর্বদাই আধিপত্য করে থাকে। অবশ্য এই ধরনের সমাজভুক্ত কোন একজন সদস্য ঐ সমাজের অন্যদের তুলনায় কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয় না। সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গেরা এইভাবে বহু উল্লেখযোগ্য গঠন-আকৃতি অর্জন করেছে যেমন, শ্রমিক মৌমাছিদের ফুলের পরাগ সংগ্রহকারক অঙ্গ অথবা হুল, অথবা সৈনিক পিঁপড়েদের শক্ত চোয়াল, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি একক ভাবে এইসব কীট-পতঙ্গের কোন কাজেই লাগে না অথবা খুবই

সামান্য কাজে লাগে। সমাজবন্ধ উন্নতশ্রেণীর প্রাণীদের বেলায় এই ধরনের গঠন-আকৃতিগুলি কিছু গৌণ কাজকর্মে সাহায্য করে থাকে, অবশ্য আমার জানা নেই যে শুধু সমাজের মঙ্গলার্থে কাজকর্ম করার জন্য গঠন-আকৃতির কোন পরিবর্তন কখনো ঘটেছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পুরুষ গণ্ডারের শিং ও পুরুষ বেবুনের কেনাইন-দাঁতকে তাদের যৌন বিষয়ক দ্বন্দ্বের অস্ত্র বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু এগুলি তাদের গোষ্ঠী বা দলকে রক্ষা করার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু মানসিক ক্ষমতার বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অন্যরকম (পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব), কারণ এই ক্ষমতাগুলি প্রধানত বা শুধুমাত্র সমাজের মঙ্গলের জন্যই গড়ে উঠেছে এবং সেইসঙ্গেই প্রতিটি পৃথক পৃথক প্রাণী পরোক্ষভাবে কিছু সুবিধাও পেয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে স্বতঃই প্রতিবাদ উঠবে, তবু এটাই সত্যি যে জীবজগতের মধ্যে মানুষ এমন একটি জীব যে ভীষণ অসহায় ও প্রতিরোধ শক্তিহীন। প্রাথমিক ও অপেক্ষাকৃত অল্পোন্নত অবস্থায় সে আরো অসহায় ছিল। এই প্রসঙ্গে আরজিলের ডিউক জোর দিয়ে বলেছেন যে, "মানুষের শারীরিক কাঠামো পশুদের থেকে অন্যরকম। শারীরিকভাবে মানুষ অনেক অসহায় ও দুর্বল। অর্থাৎ, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই এইসব পার্থক্য সৃষ্টি হয় নি।" এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি মানুষের দেহের অনাবৃত ও অরক্ষিত অবস্থার কথা, শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য বড় দাঁত বা থাবার অনুপস্থিতির কথা, জোরে দৌড়ানোর অক্ষমতা ও দৈহিক শক্তির ঘাটতির কথা, খাদ্য-অন্বেষণ বা বিপদ এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ঘ্রাণশক্তির অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত অভাবের সাথে আরো একটি গুরুতর ঘাটতির কথা যোগ করা যায়—মানুষ দ্রুত গাছে উঠতে পারে না, ফলে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেও পারে না। অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে দেহের লোমশূন্যতা এমন কিছু ক্ষতিকারক নয়, কারণ আমরা জানি যে নগ্নদেহী ফুজিয়ানরা কঠিন জল-আবহাওয়াতেও দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের এই প্রতিরোধহীন অবস্থার সঙ্গে বাঁদরদের অবস্থার তুলনা করার সময় মনে রাখা দরকার যে কেবলমাত্র পুরুষ-বাঁদরদের মধ্যেই বৃহদাকার কেনাইন দাঁতের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, এবং মুখ্যত যৌন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। তথাপি লক্ষ্য করার বিষয় যে স্ত্রী-বাঁদরদের মধ্যে এই দাঁত অনুপস্থিত থাকলেও তারা দিব্যি বেঁচে থাকে।

দৈহিক আকার বা শক্তির ব্যাপারে বলা যায় যে, শিম্পাঞ্জির মত ছোট আকারের

কোন প্রাণী থেকে, অথবা গরিলার মতো শক্তিশালী কোন প্রজাতি থেকে মানুষ ক্রমবিকশিত হয়েছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। তাই এটাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে মানুষ তার পূর্বপুরুষদের থেকে চেহারায় বড় ও বেশী শক্তিশালী হয়েছে নাকি ছোট ও দুর্বলতর হয়েছে। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে কোন জন্তু যদি বিপুল আকৃতি, শক্তি ও হিংস্রতার অধিকারী হয় এবং গরিলার মতো নিজেকে সমস্ত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে সে কখনোই দলবদ্ধ বা সামাজিক জীবে পরিণত হবে না। ফলস্বরূপ, তার মধ্যে উন্নত মানসিক গুণাবলী প্রায়শই অনুপস্থিত থাকবে, যেমন, সঙ্গীসাথীদের প্রতি সমবেদনা ও ভালোবাসার মত গুণ তার মধ্যে দেখা যাবে না। তাই মনে হয়, সম্ভবত অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন জীব থেকে বিবর্তিত হওয়ার ফলে মানুষের পক্ষে এক বিপুল সুবিধা করায়ত্ত করতে পারা সম্ভবপর হয়েছে।

মানুষ তার দৈহিক শক্তির ঘাটতি ও জোরে দৌড়ানোর অক্ষমতা এবং প্রকৃতিদত্ত অস্ত্রের অভাব ইত্যাদিকে দারুণভাবেই পূরণ করে নিতে পেরেছে, প্রথমত তার মননশক্তির সাহায্যে, যা দিয়ে সে বর্বর অবস্থায় থাকা কালেই তৈরী করেছে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, এবং দ্বিতীয়ত তার সমাজলব্ধ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে যা তার দলের সাথীদের সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়ার রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়েছে। আমরা জানি যে পৃথিবীতে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এরকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা দেশ আর দুটি নেই। আবার এও অজানা নয় যে উত্তর মেরুর মতো এমন ভয়ঙ্কর দৈহিক কষ্টের জায়গাও পৃথিবীতে আর নেই। তথাপি দেখা যায় যে বুশম্যান নামে ভীষণ দুর্বল একটি জাতি দক্ষিণ আফ্রিকায়, আর অত্যন্ত খাটো আকৃতির এস্কিমোরা উত্তর মেরুতে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে মানুষের পূর্বপুরুষদের মেধা এবং সামাজিক বিন্যাস সম্ভবত আজকের দিনের সবচাইতে বন্যদশায় থাকা মানুষদের চেয়েও হীনতর ছিল। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তারা গাছে চড়া ইত্যাদির মতো তাদের পশু-সদৃশ ক্ষমতাগুলি ক্রমশ হারিয়ে ফেলার সময় তাদের মেধাশক্তি উন্নত না হয়ে উঠলে জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকা বা উন্নতি করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হোত না। কিন্তু এই পূর্বপুরুষেরা অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি বা বোর্নিওর মতো (যা বর্তমানে ওরাংওটাংদের বাসভূমি) কোন গরম মহাদেশ বা বৃহৎ দ্বীপের অধিবাসী হলে, আজকের দিনের বন্য মানুষদের থেকে অনেক বেশি অসহায় ও প্রতিরোধহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের তেমন কোন মারাত্মক বিপদের মোকাবিলা করার দরকার হয় নি। এই ধরনের কিছু বৃহৎ অঞ্চলের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উদ্ভব হয়েছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের, আর তারই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল আচার-আচরণের বিভিন্ন বংশগত প্রতিক্রিয়া, এবং এই দুয়ে মিলেই মানুষকে সমগ্র জীবজগতের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মানুষের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা

সবচেয়ে অ-সভ্য মানুষ ও সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর বাঁদরদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য, ব্যাপক—নির্দিষ্ট কিছু সহজাত প্রবৃত্তি—আবেগ—অনুসন্ধিৎসা—অনুকরণ—মনোনিবেশের ক্ষমতা—স্মৃতিশক্তি—কল্পনাশক্তি—যুক্তি—মস্তিষ্কের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি—জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র—বিমূর্তভাবনা, আত্মসচেতনতা—ভাব প্রকাশের ভাষা—সৌন্দর্যবোধ—ঈশ্বর বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ, কুসংস্কার।

আগের দুটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে মানুষের দেহে এমন কিছু স্পষ্ট চিহ্ন আছে যার থেকে সহজেই বলা যায় যে, সে নিম্নশ্রেণীর কোন জৈবিক আকার থেকে ক্রমবিকশিত হয়েছে, কিন্তু তাহলে মানসিক ক্ষমতার বিচারে মানুষের সাথে বাদবাকী সব প্রাণীদের এত প্রভেদ কেন? আমাদের সিদ্ধান্তে কোন ভ্রান্তি হয়নি তো? সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য বহুবিস্তৃত। এমনকি তুলনার ক্ষেত্র যদি একটি অত্যন্ত উন্নত জাতের বনমানুষ (ape) ও সবচেয়ে অনুন্নত মানব জাতির এমন একজন সভ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, যে চারের বেশী কোন সংখ্যা গুণতে পারে না এবং প্রায় কখনোই কোন সাধারণ বস্তু বা নিজের আবেগকে কোন নির্দিষ্ট কথায় ব্যক্ত করতে পারে না,—তাহলে সেখানেও দেখব যে এই দুইয়ের ব্যবধান অত্যন্ত ব্যাপক। কুকুর তার আদিরূপ নেকড়ে বা শিয়ালের তুলনায় যতটা উন্নত বা সভ্য হয়ে উঠেছে, উচ্চতর শ্রেণীর বাঁদররা যদি ততটাও উন্নত বা সভ্য হয়ে উঠত, তাহলেও এই পার্থক্যের ব্যাপকতায় কোন হেরফের ঘটতো না। আমরা জানি ফুজিয়ানরা সবচেয়ে অ-সভ্য বা অনুন্নত জাতিগুলির অন্যতম। কিন্তু এইচ. এম. এস. বিগ্‌ল্‌ নামক জাহাজে আমাদের সহযাত্রী তিনজন ফুজিয়ানকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এরা কয়েক বছর ইংল্যাণ্ডে বসবাস করেছিল এবং অল্প অল্প ইংরাজীও বলতে পারত। আমাদের, অর্থাৎ সভ্য মানুষদের স্বভাব ও মানসিক গুণাবলীর সঙ্গে ঐ তিনজনের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। যদি মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারটি আদৌ থাকত কিম্বা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মানসিক ক্ষমতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হোত, তাহলে আমরা কখনোই বলতে পারতাম না যে আমাদের উচ্চ পর্যায়ের গুণগুলি ক্রমবিকাশের

ফল। কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য যে মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আবার এটাও সত্য যে, মানুষ ও বাঁদরের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার যতটা তফাৎ, তার চেয়ে ঢের বেশী তফাৎ রয়েছে অত্যন্ত নিম্নপ্রজাতির কোন মাছ, যেমন ল্যামপ্রে (lamprey) বা ল্যান্সলেট (lancelet) ইত্যাদির সাথে উচ্চজাতের বাঁদরদের। নিম্নশ্রেণীর মাছ আর উচ্চশ্রেণীর বাঁদরের মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে বিভিন্ন মাত্রার মানসিক ক্ষমতাযুক্ত অন্য সমস্ত প্রাণীকুল।

কোন বর্বর মানুষ (বর্ষীয়ান নাবিক বায়রন যেমন একজন বর্বরের কথা জানিয়েছেন যে তার শিশুপুত্রকে এক ঝুড়ি সামুদ্রিক শজারু ফেলে দেওয়ার অপরাধে পাথরে আছড়ে মেরে ফেলেছিল) এবং কোন একজন হাওয়ার্ড বা ক্লার্কসনের মধ্যেও নৈতিক স্বভাবের পার্থক্য খুব সামান্য নয়, ঠিক যেমন কদাচিৎ কোন বিমূর্ত শব্দ উচ্চারণ করতে পারা বন্য লোকের সঙ্গে নিউটন বা সেক্সপীয়রের মননশীলতার পার্থক্যও সামান্য নয়। স্বভাবতই সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতির সর্বাপেক্ষা উন্নত মানুষদের সঙ্গে নিম্নতম পর্যায়ের বন্যমানুষদের এই ধরনের তফাৎ কতকগুলি সূক্ষ্মতম ধাপের ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত। এবং সেই জন্যই এমনটা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে এই পার্থক্যগুলি হয়তো ক্রমশ দূর হয়ে যাবে এবং তারা পরস্পরকে আরো মেলে ধরবে।

এই পরিচ্ছেদে আমার প্রধান লক্ষ্য হলো এটা প্রমাণ করা যে, মানুষ ও উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মানসিক কার্যকলাপের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। এই আলোচনার প্রত্যেকটি বিভাগকে (পরিচ্ছেদের শুরুতে যে ভাগগুলি করা হয়েছে) নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ লেখা যায়, কিন্তু তবু আমি এখানে বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব। যেহেতু এখনো পর্যন্ত মানসিক ক্ষমতার বিষয়ে কোন সর্বজনগ্রাহ্য শ্রেণীবিভাজন করা যায় নি, তাই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায়েই আমার বক্তব্যকে সাজাব এবং সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকেই বেছে নেব যেগুলি আমাকে সবথেকে বেশি নাড়া দিয়েছিল। আশাকরি আমার পাঠকের মনেও এগুলি সাড়া ফেলতে সক্ষম হবে।

একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে মানসিক ক্ষমতার তারতম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার কিছু নমুনাও আমরা পেশ করব। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা অর্থহীন হবে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম পশু-পাখীর সঙ্গে যুক্ত লোকজনের কাছে আমি বার বার খোঁজখবর করে

জেনেছি তারা এ-ব্যাপারে সকলেই একমত যে প্রত্যেকটি মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পশুপাখীদের একের সঙ্গে অপরের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া আমার মনে হয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রথম কিভাবে মানসিক ক্ষমতার উদ্ভব হয়েছিল, তা খুঁজতে যাওয়া, প্রাণের উৎস খুঁজতে যাওয়ার মতই অর্থহীন। এ-সব সমস্যা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা রইল, অবশ্য আগামী মানুষ আদৌ কোনদিন এ-সব সমস্যার সমাধানই করতে পারবে কিনা, জানি না।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মতো মানুষও একই জ্ঞানেন্দ্রিয় ধারণ করে বলে তার মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানও এক হতে বাধ্য। মানুষের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মত কিছু সহজাত প্রবৃত্তিও দেখা যায়, যেমন, আত্মরক্ষা, যৌন আবেদন, সদ্যোজাত সন্তানের জন্য মাতার মাতৃত্ববোধ, শিশুর স্তন্যপানের ইচ্ছা, ইত্যাদি। তবে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তার পরের ধাপে থাকা প্রাণীদের থেকে কম। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওরাংওটাং ও আফ্রিকার শিম্পাঞ্জিরা ঘুমোনোর জন্য গাছের উপর ডাল পালা দিয়ে পাটা (platform) তৈরী করে। যেহেতু উভয় প্রজাতি একই অভ্যাসের অনুবর্তী, তাই বলা যেতে পারে এর কারণ হচ্ছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না এটা তাদের একই চাহিদা ও চিন্তা ভাবনা করার একই রকম ক্ষমতার ফল কিনা। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, এই ধরনের বাঁদরেরা (ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি, ইত্যাদি) গ্রীষ্মমণ্ডলের বিষাক্ত ফল ছোঁয় না, কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন বোধের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আবার যখন আমাদের গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে চরে বেড়ানোর অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় তখন তারা প্রায়শই ভুল করে বিষাক্ত গাছপালা খেয়ে ফেলে ; কিন্তু পরে এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে। এক্ষেত্রেও সম্ভবত আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না তারা কোন ফল খাবে আর কোনটি খাবে না, এটি তাদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে শেখা নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করা। তবে, একটু বাদেই আমরা দেখব যে এই বাঁদরদের মধ্যে সাপ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু জানোয়ার সম্পর্কে একটি ভীতিভাব রয়েছে, যা তাদের সহজাত।

উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি নিম্নশ্রেণীর তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম ও অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির। ক্যুভিয়ের-এর মতে, সহজাত প্রবৃত্তি ও মেধা পরস্পর বিপরীত। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের বুদ্ধিগত উৎকর্ষ তাদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ক্রমবিকশিত হয়েছে। কিন্তু পাউসেট (pouchet) তাঁর একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এ-ধরনের

কোন বৈপরীত্য আদপেই সম্ভব নয়। কেননা, যে সমস্ত পোকামাকড় সবচেয়ে চমৎকার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী, তারা সবচেয়ে বুদ্ধিমানও বটে। অন্যদিকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন মাছ বা উভচর ব্যাঙ ইত্যাদিরা জটিল সহজাত ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দাবিদার বীবর (Beaver) অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আশাকরি মিস্টার মর্গ্যানের অনবদ্য রচনার সঙ্গে পরিচিত পাঠকরা এ-ব্যাপারে সহমত পোষণ করবেন।

যদিও মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার মনে করেন যে বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক স্তরগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (reflex action) গুণন ও সংযোজন (multiplication coordination) নীতির দ্বারা বিকশিত এবং যদিও অনেক প্রাথমিক সহজাত প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে, যেগুলিকে আর আলাদা করে এখন চেনা যাবে না যেমন, বাচ্চাদের স্তন্য পানের ইচ্ছা, তথাপি মনে হয় আরো জটিল সহজাত ক্রিয়াগুলি বুদ্ধিমত্তার থেকে স্বতন্ত্র কোন উপায়ে বিকশিত হয়েছে। তবে আমি মোটেই অস্বীকার করতে চাই না যে, সহজাত ক্রিয়াগুলি তাদের নির্দিষ্ট ও অপরিশীলিত চরিত্রকে পরিত্যাগ করতে পারে এবং স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্যদিকে, কিছু বুদ্ধিগত ক্রিয়া বেশ কয়েক পুরুষ ধরে পালন করার সহজাত ক্ষমতায় উন্নীত হয় এবং বংশগত হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমুদ্রসংলগ্ন দ্বীপসমূহের পাখীদের মানুষকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারটা এভাবেই রপ্ত হয়েছে। সুতরাং এই কাজগুলিকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অবনতি বলা যেতে পারে, কারণ এগুলি আর যুক্তি বা অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কিন্তু আরো জটিল সহজাত ক্রিয়াগুলির একটি বড় অংশই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায়ে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সহজ সহজাত ক্রিয়ায় ক্রমপরিবর্তিত হয়। এই ধরনের ক্রমপরিবর্তগুলি হয়তো একই অজ্ঞাত কোন কারণে মস্তিষ্কের সেইসব অংশের ক্রিয়াবশত উৎপত্তি হয়, যেগুলি শরীরের অন্যান্য অংশে সামান্য বৈসাদৃশ্য বা ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্যের জন্য দায়ী। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার দরুণ প্রায় সময় আমরা বলে দিই যে এই ক্রমপরিবর্তনগুলি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয় জটিলতার সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা এছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত করতে পারি না। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম শ্রমিক পিঁপড়ে ও মৌমাছিদের চমৎকার সহজাত ক্ষমতার কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যেহেতু তারা সকলেই সন্তান উৎপাদনে অপারগ, তাই

তাদের সন্তানদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত অভ্যাসের বংশগত প্রভাব পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

পূর্বোল্লিখিত পোকামাকড় ও বীবরদের (beaver) কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, বুদ্ধির উচ্চমাত্রা নিঃসন্দেহে জটিল সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ, যদিও প্রথমে স্বতঃপ্রবৃত্ত শিক্ষাগ্রহণ করলেও শীঘ্রই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দ্রুত ও নিশ্চিত অভ্যাসের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। তথাপি এমন হয়তো অসম্ভব নয় যে সাবলীল বুদ্ধিমত্তা ও সহজাত ক্রিয়ার বিকাশের মধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক কাজ করে, যা পরবর্তী সময়ে মস্তিষ্কের কিছু বংশগত উন্নত পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মস্তিষ্কের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত হলেও এটা বোঝা যায় যে বুদ্ধিগত ক্ষমতা যথেষ্ট উন্নত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের নানা অংশ অবশ্যই আন্তঃযোগাযোগ রক্ষাকারী কতকগুলি জটিল মাধ্যম দ্বারা সংযুক্ত হয়, এবং তার ফলে সম্ভবত এর প্রতিটি পৃথক পৃথক অংশ কোন নির্দিষ্ট ও বংশগত রীতি অনুযায়ী, অর্থাৎ সহজাত ক্রিয়া অনুযায়ী বিশেষ কোন সংবেদন বা সংস্পর্শে সাড়া দিতে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মনে হয় স্বল্পমাত্রার বুদ্ধির সঙ্গে নির্দিষ্ট কিন্তু বংশগত নয় এমন অভ্যাস গঠনে জোরালো প্রবণতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক আমাকে জানিয়ে ছিলেন, সামান্য নির্বোধ ব্যক্তিরা যে-কোন কাজ নিয়মমাফিক বা অভ্যাস মতো করতে ভালোবাসে এবং এ-ব্যাপারে উৎসাহ পেলে তাদের খুশীর আর অন্ত থাকে না।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও আমাদের বর্তমান আলোচনা করা এই জন্যে দরকার যে, উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের, বিশেষত মানুষের, মানসিক ক্ষমতাকে আমরা সহজেই কমিয়ে দেখতে পারি, যখন তাদের কাজকর্মগুলিকে পূর্বে ঘটে যাওয়া কোন বিষয়ের স্মৃতি, দূরদৃষ্টি, যুক্তি ও কল্পনার ভিত্তিতে এবং নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীদের সহজাত ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত একই রকম কাজের সঙ্গে তুলনা করতে বসি। একইসাথে আমাদের মনে রাখা দরকার যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা একদিনে অর্জিত হয়নি, তা সম্ভব হয়েছে তাদের মস্তিষ্ক ও প্রাকৃতিক নির্বাচনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এবং তার জন্য তাদের ক্রমোত্তর বংশধরদের কোন সচেতন বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের দরকার হয়নি। মিঃ ওয়ালেসের যুক্তি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে বলা যায়; মনুষ্যকৃত বেশীরভাগ বুদ্ধিমত্তার কাজই যুক্তিনির্ভর নয়, সেখানে অনুকরণই প্রধান। কিন্তু মানুষের কাজ আর নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কর্তৃক সম্পাদিত অনেক কাজের মধ্যে এই পার্থক্য

বেশ বড় রকমের। যেমন, মানুষ একবারের চেষ্টাতেই শুধুমাত্র অনুকরণের সাহায্যে পাথরের কুড়োল বা ডোঙ্গা তৈরী করতে পারে না, অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা তাকে নিজের কাজ আয়ত্ত করতে হয়। অন্যদিকে, প্রায় প্রথম চেষ্টাতেই বীবররা জলের হাত থেকে বাঁচতে মাটির ঢিপি বা যাতায়াতের জন্য সুড়ঙ্গ তৈরী করতে পারে ; পাখীদের চমৎকার বাসা তৈরী করা বা মাকড়সার সুন্দর জাল বোনার জন্যও পূর্ব অভিজ্ঞতা বা অভ্যাসের দরকার হয় না ; প্রথম চেষ্টাতেই এগুলি গড়তে পারে তারা।

এবার আমাদের বর্তমান আলোচনায় ফিরে আসা যাক। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা স্পষ্টতই মানুষের মতো সুখ-দুঃখ ও বিষাদ অনুভব করে থাকে। আমাদের শিশুদের মতো কুকুর, বিড়াল বা ভেড়ার বাচ্চারা যখন একসাথে খেলা করে, তখন বোঝা যায় যে এর চেয়ে চমৎকার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ আর কিছুই হতে পারে না। এমনকি পোকামাকড়েরাও এইভাবে খেলার মাধ্যমে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে, এটা আমার কথা নয়, চমৎকার পর্যবেক্ষক পি• হুবার তার কাজের মধ্যেই এই ব্যাপারটা উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন পিঁপড়েরা একে অপরকে তাড়া করে এবং কামড়াবার ভান করে, ঠিক যেমনটা আমরা অনেক বাচ্চা কুকুরদের মধ্যে দেখে থাকি।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যে আমাদের মতো একই আবেগের দরুণ উত্তেজনা দেখা দেয়, তার অসংখ্য প্রমাণ আছে এবং সেইজন্য এ-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে পাঠককে আর নাইবা বিরক্ত করলাম। ভয়ের ব্যাপারটিও এদের মধ্যে আমাদের মতো একই রকমভাবে কাজ করে ; মাংসপেশী কাঁপতে থাকে, বুক ধড়ফড় করে, মলদ্বারের পেশী (sphincters) প্রসারিত হয় এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া, অধিকাংশ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ভয়জনিত সন্দেহ প্রবণতা। স্যার ই• টেনেণ্ট কর্তৃক উল্লিখিত পোষা মাদীহাতি কর্তৃক বন্য হাতীদের প্রবঞ্চনা করে ফাঁদের ফেলার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অসম্ভব, যদি না আমরা এটা স্বীকার করে নিই হাতিটি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই প্রবঞ্চনা অভ্যাস করেছে এবং কী করতে যাচ্ছে সেটা বেশ ভালোভাবেই তার জানা আছে। একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে সাহসিকতা বা ভীরুতার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ঘটে থাকে, যেমনটি সাধারণ ভাবে আমরা আমাদের কুকুরদের মধ্যে দেখে থাকি। কোন কোন কুকুর বা ঘোড়া বেশ খিটখিটে মেজাজের ও স্বভাবতই বিষণ্ণ প্রকৃতির, আবার অন্যদের মেজাজ বেশ চমৎকার। এই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্য বংশগত সূত্রেই অর্জিত

হয়। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন প্রাণীরা মাঝে মাঝে কেমন সাংঘাতিক রেগে গিয়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এবিষয়ে বিভিন্ন প্রাণীদের দীর্ঘ বিলম্বিত ও সুচতুর প্রতিহিংসার উপর অনেক উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছে এবং এগুলো সম্ভবত সত্যিও। রেঙ্গার ও ব্রেহ্‌ম্[1] জানিয়েছেন, যে সমস্ত আমেরিকান ও আফ্রিকান বাঁদরদের তাঁরা পোষ মানাতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেগুলি (বাঁদরেরা) একসময় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাণীতত্ত্ববিদ স্যার অ্যান্‌ড্রু স্মিথ, যিনি গভীর গবেষণা কর্মের জন্য সুপরিচিত, তিনি আমাকে তার নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এরকম—উত্তমাশা অন্তরীপে একজন অফিসার প্রায়শই একটি বেবুনকে নানাভাবে বিরক্ত করত, কোন এক রবিবার চমৎকার পোশাকে সেই অফিসারকে প্যারেডের জন্য আসতে দেখেই বেবুনটি একটি গর্তের মধ্যে জল ঢেলে দ্রুত কিছুটা ঘন কাদা তৈরী করে ফেলল এবং সেখান দিয়ে যাবার সময় সেই কাদা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে অফিসারটির গায়ে ছুঁড়ে মারল যা অনেক পথচারীর কাছেই মজার উপাদান হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে বেবুনটি যখনই ঐ অফিসারটিকে দেখতে পেত, তখনই আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে উল্লাস প্রকাশ করত।

কুকুরের প্রভুভক্তি অতুলনীয়। একজন প্রাচীন লেখক বেশ সুন্দর করে বলেছেন, "পৃথিবীতে কুকুরই একমাত্র জীব, যে তার নিজের চেয়েও তোমাকেই (প্রভুকে) বেশী ভালোবাসে।"

এমনকি মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও কুকুর তার প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বিজ্ঞানের কাজে জীবন্ত কুকুরের অঙ্গচ্ছেদ করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এইরকম একটি পরীক্ষার সময় কুকুরটি তার প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও ঐ পরীক্ষকের হাত চেটে দিতে ভুল করেনি, আর তাই সেই পরীক্ষকের কাজটি আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য যতই ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হোক না কেন বা তাঁর হৃদয় যতই পাষাণ হোক না কেন, জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর এই কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে বাধ্য।

হোয়েল একটি চমৎকার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি প্রায় সকল মানব জাতির স্ত্রীলোক ও সমস্ত জীবজগতের স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মাতৃস্নেহের

১। উল্লিখিত সমস্ত বিবৃতি এই দুই প্রাণীতত্ত্ববিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধৃত। দ্রঃ রেঙ্গারের "Naturgesch, der saugethiere von paraguay", পৃঃ ৪১-৫৭, এবং ব্রেহ্‌মের "Thierleben", বি. ১ম, পৃঃ ১০-৮৭।

হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি কি সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে উভয়ক্ষেত্রে (মানুষ ও অন্যান্যপ্রাণী) এই স্নেহের মূলনীতি এক নয়?" একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব মাতৃস্নেহের ব্যাপারটা কত সামান্য ঘটনার মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে রেঙ্গারকে স্মরণ করা যাক। তিনি একবার দেখেছিলেন সেবুস্ জাতের একটি আমেরিকান মেয়েবাঁদর তার বাচ্চার গায়ে এসে বসা মাছিদের ব্যগ্রভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে। অধ্যাপক ডুভোসেলেরও একটি অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি হাইলোবেত্স্ জাতের এক বাঁদর মাকে নদীর জল দিয়ে তার বাচ্চাদের মুখ ধুইয়ে দিতে দেখেছিলেন। সন্তান বিয়োগে বাঁদর মায়েদের দুঃখ এত গভীর হয় যে—অধ্যাপক ব্রেহাম উত্তরআফ্রিকার এই ধরনের কিছু বাঁদরকে আটকে রেখে দেখেছেন—সেই শোকে তারা মারা পর্যন্ত যায়। তাছাড়া স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার বাঁদরই অনাথ বাঁদর বাচ্চাদের ভার নেয় এবং বেশ যত্নের সাথেই তাদের দেখাশোনা করে। একটি মেয়ে বেবুনের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। সে এমনই উদার ছিল যে শুধুমাত্র অন্যপ্রজাতির বাচ্চা বাঁদরদের ভারই নিত না, বরং হামেশাই কুকুর ও বিড়ালছানাও চুরি করত এবং সবসময় তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াত। অবশ্য এই বাচ্চাদের সে তার নিজের খাবারের ভাগ দিত না। বিষয়টি ব্রেহ্মের কাছে একটু অস্বাভাবিকই মনে হয়ে ছিল কারণ, তাঁর পোষা বাঁদররা সবকিছুই (খাবার) তাদের বাচ্চাদের মধ্যে সুন্দরভাবে ভাগ করে দিত। ঐ বেবুনটি সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, একবার তার সংগৃহীত বাচ্চাদের মধ্যে একটি বেড়ালছানা তাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছিল; এরকম আঁচড়ের জন্য প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও বেবুনটি ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমতী; অচিরেই বিড়াল ছানাটির পায়ের থাবা পরীক্ষা করে বিষয়টি বোধগম্য হতে সে দাঁত দিয়ে তার নখ কেটে সমস্যার সমাধান করেছিল।[২] চিড়িয়াখানার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মচারীর কাছ থেকে আমি শুনেছি, একটি বুড়ী বেবুন (সি. চাক্মা) একটি রেহ্সাস্ জাতের বাচ্চা বাঁদরকে দেখাশোনা করত। কিন্তু যখন ড্রিল ও ম্যানড্রিল জাতের দুটি বাচ্চা বাঁদরকে ঐ খাঁচার মধ্যে রাখা হলো, ভারী আশ্চর্যজনক যে, সে রেহ্সাস্ বাচ্চাটিকে বাদ দিয়ে পরে আসা দুটি বাচ্চার প্রতি আগ্রহ দেখাতে

২। একজন সমালোচক কোনরকম যুক্তি ছাড়াই ব্রেহ্ম্ কর্তৃক উল্লিখিত এরকম কাজের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, আমাকে হেনস্তা করা। সেইজন্য আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি, পাঁচ সপ্তাহ বয়সের কোন বিড়ালছানার পায়ের ধারালো নখগুলি আমার দাঁত দিয়ে কাটা খুব শক্ত কোন কাজ নয়।

শুরু করল। সম্ভবতঃ সে বুঝতে পেরেছিল ঐ দুটি বাচ্চা অন্য প্রজাতিভুক্ত হলেও প্রায় তার সমগোত্রীয়। আর সেই বাচ্চা রেহ্সাস্টি এইভাবে স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সব সময় মনমরা হয়ে থাকত। শোনা কথা নয়, আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, সুযোগ পেলেই সে ড্রিল ও ম্যানড্রিল প্রজাতির বাচ্চা দুটিকে বিরক্ত করত ও আক্রমণ করত এবং এর ফলে বুড়ী বেবুনটি রেহ্সাস্টির প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করত। তাছাড়া ব্রেহ্মের মতে, বাঁদরেরাও তাদের প্রভুদের বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। শুধু তা নয়, তারা যে কুকুরদের সঙ্গে একত্রে থাকে (একই প্রভুর অধীনে), তাদেরকেও রক্ষা করতে সে অন্য কুকুরদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। কিন্তু আমরা এখানে সহানুভূতি ও আনুগত্যের বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখতে চাইছি, তাই সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক। এখানে ব্রেহ্মের ঐ পোষা বাঁদরদের কথা আবার বলতে হচ্ছে। তারা তাদের অপছন্দ কোন বুড়ো কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীকে নানান ফন্দিফিকিরের সাহায্যে উত্যক্ত করে তুলত এবং তাতে প্রচুর মজাও পেত।

অধিকাংশ জটিলতর মানসিক আবেগ মানুষ ও উন্নত শ্রেণীর জীবজন্তুর মধ্যে একই প্রকার। প্রায় সকলেই জানেন একটি কুকুর কতদূর ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে যদি সে দেখে তার প্রভু অন্য কোন প্রাণীকে আদর করছে, বাঁদরদের মধ্যেও আমি এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। এর থেকে বোঝা যায় জীবজন্তুরা শুধু যে অপরকে ভালোবাসে এমন নয়, অপরের ভালোবাসা পেতেও চায়। স্পষ্টতই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আস্হাশীল। কোন কাজের জন্য প্রভুর সম্মতি বা প্রশংসা পেতে তারা ভীষণ আগ্রহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, যখন কোন কুকুর তার প্রভুর জন্য সামান্য একটি ঝুড়িও বয়ে আনে; তখন তাকে অত্যন্ত আত্মতুষ্ট বা গর্বিত দেখায়। আবার খাবার সম্বন্ধে কুকুরের লজ্জা পাবার বিষয়টি আমার কাছে ভয়জনিত কোন কারণ বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় তা এমন কিছু, যার সাথে মানুষের খাবার ভিক্ষা করার লজ্জা জড়িয়ে আছে। আমরা হয়তো অনেকেই দেখেছি যে ভালো জাতের কুকুরেরা নেড়ি কুকুরদের বাজে রকমের ডাককে অবজ্ঞা করে ; এটাকে মহানুভবতা ছাড়া আর কী বলা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাঁদরেরা উপহাস একদম পছন্দ করে না। তাই মাঝে মাঝে তাদের শত্রুর উদ্দেশ্যে কাল্পনিক আক্রমণ শানাতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার দেখা চিড়িয়াখানার একটি বেবুনের কথা বলা যেতে পারে। তার দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত লোকটি কোন চিঠি বা বই নিয়ে জোরে তার সামনে পড়লে সে ভীষণ রেগে যেত এবং তার রাগ এমন সাংঘাতিক পর্যায়ে গিয়ে পেঁছাত যে সে কামড়িয়ে

নিজের পা থেকে রক্ত বার করে ফেলত। প্রায়শই কুকুররা চমৎকার রসবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে ; একে নিছক খেলা হিসেবে দেখলে একটু ভুল হবে। কোন ছোট দণ্ডাকার বস্তু বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু এদের একজনের কাছে ছুঁড়ে দিলে সে ওটাকে কিছু দূর অবধি নিয়ে যায় ; তারপর জিনিসটা নিজের সামনে রেখে উবু হয়ে বসে ; জিনিসটা নেওয়ার জন্য তার প্রভু তার কাছে না আসা পর্যন্ত সে ঐ অবস্থাতেই বসে থাকে এবং প্রভু কাছে এলেই ওটাকে নিয়ে আনন্দে দূরে দৌড়ে পালায়। কুকুরটি বার বার এই একই কাজ করে চলে। আসলে এতে করে সে দারুণ মজা পায়।

এবার আমরা অধিকতর বুদ্ধিসঞ্জাত আবেগ ও কাজকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। উন্নত মানসিক ক্ষমতার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বনিয়াদ গঠনে এগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত জীবজন্তুরা কোন প্রকার উত্তেজনাকে দারুণ মজার সঙ্গে গ্রহন করে। ক্লান্তি বা অবসাদের বিষয়টিও তাদের মধ্যে যথেষ্ট চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কুকুর বা (অধ্যাপক রেঙ্গারের মতানুযায়ী) বাঁদরদের নাম করা যায়। আবার প্রায় সমস্ত জীবজন্তুই বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময় বোধ করে থাকে এবং তাদের অনেকের মধ্যে কৌতূহল স্পৃহাও বর্তমান। এই কৌতূহল স্পৃহার জন্য তাদের অনেক সময় কঠিন মূল্য দিতে হয় ; যেমন, শিকারীদের নানান ছলাকলায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক জন্তু প্রাণ পর্যন্ত হারায়। কিছু হরিণ, অপেক্ষাকৃত সতর্ক কৃষ্ণসার হরিণ এবং কয়েকপ্রকার পাঁতিহাসের মধ্যে বিষয়টি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ব্রেহ্‌ম্‌ তাঁর পোশা বাঁদরদের সাপ সংক্রান্ত কিছু সহজাত ভীতির তথ্য পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের কৌতূহল স্পৃহা এত বেশী ছিল যে মাঝে মাঝে তারা প্রায় মানুষের মতোই ভয় ভুলে সাপ-রাখা বাক্সটার ডালা তুলে দেখবার চেষ্টা করত—ব্যাপারটা কী ! এই ঘটনা আমাকে এতটা বিস্মিত করেছিল যে আমি মৃত সাপের একটি গুটোনো চামড়াকে চিড়িয়াখানায় অবস্থিত বাঁদরদের বাসগৃহে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার ফলে সৃষ্ট উত্তেজনার ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। এদের মধ্যে সার্কোপিথেকাস্‌ প্রজাতির তিনটি বাঁদর সবচাইতে সাবধানী ছিল ; তারা বিপদ বুঝে নিজেদের খাঁচা ধরে ধাক্কা দিতে শুরু করল এবং তীক্ষ্ন চিৎকারে জানিয়ে দিল—বিপদ আসছে। অন্য বাঁদরেরা সহজেই ব্যাপারটা বুঝে নিল। শুধু কয়েকটি বাচ্চা বাঁদর আর একটি বয়স্ক আনুবিস্‌ প্রজাতির বেবুন সাপটির প্রতি উদাসীন ছিল। এরপর আমি সেই সর্পাকৃতি চামড়াটিকে বড় বড় খোপগুলির একটির মেঝেতে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে সব বাঁদরেরা সেটিকে

ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল এবং একাগ্র চিত্তে দেখতে লাগল। বেশ হাস্যকর দৃশ্য। দেখতে দেখতে তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল। যে কাঠের বলকে তারা খেলার সামগ্রী হিসেবে জানে, ঘটনাক্রমে সেই রকম একটা বল খড়ের মধ্যে নড়ে উঠলে (বলটা খড়ে আংশিক চাপা পড়ে ছিল) তারা তৎক্ষণাৎ ভয়ে পিছিয়ে গেল। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভালো, মরা মাছ, ইঁদুর, জ্যান্ত ঘুঘুপাখী বা সম্পূর্ণ নতুন কোন জিনিস এই সমস্ত বাঁদরদের খাঁচায় রাখলে এরা একেবারেই অন্যরকম আচরণ করে থাকে। হ্যাঁ, প্রথমটায় তারা কিছুটা ঘাবড়ে যেত বটে, কিন্তু অচিরেই কাছে গিয়ে ভালো করে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করত। এবার আমার পরীক্ষার অবশিষ্টাংশটুকু বলা যাক। এখন আর মরা সাপ বা তার চামড়া নয়, একটা জ্যান্ত সাপকে কাগজের ঠোঙায় ভরে, ঠোঙার মুখটা সামান্য মুড়ে, বড় খোপগুলোর একটাতে রেখে দিয়েছিলাম আমি। একটি বাঁদর তৎক্ষণাৎ কাছে এসে ঠোঙার মুখটি সামান্য খুলে মুখ নামিয়ে দেখল এবং তৎক্ষণাৎ ছিটকে সরে গেল। পরের ঘটনা ঠিক ব্রেহ্মের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে গেল। একটির পর একটি বাঁদর মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে, কাঁধের একপাশে হেলিয়ে, খাড়া করে রাখা ঠোঙার মধ্যে সেই ভয়ংকর বস্তুটির দিকে এক পলকের জন্য হলেও এসে দেখতে লাগল, দেখার কৌতুহলকে কিছুতেই দমন করতে পারল না তারা। এর থেকে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে প্রাণীতত্ত্বগত সাদৃশ্যের ব্যাপারে বাঁদরদের কিছু ধারণা (notion of zoological affinities) আছে। কেন না, ব্রেহ্মের পোষা বাঁদরদের মধ্যে অক্ষতিকারক টিকটিকি, গিরগিটি বা ব্যাঙ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য সহজাত ভয় অমূলক হলেও লক্ষ্য করা গেছে। একটি ওরাং-ওটাংও এমনকি একটি ঘুঘু কে প্রথমবার দেখে বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

মানুষ, বিশেষ করে বন্য বা অসভ্য মানুষদের মধ্যে অনুকরণ-প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। মস্তিষ্কের কোন রোগ দেখা দিলে এই প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। দেখা গেছে, হেমিপ্লেজিয়া রোগগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তি বা অন্যরা মস্তিষ্কের স্নায়বিক কর্মের অবনতি হেতু প্রবল উত্তেজনার শুরুতে অসচেতন-ভাবে তাদের সামনে বলা প্রত্যেকটি কথা নকল করে যায়, তাদের মাতৃভাষা বা অজ্ঞাত কোন ভাষা, যে ভাষাতেই কথা বলা হোক না কেন, অনুকরণ অব্যাহত থাকে; শুধু তাই নয়, তাদের সামনে উপস্থাপিত অন্যদের অঙ্গভঙ্গী বা দৈহিক সঞ্চালন নকল করতেও তারা বাদ দেয় না। ডেজর বলেছেন, কোন জীবজন্তু স্বেচ্ছায় মানুষের কাজের নকল করে না, একমাত্র বাঁদর ছাড়া—যারা হাস্যোদ্দীপক ব্যঙ্গকার হিসেবে সুবিদিত। জীবজন্তুরা কখনো কখনো একে অপরকে নকল

করে থাকে। দেখা গেছে, কুকুরদের মধ্যে লালিত-পালিত হওয়া দুটি নেকড়ে কুকুরের মত ডাকতে শুরু করেছিল ; কোন কোন সময় শিয়ালরাও কুকুরের মত ডেকে থাকে। তবে এটিকে স্বেচ্ছাকৃত অনুকরণ বলা যাবে কিনা, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। আবার পাখীরা তাদের পিতা-মাতার স্বর নকল করে গাইতে শেখে ; মাঝে মাঝে অন্য পাখীদেরকেও অবশ্য তারা নকল করে থাকে। এবিষয়ে তোতাপাখীরা খুব ওস্তাদ। তারা যে কোন শব্দ মাত্র কয়েকবার শুনেই নিজেদের গলায় তুলে নিতে পারে। দ্যিউরো দ্য লা ম্যাল্ একটি কুকুরের কথা বলেছেন। কুকুরটি এক বিড়াল মায়ের রক্ষণাবেক্ষণে বড় হওয়ায় তার প্রতিপালিকার মতো পায়ের থাবা চাটতে এবং মুখ ও কান পরিস্কার করতে শিখেছিল। প্রখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ অডুইন্ও এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি নিজে এটা প্রত্যক্ষ না করলেও অন্য কিছু নির্ভরশীল তথ্য হাতে পেয়েছি। এগুলির একটি এরকম : একটি কুকুর এক বিড়াল মায়ের দুধ না খেলেও তার বাচ্চাদের সঙ্গে একত্রেই বড় হয়েছিল ; এই কুকুরটিও পায়ের থাবা চাটতে আর মুখ ও কান পরিষ্কার করতে শিখেছিল এবং তার জীবদ্দশার তেরো বছর ধরে ঐই অভ্যাস সে চালিয়ে গেছে। দ্যিউরো দ্য লা ম্যালের কুকুরটিও বিড়ালছানাদের কাছ থেকে অনুরূপভাবে শিখেছিল কিভাবে একটি বল সামনের থাবা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং কিভাবে তার উপর উঠে দাঁড়াতে হয়। জনৈক পত্রলেখক আমাকে জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে একটি মেয়েবিড়াল দুধ খাওয়ার সময় তার থাবাটা দুধের পাত্রের (jug) মধ্যে ঢুকিয়ে দিত, কারণ তার মাথার তুলনায় মুখটা ছিল খুবই ছোট। এই বিড়ালটির একটি বাচ্চাও অচিরেই কৌশলটি আয়ত্ত করে নিয়েছিল এবং সুযোগ পেলেই অর্জিত বিদ্যাটি প্রয়োগ করত।

বিভিন্ন জীবজন্তুর বাচ্চাদের অনুকরণ প্রবণতা, বিশেষ করে তাদের সহজাত বা বংশগত প্রবণতার কথা মনে রেখে বলা যায় যে তাদের বাপ্-মাই তাদেরকে এগুলি শেখায়। এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বোঝা যায় যখন দেখি কোন বিড়াল-মা তার বাচ্চাদের কাছে জ্যান্ত ইঁদুর নিয়ে যাচ্ছে ; কিম্বা ধরা যাক দ্যিউরো দা লা ম্যালের বাজপাখীর উপর পরীক্ষিত কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যটি ; তিনি বলেছেন যে এই বাজপাখীরা তাদের বাচ্চাদের নানান কৌশল শেখাত, দূরত্ব পরিমাপের বিদ্যা শেখাত। প্রথমে তারা শূন্যে মুখ থেকে মরা ইঁদুর ও চড়ুই পাখী ছেড়ে দিয়ে ধরতে শেখাত, যদিও বেশীর ভাগ সময় বাচ্চা বাজপাখীরা সেগুলি ধরতে ব্যর্থ হোত, এবং তারপরে জ্যান্ত পাখী এনে ছেড়ে দিয়ে শিকার করতে শেখাত।

মানুষের বুদ্ধিগত বিকাশের ক্ষেত্রে 'মনসংযোগ' একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তুদের মধ্যেও এই ক্ষমতাটি স্পষ্টতই বর্তমান : ইঁদুরের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বিড়ালের প্রস্তুতি এই মনসংযোগেরই নিদর্শন। আবার কখনো কখনো বন্য জন্তুরা শিকারের অপেক্ষায় এমন অভিনিবিষ্ট থাকে তখন তাদেরকে সহজেই বন্দী করা যায়। মিঃ বার্টলেট্ আমাকে এই বিষয়ে বাঁদরদের বৈচিত্র সংক্রান্ত একটি চমৎকার তথ্য জানিয়েছেন। এক ভদ্রলোক জুওলজিক্যাল সোসাইটির কাছ থেকে সাধারণ মানের বাঁদর কিনতেন নাটকে অভিনয় করার জন্য শিক্ষা দেবেন বলে। প্রত্যেকটি বাঁদরের জন্য তিনি পাঁচ পাউন্ড করে দাম দিতেন। একবার তিনি প্রস্তাব দেন—তিন চারটি বাঁদরকে কয়েক দিন নিজের কাছে রেখে তাদের মধ্যে থেকে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হলে তিনি প্রতিটি বাঁদরের জন্য দ্বিগুণ দাম দেবেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিভাবে তাঁর পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বোঝা সম্ভব যে কোন বাঁদরটি ভালো অভিনেতা হতে পারে, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, সমস্তটাই নির্ভর করে তাদের (বাঁদরদের) মনসংযোগের ক্ষমতার উপর। ব্যাপারটা একটু খুলে বললে এ রকম দাঁড়ায় : কোন বাঁদরের সঙ্গে তাঁর কথা বলা বা কোন কিছু ব্যাখ্যা করার সময় বাঁদরটির দৃষ্টি দেওয়ালে বসা কোন মাছি বা অন্য কোন সামান্য বস্তুতে আকৃষ্ট হলে তিনি বুঝতেন, একে দিয়ে কিছু হবে না। এমনকি তিনি তাদের অমনোযোগিতার জন্য শাস্তি দিয়ে শোধরাতেও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো : উৎসাহিত হওয়ার বদলে তারা আরো চুপচাপ হয়ে পড়ত। অন্যদিকে, যে সব বাঁদর তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনত বা লক্ষ্য করত, তাদেরকে সব সময়ই নানান জিনিস শেখানো যেত।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জীবজন্তুদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা স্থান সম্পর্কে চমৎকার স্মৃতিশক্তি কাজ করে। স্যার অ্যানড্রু স্মিথের কাছ থেকে শুনেছি যে উত্তমাশা অন্তরীপের একটি বেবুন তাঁকে ন'মাস পরে দেখেও ঠিক চিনতে পেরেছিল এবং আনন্দ প্রকাশ করেছিল। আমার নিজের একটি কুকুর ছিল। তার স্বভাবটা ছিল বুনো, অপরিচিত কাউকে দেখলেই খেঁকিয়ে উঠত। একবার একটানা পাঁচবছর দুই দিন তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ থাকার পর আমি তার বাসস্থানের কাছে গিয়ে পুরাণো অভ্যাস মত চিৎকার করে তাকে ডাকলাম ; তার মধ্যে উৎফুল্লভাব দেখা না গেলেও সে আমার পিছু পিছু চলতে শুরু করল এবং এমন ভাবে আমার নির্দেশ পালন করতে লাগল যেন মাত্র

আধঘণ্টার জন্য আমি তাকে ছেড়ে গেছিলাম। স্পষ্টতই গত পাঁচ বছর ধরে পুরাণো অভ্যাসগুলি তার মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল, এখন মুহূর্তের মধ্যেই তা জেগে উঠেছে। পি. হুবার স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, এমন্‌কি পিঁপড়েরাও চার মাস বিচ্ছেদের পর একই সম্প্রদাভুক্ত তাদের সহযোগীদের চিনতে ভুল করে না। জীবজন্তুরা নিশ্চয়ই পুনরাবর্তক ঘটনাগুলির অন্তবর্তী সময় বিরতিকে কোন না কোন ভাবে বুঝে নিতে পারে।

মানুষের অত্যন্ত উন্নত ক্ষমতাগুলির অন্যতম হচ্ছে 'কল্পনাশক্তি'। এর সাহায্যে সে ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই তার পূর্ববর্তী কোন ধারণা ও ভাবনাকে সংযুক্ত করতে পারে আর এভাবেই গড়ে ওঠে উৎকৃষ্ট ও মহান সৃষ্টিসমূহ। জাঁ পল রিশ্‌টার বলেছেন, 'একজন কবি যখন তার কাব্যের মধ্যে সৃষ্ট কোন শয়তান কখন চরিত্র হ্যাঁ অথবা না বলবে, তা নিয়ে ভাবতে বসে, তখন তাকে অর্থহীন মৃত চিন্তা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!' স্বপ্ন দেখার বিষয়টি থেকে মানুষের এই ক্ষমতাটির চমৎকার ধারণা পাওয়া যেতে পারে, কেননা, জাঁ পলের কথাতেই, "স্বপ্ন হোল কবিতার একটি স্বয়ংচালিত ক্রিয়া।" তাই বলা যায়, কল্পনাশক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা যেমন আমাদের ধারণার সংখ্যা, যথার্থ ও স্পষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনি নির্ভর করে অনৈচ্ছিক যোগাযোগকে গ্রহণ বা বর্জন করার বিচার ক্ষমতা ও রুচির উপর এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ক্ষমতা দ্বারা এগুলিকে যুক্ত করার উপরও এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা খানিকটা নির্ভরশীল। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া এবং সম্ভবত সমস্ত উন্নত-শ্রেণীর জীবজন্তুরা, এমনকি পাখীরাও[৩] স্বপ্ন দেখে থাকে, ঘুমোনোর সময় তাদের শারীরিক অন্দোলন ও মুখ থেকে উচ্চারিত আওয়াজ-ই তাদের স্বপ্ন দেখার প্রমাণ দেয়। তাদের যে কিছুটা কল্পনাশক্তি আছে, তা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। আবার রাত্রি বেলা, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে, কুকুরের করুণ স্বরে চিৎকার করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমরা এই চিৎকারকে কুকুরের গম্ভীর ধ্বনি বলে থাকি। তাবলে সমস্ত কুকুর-ই যে এমন করে, তা নয়। হাউজোর মতে, কুকুরেরা চাঁদের দিকে মোটেই তাকায় না, বরং তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দিগন্তে মেশা আকাশের কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে। তাছাড়াও তিনি মনে করেন, চারপাশের নানান অস্পষ্ট ছবি তাদের কল্পনাশক্তির পথ আটকে দাঁড়ায়, ফলে তাদের মনের মধ্যে

৩। হাউজো বলেছেন যে তাঁর প্যারোকিট, (Parokeet) ও ক্যানারি পাখিগুলি স্বপ্ন দেখত। দ্রঃ "Faculte's Mcstales," tom. ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

নানা আজগুবি প্রতিকৃতি ভেসে ওঠে। তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হয় তাদের অনুভূতি অনেকটাই যুক্তিহীন।

বেশী ঝুঁকি নেওয়া হবে? হোক। তবু আমি বলব মানুষের মানসিক ক্ষমতাগুলির মধ্যে 'যুক্তি' বা চিন্তাভাবনার স্থান সর্বাগ্রে। এমনকি জীবজন্তুদের যুক্তিশক্তি সম্পর্কে সন্দিহান লোকজনের সংখ্যাও এখন খুবই নগণ্য। লক্ষ্য করার বিষয় যে জীবজন্তুরা চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, যেন কিছু একটা ভাবে, তারপর মনস্থির করে আবার চলতে শুরু করে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ যত বেশী সময় ধরে এবং ভালোভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর আচার-আচরণকে লক্ষ্য করবেন, ততবেশী তিনি তার মধ্যে যুক্তির প্রাচুর্য দেখতে পাবেন, তুলনায় অনেক কম খুঁজে পান সহজাতপ্রবৃত্তির চিহ্ন।[৪] পরের পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখব অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর কিছু প্রাণীও দৃশ্যত যুক্তিগ্রাহ্য কিছু কাজ করে থাকে। অবশ্য অস্বীকার করে লাভ নেই যে সহজাত প্রবৃত্তি আর যুক্তিগ্রাহ্য কাজের মধ্যে ভেদরেখা টানা খুবই কষ্টসাধ্য। যেমন, ডঃ হেস্ তাঁর 'দি ওপেন পোলার সি' রচনাটিতে বার বার বলেছেন, পাতলা বরফের ওপর দিয়ে চলার সময় তাঁর কুকুরগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে স্লেজগাড়ি টানার বদলে পরস্পর দূরে সরে যেত ও পৃথক হয়ে পড়ত, যাতে তাদের দৈহিক ওজন সমানভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। এই ব্যাপারটা বেশীর ভাগ সময়ই আরোহীদের কাছে একটা সতর্কীকরণ হিসেবে উপস্থিত হোত, যার ফলে তারা বুঝতে পারত এখান থেকে বরফের প্রকৃতি পাতলা ও বিপজ্জনক। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—এই কুকুরগুলি কি তাহলে তাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা থেকে এরকম কাজ করত, নাকি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও শিক্ষিত কুকুরদের দেখাদেখি এমনটা শিখেছিল, নাকি তা বংশগত অভ্যাসের ফল, অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ? সম্ভবত তাদের মধ্যে এই ক্ষমতাটির উৎপত্তি হয়েছিল বহুদিন আগে, যখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্লেজ গাড়ি টানার কাজে তাদের প্রথম নিযুক্ত করেছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে এসকিমো কুকুরদের পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ উত্তরমেরু অঞ্চলের নেকড়রা পাতলা বরফের উপর বিচরণরত শিকারকে সকলে মিলে পাশাপাশি থেকে আক্রমন না করার অভ্যাস থেকেই এটা রপ্ত করেছিল।

৪। মিঃ এল. এইচ. মর্গ্যানের "দি আমেরিকান বীবর", খ্রীঃ ১৮৬৮, রচনাটিতে এই মন্তব্যের চমৎকার ব্যাখ্যা করা আছে। তবে আমার মনে হয় তিনি সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষমতাকে খুবই কমিয়ে দেখেছেন।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত কাজগুলিকে বিচার করে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে সেগুলি সহজাত প্রবৃত্তির ফল, না যুক্তি সম্মত কাজ, না কি কেবলমাত্র কিছু ধারণার সমষ্টিগত ক্রিয়া? অবশ্য শেষের বিষয়টি (ধারণার সমষ্টি) যুক্তিশক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। অধ্যাপক মোবিয়াস বানমাছ সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছেন। একই অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে তিনি একটি বান মাছকে চওড়া কাঁচ দিয়ে অন্যান্য মাছেদের থেকে আলাদা করে রেখেছিলেন। এতে দেখা গেল যে বান মাছটি অন্যপাশের মাছদের ধরবার জন্যে বারবার কাঁচটির গায়ে ধাক্কা মারছে এবং এত জোরে ধাক্কা মারছে যে মাঝে মাঝে নিজেই অচেতন হয়ে পড়ছে। এইভাবে তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বান মাছটি ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে কাঁচের গায়ে ধাক্কা মারা বন্ধ করল। এরপর ঐ কাঁচটিকে সরিয়ে নেওয়া হলেও সে আর আগের মতো অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যেকার মাছগুলিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হোল না; অবশ্য পরে ছাড়া মাছগুলিকে সে গোগ্রাসেই গিলেছিল। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, আগেকার মাছগুলিকে আক্রমণ করার সঙ্গে যে সাংঘাতিক আঘাতটা মিশে ছিল, তা তার দুর্বল মস্তিকের মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে গেঁথে গিয়েছিল। আবার যে বুনো মানুষটি কখনো সুবৃহৎ কাঁচের জানলা দেখে নি, সে যদি একবার ঐ জানলায় ধাক্কা মারে, তাহলে তার মনেও জানলা আর আঘাতের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়ে যাবে—তবে এই রয়ে যাওয়াটা কিন্তু ঠিক বানমাছের ঘটনাটার সঙ্গে মিলবে না। সে ঐ জানলার সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করবে আর ভবিষ্যতে একই রকম অবস্থার সম্মুখীন হলে সাবধানতা অবলম্বন করবে। আবার আমরা যদি বাঁদরদের লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, কখনো কখনো একবার মাত্র অনুষ্ঠিত কাজ থেকে প্রাপ্ত ব্যথা বা বিরক্তির ধারণা তাদের দ্বিতীয়বার ঐ কাজ করা থেকে বিরত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। এখন যদি ধরা যায় বাঁদর ও বান মাছের মধ্যে এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ একজনের তুলনায় অন্যজনের মধ্যে ধারণার সংযুক্তি অনেক বেশী জোরালো ও দৃঢ়মূল (যদিও বানমাছটি প্রায়শই অনেকবেশী মারাত্মক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে), তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঐ একইরকম পার্থক্য থাকলে তাদের মানসিক গঠনও মূলগতভাবে পৃথক হবে?

হাউজো জানিয়েছেন, যখন তিনি টেক্সাসের বিস্তীর্ণ শুকনো সমতলভূমি হেঁটে পার হচ্ছিলেন; তখন তাঁর সঙ্গে থাকা কুকুর দুটি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে কম করে তিরিশ থেকে চল্লিশবার কোন খাত দেখলেই জলের আশায় ছুটে গিয়েছিল।

কিন্তু এই খাতগুলিতে কোন জল ছিল না, তাতে কোন সবুজের চিহ্ন বা আদ্র মাটির গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু কুকুরগুলির এইরূপ আচরণের কারণ কী? নিশ্চয়ই তারা জানত গর্ত থাকলেই জলের সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশী। অন্যান্য জীবজন্তুদের মধ্যেও হাউজো এরকম আচরণ লক্ষ্য করেছেন।
আমার নিজের চোখে দেখা এবং সম্ভবত অনেকেই চিড়িয়াখানায় দেখে থাকবেন, কোন হাতির নাগালের বাইরে মাটিতে একটি ছোট বস্তু ছুঁড়ে দিলে প্রথমেই সে তার শুঁড় দিয়ে মাটিতে হাওয়া দিতে থাকে, যাতে করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়া বায়ুর চাপে বস্তুটি সহজেই তার নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। প্রখ্যাত নৃ-কুলতত্ত্ববিদ (ethnologist) মিঃ ওয়েষ্ট্রোপ ভিয়েনাতে দেখা তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানিয়েছেন। অভিজ্ঞতাটি এরকম: একটি ভল্লুক তার খাঁচার দরজার কাছে অবস্থিত জলের উপর ভাসমান একটুকরো রুটিকে নিজের কাছে টেনে আনার জন্য পায়ের থাবা দিয়ে জল টানছে। সুতরাং হাতী ও ভল্লুকের এই ধরণের কাজগুলি কে সহজাত প্রবৃত্তি বা বংশগত অভ্যাস বললে ভুল হবে, কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তাদের এই ধরণের কাজ করার কোন দরকারই হয় না। কিন্তু, একজন অসভ্য মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর একটি জন্তুদ্বারা সম্পাদিত এই রকম কাজের মধ্যে তফাৎ কী? দেখা যাক্। অসভ্য বুনোমানুষ ও কুকুর, উভয়েই প্রায়ই কোন নিচু জায়গায় জলের সন্ধান পেয়েছে এবং তাদের মনের মধ্যে জল আর নিচু জায়গা একটা অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। একজন সুসভ্য মানুষ এবিষয়ে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারে, কিন্তু অসভ্য লোকদের সম্পর্কে জানা সকল তথ্যকে বিচার করে দেখতে মনে হয় যে তাদের পক্ষে এরকম সিদ্ধান্তে পেঁছিনো সম্ভব নয়, আর কুকুরদের পক্ষে তো আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু একজন বুনোলোক ও একটি কুকুর একইভাবে তাদের অনুসন্ধান চালায়, যদিও বার বার তাদের আশাহত হতে হয় এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই কাজটার পিছনে কিছু যুক্তি কাজ করে থাকে, তা সে বিষয়টি সম্বন্ধে কোনসাধারণ সিদ্ধান্ত তাদের সামনে থাক আর না-ই থাক।[৫] সুতরাং হাতী ও ভল্লুকের দ্বারা বাতাস বা জলের মধ্যে সৃষ্ট প্রবাহও একই নিয়মের বশবর্তী। আবার একজন বুনো লোকের পক্ষে জানা বা খেয়াল করা সম্ভব নয় কোন নিয়মের দ্বারা তার আকাঙ্খিত কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে। তথাপি তার কাজকর্ম কিছুটা

৫। অধ্যাপক হাক্সলি অত্যন্ত স্পষ্ট করে সেইসব মানসিক স্তরের ব্যাখ্যা করেছেন, যেগুলির সাহায্যে কোন মানুষ বা কুকুর আমার গ্রন্থে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমতুল কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

স্হূল যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন নিশ্চিতভাবে একজন দার্শনিক তাঁর অবরোহমূলক সিদ্ধান্তের দীর্ঘতম বিন্যাস করে থাকেন। এটাই হলো একজন বুনো মানুষের সঙ্গে একটি জন্তুর তফাৎ ; কারণ, মানুষ পরিবেশ ও অবস্হার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে এবং অনেক স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকেই সেগুলির মধ্যে কার যোগসূত্রটি অনুধাবন করতে পারে। এবং এই ব্যাপারটার গুরুত্ব অপরিসীম। এক সময় আমি আমার ছোট বাচ্চাটির সারাদিনে করা কাজগুলি লিখে রাখতাম। তার এগারো মাস বয়সের সময় তখনও সে কথা বলতে শেখেনি আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতাম কত তাড়াতাড়ি তার মনের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু ও শব্দের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আমার জানা সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী কুকুরের মধ্যেও এই সম্পর্ক এত দ্রুত গড়ে ওঠে না। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর জীব-জন্তুর মধ্যেও এই ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের যেমন বানমাছ, থেকে পৃথক হয়। তাছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

নিম্নশ্রেণীর আমেরিকান বাঁদরদের নিম্নোক্ত কিছু কাজের সাহায্যে বেশ স্পষ্ট করেই দেখানো যেতে পারে কিভাবে সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যুক্তি বা চিন্তাভাবনার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত মনোযোগী পর্যবেক্ষক রেঙ্গার জানিয়েছেন যে প্যারাগুয়েতে থাকার সময় তিনি যখন প্রথমবার তাঁর পোষা বাঁদরদের ডিম খেতে দিয়েছিলেন, তারা মাটিতে আছড়ে সেগুলি ভেঙে ফেলেছিল। ফলে বেশীর ভাগ ডিমেরই কুসুম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা ডিমের একটা প্রান্ত শক্ত কোন কিছুতে ঠুকে তারপর আঙুল দিয়ে তার খোলা ছাড়িয়ে ফেলতে শিখেছিল। আবার ধারালো কোন যন্ত্রে যদি একবার তাদের হাত কেটে যেত, তাহলে তারা দ্বিতীয়বার আর সেটা স্পর্শ করত না, কিম্বা করলেও খুব সতর্কভাবে করত। আবার এও শুনেছি, এই বাঁদরদের জন্যে কাগজে মোড়া চিনির ডেলা বরাদ্দ ছিল ; কিন্তু রেঙ্গার মাঝে মাঝে কাগজের মোড়কের মধ্যে জ্যান্ত বোলতা রেখে দিতেন, যাতে মোড়কটা তাড়াহুড়ো করে খুললেই তাদের হুলের কামড় খেতে হয় ; কিন্তু এরকম ঘটনা একবার ঘটে যাওয়ার পর বাঁদরগুলি সব সময় প্রথমে কানের কাছে কাগজের মোড়কটা ধরে বুঝতে চেষ্টা করত ভিতরে কিছু নড়ছে কিনা।

৬। মিঃ বেল্ট তাঁর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বইটিতে (দ্রঃ "দি ন্যাচারালিষ্ট ইন নিকারাগুয়া", ১৮৭৪ পৃঃ ১১৯) একইভাবে সেবুস্‌জাতের একটি পোষা বাঁদরের বিভিন্ন কাজের কথা বলেছেন। তার বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে ঐ বাঁদরটির মধ্যে কিছুটা চিন্তাশক্তি ছিল।

এখন কুকুরদের সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ পেশ করা যাক। একবার মিঃ কলকিউহান দুটো বুনো হাঁসকে ডানা-বিদ্ধ করায় তারা নদীর অপর পাড়ে গিয়ে পড়ল। তাঁর শিকারী কুকুরটি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সেদুটোকে এক সঙ্গে নিয়ে আসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। যদিও সে আগে কখনো পাখীর ডানা মুড়িয়ে ধরতে শেখেনি, তবুও সে বুদ্ধি করে একটিকে মেরে ফেলে অন্য হাঁসটিকে নিয়ে আসার পর আবার গিয়ে মরাপাখীটিকে নিয়ে এল। কর্ণেল হাচিনসন জানিয়েছেন, একবার তিনি দুটো তিতির পাখীকে গুলিবিদ্ধ করার পর একটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় এবং দ্বিতীয়টি জখম হয়। জখম পাখীটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত শিকারী কুকুরের কাছে হার মানল এবং পাখীটিকে নিয়ে ফেরার সময় কুকুরটি মৃত পাখীটির সামনে এসে দাঁড়াল: "সে থামল, স্পষ্টতঃই হতবুদ্ধি, এবং তারপর বার দুয়েক চেষ্টা করে বুঝতে পারল এখন মরাটিকে তুলে নিলে জখম পাখীটি পালাবার সুযোগ পেয়ে যাবে; সামান্য ভাবল সে, তারপর মারাত্মক কামড়ে জখম পাখীটিকে হত্যা করে দুটি পাখীকেই এক সঙ্গে নিয়ে ফিরল। জীবনে এই একবারই কুকুরটি স্বেচ্ছাকৃত ভাবে শিকারকে আঘাত করেছিল।" এখানে, আমরা সঠিক যুক্তি বুদ্ধির অভাব দেখতে পাচ্ছি কারণ শিকারী কুকুরটি বুনো হাঁসের ঘটনাটির মতো প্রথমে আহত পাখীটিকে নিয়ে আসতে পারত, পরে মৃতটিকে। দুজন আলাদা আলাদা প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা এই ঘটনা দুটিকে আমি এখানে রাখলাম, কারণ, দুটি ঘটনাতেই শিকারী কুকুররা কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তাদের বংশগত অভ্যাস বা আচরণকে (শিকারের সময় শিকারকে হত্যা না করা) লঙ্ঘন করেছে এবং প্রমাণ দিয়েছে তাদের যুক্তি বা চিন্তা শক্তি কোন নির্দিষ্ট অভ্যাসকে অতিক্রম করার পক্ষে কতই না শক্তিশালী।

বিখ্যাত হামবোল্টের একটি উক্তি দিয়ে আমি বিষয়টিতে ছেদ টানব: "দক্ষিণ আমেরিকার খচ্চর চালকেরা বলে থাকেন, 'আমি আপনাকে চলতে-ফিরতে সবচেয়ে পারদর্শী খচ্চরটি দিচ্ছি না, কিন্তু যাকে দিচ্ছি সে চিন্তাভাবনায় সবচেয়ে তুখোড়।" এরপর হামবোল্ট লিখছেন—"দীর্ঘ অভিজ্ঞতা পুষ্ট, বহুল প্রচলিত এই উক্তিটি সম্ভবতঃ দূরকল্পী দর্শনের যাবতীয় যুক্তিপ্রণালীর তুলনায় সজীব যান্ত্রিক-পদ্ধতিকে অনেক বেশী করে বিরোধিতা করে।" তথাপি কোন কোন লেখক এখনও পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির

বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং তাঁরা উপরোল্লিখিত এই সমস্ত ঘটনার এমন সব ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন, যা নিছকই কথার কথামাত্র।[৭]

দেখা যাচ্ছে মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে, বিশেষ করে বাঁদরদের মতো উন্নত প্রাণীদের মধ্যে, সাধারণ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে। তাদের সকলের মধ্যে একই ইন্দ্রিয়ানুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ও সংবেদন,—একই ভাবাবেগ, অনুরাগ ও আবেগ লক্ষ্য করা যায়, এমনকি ঈর্ষা, সন্দেহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৃতজ্ঞতা, মহানুভবতা ইত্যাদির মতো অত্যন্ত জটিল বিষয়ও তাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। তারা প্রতারণা করতে শেখে ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়; কখনো বা বিদ্রূপ করার ইচ্ছা জাগে তাদের, এমনকি চমৎকার রসবোধও থাকে, যেমন থাকে বিস্ময় বা কৌতূহলবোধ। তাছাড়া অনুকরণ, মনোযোগ, কৌশল অবলম্বন, পছন্দ, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, ধারণার সংযুক্তি ও যুক্তি বুদ্ধির একইরকম কাজগুলি করতে পারে তারা, অবশ্য তার মধ্যে কমবেশী প্রভেদ থাকতেই পারে। একই প্রজাতির মধ্যে কেউ যেমন চূড়ান্ত নির্বোধ হয়, তেমনি অন্য একজন আবার হয়ে ওঠে প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। আবার মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ার ঘটনাও চোখে পড়ে, কিন্তু মানুষের মতো এত বেশি করে আর কারুর ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। তাসত্ত্বেও, অনেক লেখক জোরের সঙ্গে বলে থাকেন মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে একটি অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। পূর্বে আমি এ-ধরণের কিছু উক্তি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলাম; কিন্তু সেগুলির মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি আর সংখ্যাও এত সুপ্রচুর যে শেষ পর্যন্ত পিছোতে বাধ্য হলাম। এ-কথাটা জোর দিয়েই বলা হয় যে একমাত্র মানুষই ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম, অর্থাৎ মানুষই কেবলমাত্র যন্ত্রপাতি বা আগুন ব্যবহার করতে পারে, পশুদের পোষ মানাতে বা সম্পত্তি অধিকার করতে পারে; অন্য কোন প্রাণীর বিমূর্ত বা বস্তুনিরপেক্ষ জ্ঞান নেই, সাধারণ ধারণা গঠনে তারা অক্ষম, কেবল নিজেতেই বিভোর এবং ভাবপ্রকাশে জন্য কোন ভাষা তাদের জানা নেই।

৭। আমি দেখে খুশী হয়েছি যে মিঃ লেস্লী ষ্টিফেনের মতো অত্যন্ত যুক্তিবাদী একজন ব্যক্তিও মানুষের মন ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মনের মধ্যে কল্পিত সেই অনতিক্রম্য বাধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন (দ্রঃ "ডারউইনিজম্ এ্যাণ্ড ডিভাইনিটি, এসেজ অন্ ফ্রি থিঙ্কিং", ১৮৭৩, পৃঃ ৮০), "বস্তুতপক্ষে, যে ভেদরেখাটি টানা হয়েছে, অধিবিদ্যা বিষয়ক অসংখ্য ভেদরেখার থেকে আমরা তাকে উন্নত কিছু বলে মনে করতে পারি না। অর্থাৎ, ধরে নেওয়া হচ্ছে যে দুটি জিনিসকে দুটি পৃথক পৃথক নাম দিলেই তাদের প্রকৃতিও হবে পৃথক পৃথক। কোন ব্যক্তি যদি কখনো কুকুর পুষে থাকেন বা হাতীর আচার-আচরণ সম্পর্কে পূর্ব-পরিচিত হন, তাহলে কিভাবে তিনি জন্তু-জানোয়ারদের চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, তা বোঝা মুস্কিল।"

আর একমাত্র মানুষেরই আছে সৌন্দর্যবোধ, যেমন আছে খামখেয়ালীপনা, কৃতজ্ঞতাবোধ, নানান রহস্যময়তা ইত্যাদি ; সর্বোপরি, মানুষ ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং বিবেকবোধ সম্পন্ন। এখানে আমি এগুলির মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলি নিয়ে দু'চার কথা না বলে পারছি না।

আর্চবিশপ সুম্নার অনেক আগে বলেছিলেন যে একমাত্র মানুষই ক্রমান্বয় অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের মধ্যে উন্নতি অনেক বেশী ও দ্রুত এবং তার কারণও মুখ্যত এই জন্য যে সে কথা বলতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞান হস্তান্তর করতে পারে। ফাঁদ পাতা সম্পর্কে অভিহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন বয়স্ক পশুদের তুলনায় তাদের শাবকদের ধরা অনেক সহজ, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা শত্রুর বশীভূত হয়। অন্যদিকে, বেশ কিছু বয়স্ক পশুদের একই জায়গায় একই রকম ফাঁদ পেতে ধরা সম্ভব নয় বা একই রকম বিষ প্রয়োগে তাদের হত্যা করাও অসম্ভব। তা'বলে সকলেই যে বিষ খাবে বা ফাঁদে ধরা পড়বে, এমন ভাবাটাও অস্বাভাবিক। তাদের ভাই-বন্ধুদের ধরা পড়তে দেখে বা বিষের শিকার হতে দেখে তারা সতর্ক হতে শিখে যায়। উত্তর আমেরিকায় বেশ কিছুদিন ধর লোমযুক্ত প্রাণীদেরকে ধরার চেষ্টা চলছে ; প্রত্যক্ষদর্শীদের সর্বসম্মত সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, এই প্রাণীদের অধিকাংশই অসম্ভব রকমের বিচক্ষণ, সতর্ক ও ধূর্ত। অবশ্য এত দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে ফাঁদ পাতার কাজটি চলে আনছে যে এইসবগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের মধ্যে সঞ্চালিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। আমার কাছে আরো কিছু নজির আছে। প্রথম যখন কোন অঞ্চলে টেলিগ্রাফের তার টানানো হোত, তখন অনেক পাখিই তারে ধাক্কা খেয়ে মারা যেত, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এই বিপদকে এড়িয়ে চলতে শিখেছিল। সম্ভবত সাথীদের মৃত্যু দেখতে দেখতেই এই শিক্ষাটা পেয়েছিল তারা।

যদি আমরা বংশপরম্পরাক্রমে পশু-পাখিদের লক্ষ্য করি, তবে এব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকে না যে তারা মানুষ বা অন্যান্য শত্রুদের সম্পর্কে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করছিল, তাতে ধীরে ধীরে আলগা দিতে শেখে। এই সতর্কতার অধিকাংশই বংশগত বা সহজাত অভ্যাস প্রসূত হলেও, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এর আংশিক দাবীদার। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক, লেরয় জানিয়েছেন, যে সমস্ত অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় শিয়াল শিকার করা হয়, সেখানে শিয়ালছানারা প্রথম বার তাদের বাসস্থানের গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় থেকেই অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। যেসব অঞ্চলে শিয়াল শিকারীর প্রাদুর্ভাব কম,

সে সব অঞ্চলের বড় শিয়ালরাও এদের মতো এতটা সতর্ক হয় না। গৃহপালিত কুকুররা নেকড়ে বা শিয়াল থেকেই ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। এই কুকুররা তাদের পূর্বপুরুষদের মত ধূর্ত, সতর্ক বা সন্দেহ প্রবণ না হলেও তাদের মধ্যে কিছু নৈতিকগুণের ক্রমোন্নতি লক্ষ্যণীয়, যেমন, অনুরাগ, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য এবং হয়তো বা সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও। জানা গেছে, সারা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার কিছু অংশ, নিউজিল্যান্ড এবং সম্প্রতি হংকং ও চীনেও সাধারণ জাতের ইঁদুররা অন্যান্য প্রজাতির ইঁদুরের উপর আক্রমণ করছে এবং হটিয়ে দিচ্ছে। শেষের এই দুটি দৃষ্টান্তের বিবরণদাতা মিঃ স্কইনহো দেখিয়েছেন যে সাধারণ জাতের ঐ ইঁদুরদের দ্বারা বড় আকারের ইঁদুরদের (Mus coninga) হটে যাওয়ার কারন হচ্ছে সাধারণ ইঁদুরদের অপেক্ষাকৃত বেশী ধূর্ততা। শেষোক্ত এই বৈশিষ্ট্যটি মানুষের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনার অভ্যাসজাত অনুশীলনের ফল বলে অনুমান করা যেতে পারে, কেননা কম-চতুর বা স্বল্পবুদ্ধির প্রায় সমস্ত ইঁদুর মানুষের হাতে অবিরত ধ্বংস হয়ে থাকে। তবে এটাও হতে পারে যে সাধারণ জাতের ইঁদুরদের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে মানুষের সংস্পর্শে আসার আগেই প্রতিবেশী অন্যান্য ইঁদুরদের তুলনায় তাদের অনেক বেশী ধূর্ততার দরুণই। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই যদি এই ধারনা পোষণ করতে হয় যে যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোন জীবজন্তুরই বুদ্ধিমত্তা বা অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে নি, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রজাতির বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বেরই শরণ নিতে হবে। কেননা, লার্টেট-এর মতে, বিভিন্ন শ্রেণীতে অবস্থিত বর্তমান স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্কের আকার তাদের পূর্বপুরুষদের ত্রিস্তরবিশিষ্ট মস্তিষ্কের থেকে অনেক বড়।

হামেশাই বলা হয়ে থাকে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে না, অথচ শিম্পাঞ্জীরা অবস্থাবিশেষে দিব্যি এক ধরণের বুনো ফল (দেখতে অনেকটা আখরোট ফলের মতো) পাথর দিয়ে ভেঙে খায়। রেঙ্গারতো এভাবেই একটা আমেরিকান বাঁদরকে শক্ত তালের আঁটি ভাঙতে শিখিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নানারকম বাদামের খোসা ছাড়ানো এবং বাক্স খোলার জন্য পাথরের সাহায্য নিত। এমনকি, তৃপ্তিদায়ক গন্ধ না পেলে সে এইভাবে ফলের নরম খোসাও ছাড়িয়ে ফেলত। আবার অন্য একটি বাঁদরকে শেখানো হয়েছিল কিভাবে একটি মাত্র লাঠির সাহায্যে একটি বড় বাক্সের ডালা খুলতে হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হোল, তারপর থেকে সে এই

লাঠিটাকে কোন ভারী জিনিস সরানোর জন্য ঠিক লিভারের মতো ব্যবহার করত। তাছাড়া আমি একটি বাচ্চা ওরাং-ওটাংকে একটা ফাটলের মধ্যে লাঠির একপ্রান্ত ঢুকিয়ে অন্যপ্রান্তে চাড় দিয়ে লাঠিটাকে লিভার-দণ্ডের মতো ব্যবহার করতে দেখেছি। আবার ভারতবর্ষের পোষ-মানা হাতিরা যে গাছের ডাল ভেঙে মাছি তাড়াতে পারে, সে কথাও আমাদের অজানা নয়। এমনকি একটা বুনো হাতীকেও এ-ভাবে মাছি তাড়াতে দেখা গেছে। এবারের উদাহরণটি একটা বাচ্চা মেয়ে ওরাং-ওটাং সম্পর্কে, সে যখনি বুঝতে পারত তাকে এবার চাবুক মারা হবে, তখন তাড়াতাড়ি হাতের সামনে কম্বল বা খড় পেতে তাই দিয়েই নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করত। এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে পাথর বা লাঠিকে জন্তু-জানোয়াররা যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে পাথর বা লাঠিকে তারা আক্রমণ বা প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করে। সুবিখ্যাত পর্যটক শিম্পার বিবরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ব্রেহ্‌ম্‌ বলছেন যে আবিসিনিয়াতে সি. জেলাডা (c. gelada) প্রজাতির বেবুনরা দলে দলে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে শস্যক্ষেতগুলিকে লুঠ করবার জন্যে ; কখনো কখনো সি. হামাড্রিয়া (c. hamadrya) নামে অন্য এক প্রজাতির বেবুনদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, যার নিশ্চিত ফল হোল দু'পক্ষের মধ্যে জোর লড়াইয়ের সময় জেলাডা প্রজাতির বেবুনরা উপর থেকে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দেয়, প্রতিপক্ষ হামাড্রিয়া বেবুনরা তা এড়াতে চেষ্টা করে এবং শেষমেষ দু'পক্ষই হুঙ্কার দিয়ে এক অপরের দিকে ধেয়ে যায়। কোবার্গ-গোথার ডিউকের সঙ্গে আবিসিয়ার মেন্‌সা গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আক্রমনকারী একদল বেবুনের বিরুদ্ধে ব্রেহ্‌ম্‌ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছিলেন। প্রত্যুত্তরে তারা মানুষের মাথার মতো বড়ো বড়ো এত পাথর ফেলতে শুরু করেছিল যে আক্রমণকারীদের দ্রুত পিছু হটতে হয়েছিল, এবং বেশ কিছুক্ষণের জন্যে গাড়ী চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছিল। লক্ষ্যণীয় যে উল্লিখিত বেবুনরা সম্মিলিতভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। মিঃ ওয়ালেস্‌ তিনটি ভিন্ন ঘটনায় দেখেছিলেন যে স্ত্রী ওরাংওটাং ও তাদের বাচ্চারা "প্রচণ্ড ক্রোধে ডুরিয়ান গাছের ডাল ও তার ভীষণ কণ্টকময় ফল ছুড়ে দিচ্ছে ; এই প্রচণ্ড আক্রমণের দরুণ আমরা ঐ গাছের খুব কাছে পারিনি।" তাছাড়া অনেকবারই আমি দেখেছি যদি কেউ কোন শিম্পাঞ্জীকে বিরক্ত করে, তাহলে সে হাতের সামনে যা পায় তাই তার শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারে। এ প্রসঙ্গে উত্তমাশা অন্তরীপের সেই পূর্বোক্ত বেবুনটির কথা আর একবার মনে

করা যেতে পারে, যে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য জল দিয়ে কাদা তৈরী করেছিল।

চিড়িয়াখানার একটি বাঁদর তার দুর্বল দাঁতের জন্য একটুকরো পাথর দিয়ে বাদাম ভেঙে ভেঙে খেত। সেখান কার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা আমাকে জানিয়েছেন যে বাদাম ভাঙার পর সে পাথরটি খড়ের নীচে লুকিয়ে রাখত যাতে অন্য কোন বাঁদর সেটির খোঁজ না পায়। এখানে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য কুকুরদের মধ্যে এই ধারণাটি হামেশাই দেখা যায়। সংগ্রহ করা মাংসের হাড় তারা সবসময় নিজের দখলে রাখতে চায়। আবার পাখীরা তাদের বাসাটাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই মনে করে থাকে।

ডিউক অফ্ আরজিল বলেছেন—কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একটি যন্ত্র বানানোটা মানুষের একান্তই নিজস্ব বৈশিষ্ট এবং তিনি মনে করেন এই ব্যাপারটা মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জন্তুদের এক দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছে। পার্থক্যটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু স্যার জে. লুবকের কথার মধ্যেই আমি অধিকতর সত্য খুঁজে পাই। তাঁর মতে, আদিম মানুষ কোন বিশেষ প্রয়োজনে চক্‌মকি-পাথরের ব্যবহার করতে গিয়ে আকস্মিকভাবেই তা ভাঙতে সমক্ষ হয়েছিল এবং সেই ধারালো পাথরের টুকরোগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এই ঘটনার পর কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পাথর ভেঙে নেওয়াটা তো শুধু একটা কদম বাড়ানোর ওয়াস্তা! আর বিশেষ উদ্দেশ্যে পাথর ভাঙা শুরু হওয়ার পর, সেই ভাঙা পাথরকে ঘষে-মেজে কোন হাতিয়ার বা যন্ত্র বানানোটাও বেশ সহজই হয়ে পড়ে। তবে, নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের পাথর ঘষে-মেজে যন্ত্র তৈরী করার আগেকার সুদীর্ঘ সময়ের কথা বিচার করলে মনে হয় যে এই শেষোক্ত ঘটনাটা ঘটাতে (অর্থাৎ ভাঙা পাথরকে ঘষে-মেজে কিছু বানানো) বহুকাল সময় লেগেছিল মানুষের। তাছাড়া স্যার জে. লুবক মনে করেন যে, চক্‌মকি পাথর ভাঙার সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতো এবং সেগুলিকে ঘষে ঘষে মসৃণ করার সময় সৃষ্টি হতো প্রভূত তাপ। আর এভাবেই হয়তো "আগুন জ্বালানোর দুটি চালু পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল"। অধিকন্তু, আগ্নেয়গিরি সমন্বিত অঞ্চলে আগুনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ অবহিত ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়, কেননা গরম লাভা স্রোত মাঝে-মধ্যেই ছুটে যেত সবুজ বনের মধ্যে দিয়ে। আবার বনমানুষেরা সম্ভবত সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নিজেদের থাকার জন্যে অস্থায়ী মাচা তৈরী করে থাকে। কিন্তু যেহেতু বহু প্রবৃত্তিই যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত, তাই মাচা তৈরীর মতো সরল প্রবৃত্তিগুলি স্বেচ্ছাকৃত ও

সচেতন ক্রিয়ায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আমরা অনেকেই জানি, ওরাং ওটাংরা রাত্রিবেলা প্যান্ডানাস গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে। এই সম্বন্ধে ব্রেহ্মের তথ্যটি আরো চিত্তাকর্ষক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পোষমানা একটি বেবুন সূর্যের তাপ থেকে রেহাই পাবার জন্য মাথার উপর একটা খড়ের চাটাই চাপিয়ে দিত! জন্তু-জানোয়ারদের এই সব আচরণ আসলে স্থূল স্থাপত্য ও পোষাকের মতো কিছু সাধারণ কৃৎকৌশলের প্রাথমিক ধাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, ভুললে চলবে না, তারা মানুষের আদি পূর্বপুরুষের মধ্যে থেকেই উত্থিত।

বিমূর্ত বা বস্তুনিরপেক্ষ, ধারণা সাধারণ ধ্যানধারণা, আত্মসচেতনবোধ, মানসিক স্বকীয়তা: আমার পক্ষে কিম্বা আমার চেয়েও জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষে বলা শক্ত যে জন্তু-জানোয়াররা কতখানি এই সমস্ত উন্নত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাণীদের মনের মধ্যে কী ঘটছে তা ঠিকমতো জানা সম্ভব নয় বলেই এই সমস্যার উৎপত্তি। আবার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন অভিমত থাকায় অসুবিধা বাড়ে বৈ কমে না। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে যদি কেউ বিচার করতে বসেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন এগুলি মুখ্যত এই ধারণার ভিত্তিতেই লিখিত হয়েছে যে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে কোন কিছুর বিমূর্তায়ণ করা বা সাধারণ ধারণা গঠনের ক্ষমতা বলতে আদৌ কিছু নেই। কিন্তু যখন কোন কুকুর অন্য একটি কুকুরকে দূর থেকে দেখতে পায়, তখন সে তাকে একটি কুকুর বলেই মনে করে। কারণ, দূরের কুকুরটি কাছে আসার পর সে তাকে বন্ধু বলে বুঝতে পারলে তার আচার-ব্যবহারে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সাম্প্রতিককালের একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতা মূলত একই প্রকৃতির নয় বলে দাবী করাটা স্রেফ একটা অনুমান মাত্র। মানুষ তার ইন্দ্রিয়ানুভূত উপলব্ধিকে মানসিক ধারণার স্তরে উন্নীত করতে পারে, এবং জন্তু-জানোয়াররাও তা করতে সক্ষম। আমি যখন আমার টেরিয়ার কুকুটিকে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করি (প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে আমি বহুবার এমনটি করে দেখেছি), "আরে, ওটা গেল কোথায়?" তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে তাকে কিছু একটা খুঁজতে হবে। প্রথমে সে চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর সবচেয়ে কাছের ঝোপটির মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ শিকারের সন্ধান করে। কিন্তু কিছুই না পেয়ে অবশেষে সামনের গাছটির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে সেখানে কোন কাঠবিড়ালী আছে কিনা। তাহলে কি এই কাজগুলি থেকে

স্পষ্ট হচ্ছে না যে তার মনের মধ্যে এ-রকম একটি সাধারণ ধারণা বা কল্পনা ক্রিয়াশীল রয়েছে যে কোন জীবজন্তুকে খুঁজে বার করতে বা শিকার করতে হবে? অবশ্য, আমি কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাবো, জীবন কী, মৃত্যু কাকে বলে,—এই জাতীয় চিন্তাভাবনার অর্থে ধরলে কোন পশুই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু চমৎকার স্মৃতিশক্তি ও কিছু পরিমাণ কল্পনাশক্তির অধিকারী কোন বুড়ো কুকুর (তার স্বপ্নের মধ্যে যে ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়) যে তার অতীত জীবনের বিভিন্ন শিকারের আনন্দ ও যন্ত্রণার কথা কখনো ভাবে না—সে ব্যাপারে কি নিশ্চিত হওয়া যায়? আর এটা হচ্ছে আত্মসচেতনতারই একটি রূপ। অন্যদিকে, বুখনার যেমন বলেছেন, কোন অসভ্য আদি অস্ট্রেলিয়াবাসীর স্ত্রী-টি (খুবই কম কথা জানা বা চারের বেশী সংখ্যা গুণতে না-পারা কঠিন পরিশ্রমী) কতটুকু আত্ম-সচেতনতা দেখাতে পারে বা নিজের অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতটুকুই বা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে? তাছাড়া, এটা সাধারণভাবেই স্বীকৃত যে উন্নতশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি, মনঃসংযোগ, ভাবনার সংযুক্তি, এমনকি কিছু পরিমাণে কল্পনাশক্তি ও যুক্তিবোধও কাজ করে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থাকা উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি যদি বিকাশযোগ্য হয়, তাহলে জোর দিয়েই বলা যায় যে ঐ সব সরল ধরণের ক্ষমতা ক্রমোন্নতি ও সংযুক্তির সাহায্যে গড়ে-ওঠা জটিলতর ক্ষমতাসমূহ, যেমন কোন বিষয়ের সারার্থ উপলব্ধির বা আত্মসচেতনতার উচ্চতর রূপ ইত্যাদির মতো ক্ষমতাগুলিও তাদের মধ্যে থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলা হয় যে, জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারার ঠিক কোন্ সময়ে জীবজন্তুরা সারার্থ উপলব্ধি ইত্যাদি ক্ষমতার যোগ্যতা অর্জন করল? তাহলে পাল্টা প্রশ্ন করতে হচ্ছে, আমরা কি জানি ঠিক কতবছর বয়সের সময় আমাদের শিশুরা এই ক্ষমতার অধিকারী হয়? আমরা শুধু দেখতে পাই আমাদের শিশুদের মধ্যে এইসব ক্ষমতা দারুণভাবে বেড়ে চলে।

জন্তুজানোয়ারদের মানসিক স্বকীয়তা নিয়ে আশা করি কোন দ্বিমত নেই। আগেই বলেছি কেবলমাত্র গলার আওয়াজ শুনে আমার কুকুরটি তার পুরোনো ঘটনার অনুষঙ্গগুলি ফিরে পেত। অর্থাৎ, তার মধ্যে একটি মানসিক স্বকীয়তা কাজ করত। যদিও দীর্ঘ পাঁচবছর সময় বিরতিতে তার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষের একাধিকবার পরিবর্তিত হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। কুকুরটি বোধহয় তার এই আচরণের সাহায্যে বিবর্তনতত্ত্ববিদদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উপস্থাপিত বিচিত্র যুক্তিটিকেই খাড়া করে বলতে চেয়েছিল, "সমস্ত মানসিক ভাব ও যাবতীয়

বস্তুগত পরিবর্তনের মধ্যেও আমি টি'কে আছি।···একগুচ্ছ কোষের পরিত্যক্ত শূণ্যে জায়গা পূরণ করতে উপস্থিত অন্য একগুচ্ছ কোষের উপর প্রথম কোষগুচ্ছের প্রভাব থেকে যায়—এই যুক্তি সচেতনতার বিরোধী, অতএব মিথ্যাও বটে। কিন্তু বিবর্তনবাদই এই যুক্তির উদ্গাতা, কাজেই ঐ মতবাদটিও ভ্রান্ত!"

ভাব প্রকাশের ভাষা: সঙ্গতভাবেই এই বিষয়টি মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলির অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, আর্কবিশপ হোয়েটলির মতে, "মানুষই একমাত্র প্রাণী নয়, যে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার আশ্রয় নিতে পারে বা অপরের ভাষা কম-বেশী বুঝতে পারে।" প্যারাগুয়াতে দেখা যায়, সেবুস্ এজারে জাতের বাঁদর উত্তেজিত অবস্থায় অন্তত ছ'টি ভিন্ন স্বরের আওয়াজ করে থাকে, যা অন্যান্য বাঁদরদের মধ্যে একই অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রেঙ্গার এবং আরো অনেকেই মনে করেন, আমরা যেমন বাঁদরদের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির অর্থ বুঝতে পারি, তারাও তেমনি আমাদেরটা আংশিক বুঝতে পারে। এবিষয়ে কুকুরের ডাক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা; গৃহপালিত কুকুররা কম করে চার-পাঁচ রকম ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ডাকতে পারে। কুকুরদের এইভাবে ডাকার রেওয়াজটা নতুন একটি কৌশল হলেও, তাদের পূর্বপুরুষরাও (নেকড়ে ও শিয়াল) নানারকম চিৎকার করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারত। শিকারের সময় গৃহপালিত কুকুরদের গলার আওয়াজে ব্যগ্রভাব ফুটে ওঠে; শোনা যায় ক্রুদ্ধ চিৎকার, গর্‌গর্ আওয়াজ; আটকিয়ে রাখলে হতাশায় কেঁউ কেঁউ করে, রাতে গম্ভীর স্বরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকে, আবার প্রভুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার সময় তাদের গলার স্বরে প্রকাশ পায় উল্লাস; কিন্তু কোন দরজা বা জানলা খোলানোর মতো কোন দাবী বা আর্জি জানানোর সময় তারা একেবারেই অন্য গলায় ডাকে। এছাড়া পশুপাখীদের ভাষা সংক্রান্ত এই বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হাউজো-র মতে, গৃহপালিত মোরগ কম করে বারোটি বিশেষ স্বরে ডাকতে পারে।

তবে, ভাবকে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করার নিয়মিত অভ্যাস একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মতো মানুষও অঙ্গভঙ্গী ও মুখের পেশী সঞ্চালন সহযোগে শব্দের সাহায্যে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। সরলতর ও সুস্পষ্ট অনুভূতিগুলির ক্ষেত্রেই এই ঘটনা বেশি করে দেখা যায়, যেগুলির সঙ্গে আমাদের উন্নততর বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক খুবই কম। ব্যথা, ভয়,

ক্রাধ, বিস্ময় ইত্যাদির জন্য আমরা যে শব্দ এবং তার উপযোগী অঙ্গভঙ্গী করে থাকি, আদরের শিশুটির উদ্দেশ্যে জননী যে অস্পষ্ট বিড়বিড় ধ্বনির উচ্চারণ করে—তা যে কোন কথার চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের থেকে মানুষের স্বতন্ত্র হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে উচ্চারিত কথার বোধগম্যতার ওপর নির্ভরশীল নয়, কেননা, কুকুররাও অনেক কথা ও শব্দ বুঝতে পারে। এই ব্যাপারে তারা ঠিক দশ-বারো মাস বয়সী কোন মানবশিশুর মতোই। দশ-বারো মাসের শিশুরা অনেক শব্দ ও ছোট ছোট কথা বুঝতে পারে কিন্তু একটি কথাও বলতে পারে না। আবার শুধুমাত্র স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষমতাটাই আমাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ তোতা বা আরো কিছু পাখী এ-বিষয়ে আমাদের চমৎকার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। এমনকি নির্দিষ্ট কোন ধারণার সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন শব্দকে সংযুক্ত করার ক্ষমতার মধ্যেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য নিহিত নেই, কারণ, কথা বলতে শেখা কোন কোন তোতাপাখী বস্তুর সঙ্গে শব্দকে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাকে নির্ভুলভাবে মেলাতে পারে।[৮] তাহলে কি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীও মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদই নেই? —নিশ্চয়ই আছে। প্রভেদটা হল—মানুষ বহুধরণের শব্দ ও ধারণাকে একসঙ্গে মেলাবার অসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে, যা স্পষ্টতঃই তার উচ্চপর্যায়ের মানসিক বিকাশের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে।

৮। এই বিষয়টির উপর আমি বেশ কিছু বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করেছি। এখানে যার কথা আগে বলা দরকার তিনি হলেন নৌ-সেনাধ্যক্ষ স্যার বি. জে. সুলিভান—একজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পিতৃগৃহে দীর্ঘদিনের একটি পোষা তোতাপাখি ছিল। পাখিটি বাড়ীর কয়েকজনকে এবং তাঁদের পরিবারের আসা-যাওয়া আছে এরকম কয়েকজন ব্যক্তিকে অবিকল তাদের নাম ধরে ডাকত। প্রাতরাশের সময় সে প্রত্যেককে 'সুপ্রভাত' বলত এবং রাতে শুতে যাবার সময় প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে 'শুভরাত্রি' উচ্চারণ করত। কখনোই তার এই অভ্যাসের ওলট-পালট ঘটেনি। সুলিভানের বাবাকে 'সুপ্রভাত' জানানোর সময় সে আরো কয়েকটি কথা যোগ করে দিত, যা তাঁর বাবার মৃত্যুর পর আর কখনো শোনা যায়নি। একবার একটা বাইরের কুকুর খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়াতে পাখিটা তাকে খুব বকাবকি করেছিল। আর একবার অন্য একটি তোতা তার খাঁচা থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে রাখা রসাল আপেল খাচ্ছিল বলে সে তাকে জোর ভর্ৎসনা করেছিল, যার কথাগুলি এরকম, "তুমি একটা পাজী তোতা"। তোতাপাখি সম্বন্ধে হাউজোর রচনাটিও উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, "ফ্যাকাল্‌তে মেঁতাল", tom, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)। ডঃ এ. মশ্‌কো জানিয়েছেন, তিনি একটি ষ্টারলিং পাখিকে (বেগুনী বা সবুজ রঙের পালকের উপর কালো ও বাদামী ছোপ ছোপ রঙবিশিষ্ট একধরণের হরবোলা পাখি) জানতেন। যখন কেউ আসত তখন সে তাকে "সু-প্রভাত" বলত এবং যাবার সময় সে শুনতে পেত "বিদায় বন্ধু"। জার্মান ভাষায় শেখা এই অভিবাদন জানাতে সে কখনোই ভুল করত না।

ভাষাতত্ত্বের অন্যতম প্রধান পথ প্রদর্শক হর্ন টুক্-এর মতে, চা বা কেক তৈরীর মতো কথা বলাও একটি শিল্পকর্ম; অবশ্য আরো প্রকৃষ্ট শিল্পকর্ম হচ্ছে লিখনশৈলী। কথা বলার ভাষা কিন্তু মোটেই কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, কেননা প্রত্যেকটি ভাষাই শিখতে হয়। তবে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যের সঙ্গে এর বিপুল পার্থক্য আছে, কারণ মানুষের মধ্যে কথা বলার এক সহজাত প্রবণতা কাজ করে, যেমন, আমাদের শিশুদের মুখে শোনা যায় অস্ফুট শব্দের গুঞ্জন, যদিও তাদের কারোর মধ্যেই চা বা কেক তৈরী করা অথবা লেখার সহজাত প্রবণতা থাকে না। অধিকন্তু, কোন ভাষাতত্ত্ববিদই এখন আর মনে করেন না যে কোন ভাষা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্ট হয়েছে; ধীরে ধীরে ও অসচেতনভাবে অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করেই বিকশিত হয়েছে ভাষা।[৯] পাখীদের নানারকম কিচিরমিচিরের সঙ্গে আমাদের বলা ভাষার সাদৃশ্য খুবই বেশি, কেননা একই প্রজাতির সকল পাখী তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য একইরকম আওয়াজ করতে অভ্যস্ত হয়; আবার সমস্ত জাতের গায়ক পাখীদের মধ্যে গান গাওয়ার ক্ষমতাটা সহজাত হলেও সত্যিকারের গান গাওয়া বা শীষ দিয়ে ডাকার ব্যাপারটা তারা তাদের মা-বাবা বা প্রতিপালকের কাছ থেকেই শিখে থাকে। ডেইনস্ ব্যারিংটন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই শব্দগুলি ঠিক "মানুষের ভাষার মতোই, অর্থাৎ পুরোপুরি সহজাত নয়"। গান গাওয়ার প্রাথমিক চেষ্টাকে "একটি শিশু কর্তৃক অস্ফুট শব্দ করার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।" বাচ্চা পুরুষ-পাখীরা দশ-এগারো মাস ধরে নিয়মিত গানের অনুশীলন করে চলে, বা, পাখী ধরা ব্যাধদের ভাষায়, "শব্দচয়ন" করে। তাদের প্রাথমিক চেষ্টা থেকে পরবর্তী সময়ের গান সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া মুশকিল, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসল লক্ষ্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে অবশেষে "ঘুরে ফিরে গান শোনায়"। উড়তে না-পারা পাখীরা অন্য প্রজাতির পাখীদের গান শেখে যেমন টাইরোলের ক্যানারী পাখীরা এবং এইসব নতুন নতুন গান তাদের বাচ্চাদের শেখায়। ব্যারিংটনের মতে, একই প্রজাতির পাখিরা বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তাদের গান বা শীসের মধ্যে যে সামান্য স্বরগত পার্থক্য দেখা যায়, তাকে

৯। অধ্যাপক হুইট্নি লক্ষ্য করেছেন (পৃঃ, ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড লিঙ্গু-ইস্টিক ষ্টাডিজ', পৃং ৩৫৭) মানুষের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের ইচ্ছা জীবন্ত আকারে রয়েছে আর তা ভাষার উন্নতিতে "সচেতন ও অসচেতন দুভাবেই কাজ করে থাকে; আশু লক্ষ্যে পৌঁছনোর ব্যাপারে কাজ করে সচেতনভাবে, আর তার পরবর্তী ফলাফলের ক্ষেত্রে কাজ করে অসচেতনভাবে।

সহজেই 'আঞ্চলিক উপভাষার' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের গলার স্বর বিভিন্নজাতির মানুষদের বলা ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এত কিছু বিশদভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে, কোন বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করার সহজাত প্রবণতা মানুষের একচেটিয়া নয়। স্পষ্ট করে কথা বলতে পারা কোন একটি ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে একদিকে মিঃ হেনস্লে ওয়েজউড, রেভারেন্ড এফ. ফ্যারার ও অধ্যাপক শ্লিশারের অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধগুলি, এবং অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাক্স মুলরের বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি পড়ার পর আমি নিঃসন্দেহ যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শব্দ ও অন্যান্য প্রাণীদের গলার স্বরকে নকল করে এবং সংকেত ও অঙ্গভঙ্গী সহ মানুষের সহজাত চিৎকার থেকে। হয়তো মানুষের কোন পূর্ব পুরুষ বা একেবারে আদিম অবস্থার মানুষের গলা দিয়ে প্রথম সুরযুক্ত ধ্বনি অর্থাৎ গান বেরিয়ে এসেছিল, যেমন এখন আমরা দেখতে পাই গিবনজাতের বাঁদরদের মধ্যে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কথা বলার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়েছিল স্ত্রী ও পুরুষের পূর্বরাগের সময়, যেখানে কথার সাহায্যে তাদের মনের নানান আবেগ, ভালোবাসা; ঈর্ষা, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ জানানো ইত্যাদি প্রকাশ পেত। আর সেইজন্য বোধহয় স্পষ্ট করে শব্দ উচ্চারণ করার সাহায্যে গীতিময় ধ্বনির অনুকরণই মনের বিভিন্ন জটিল আবেগকে প্রকাশ করার মতো শব্দ সৃষ্টি করেছিল। আবার আমাদের সঙ্গে নিকট সাদৃশ্যযুক্ত বাঁদর, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নির্বোধ ও অ-সভ্য বুনো জাতের লোকদের একটি জোরালো প্রবণতা হলো নকল করা : তারা যা দেখে বা শোনে, তা-ই নকল করে। অনুকরণ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে এদিকটায় নজর দেওয়া দরকার, বাঁদররা তো আমরা যা বলি তার অনেক কথাই বুঝতে পারে এবং বনের মধ্যে কোন বিপদ দেখা দিলে তারা তাদের প্রতিবেশীদের চিৎকার করে সংকেত দেয় সাবধান হয়ে যাওয়ার জন্যে। মোরগরাও আকাশে বা মাটিতে বাজপাখি দেখলেই গলায় এক ধরণের আওয়াজ তুলে বিপদ সংকেত জানাতে ভুল করে না (বাঁদর ও মোরগের এই চিৎকার এবং তাদের অন্যান্য চিৎকারের অর্থ কুকুররা বুঝতে পারে)।[১০] তাহলে এমনটা কি হতে পারে না যে বাঁদরদের মতো কোন বুদ্ধিমান

১০। অধ্যাপক হাউজো এই বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ থেকে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়েছেন। দ্রঃ, "ফ্যাকাল্তে মোতাল ছ অ্যানিমো", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮।

প্রাণী তাদের ভীতি উদ্রেককারী শিকারী জন্তুদের গোঁ-গোঁ আওয়াজ নকল করে তাদের প্রতিবেশী বাঁদরদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করত? এই অনুকরণই হয়তো ভাষা সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ।

গলার স্বর যতবেশী ব্যবহার হতে লাগল, ব্যবহারের বংশগত প্রভাবের দরুণ স্বরযন্ত্রও ততবেশী শক্তিশালী ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠল। এই বিষয়টি কথা বলার ক্ষমতার উপরেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভাষার ক্রমাগত ব্যবহার ও মস্তিষ্কের বিকাশের মধ্যেকার সম্পর্কটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের কিছু পূর্বপুরুষের মানসিক ক্ষমতা সেই সময়ের যে-কোন বাঁদরের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিল; এমন কি সেই পূর্বপুরুষরা যখন সামান্যতম কথাও বলতে শেখেনি, তখনও এই ব্যবধান কার্যকরী ছিল কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে এই ক্ষমতার ক্রমাগত ব্যবহার ও প্রাগ্রসরতা মানুষের মনের উপর দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সুশৃঙ্খল চিন্তা করতে সক্ষম করে তুলেছে মানুষের মনকে। শব্দের সাহায্য ছাড়া চিন্তার জটিল স্রোত কখনোই এগোতে পারে না, তা সেই শব্দ উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত, যা-ই হোক না কেন। ঠিক যেমন সংখ্যা বা বীজগণিতের সাহায্য ছাড়া কোন দীর্ঘ হিসেব মেলানো সম্ভব নয়। এমনকি সাধারণ চিন্তা প্রক্রিয়ার জন্যেও কিছু-না-কিছু শব্দের প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে লরা ব্রিজম্যান নাম্নী এক অন্ধ, কালা ও বোবা মেয়ের কথা বলা যায়। ঘুমের মধ্যে সে যখন কোন স্বপ্ন দেখত, তখন তার হাতের আঙুলগুলি স্বপ্নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়াচড়া করত। অবশ্য, কোনরকম শব্দ বা ভাষা ছাড়াই স্পষ্ট ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারণার দীর্ঘ পরম্পরা মনের মধ্যে বয়ে যেতে পারে, যেমনটা দেখা যায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা কুকুরদের শারীরিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে আমরা এটাও জেনেছি যে, জন্তুজানোয়াররা কোন ভাষার সাহায্য ছাড়াই কিছুটা চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম। আবার আমাদের এই উন্নত মস্তিষ্কের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটিকে চমৎকারভাবে দেখানো যেতে পারে মস্তিষ্কঘটিত সেই সব রোগের উদাহরণ টেনে, যেগুলির ফলে কথা বলার ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, অন্যান্য কথা মনে পড়লেও আসল কথার ক্ষেত্রে স্মৃতি বিভ্রম, বা নির্দিষ্ট কিছু কথা ভুলে যাওয়া, অথবা শব্দের প্রথম অক্ষর বাদে বাকিটুকুর বিস্মরণ এবং কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামের বিস্মৃতি।[১১] মস্তিষ্ক ও স্বরযন্ত্রের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এগুলির আকৃতি ও কাজে বংশগত পরিবর্তন ঘটেছে, ঠিক যেমনটা ঘটে থাকে হাতের লেখার ক্ষেত্রে। হাতের লেখা নির্ভর করে অংশত

১১. এ বিষয়ে অনেকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য, ডঃ বেট্‌মান-এর রচনা "অন্ অ্যাফাসিয়া", পৃঃ ২৭, ৩১, ৫৩, ১০০, ইত্যাদি)।

হাতের গঠনের উপর এবং অংশত মানসিক বিন্যাসের উপর। বলা যেতে পারে হাতের লেখা নিশ্চিত ভাবেই একটা বংশগত গুণ।

কিছু কিছু লেখক, বিশেষত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, সম্প্রতি জোরের সঙ্গে বলেছেন, ভাষা-ব্যবহার বা কথা বলতে পারার ফল স্বরূপই নানান সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে, এবং যেহেতু জন্তু-জানোয়াররা এই ক্ষমতার অধিকারী নয়, তাই মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একটি অনতিক্রম্য দূরত্ব থেকেই যায়।[১২] কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, পশু-পাখীদের মধ্যে, অগোছাল বা প্রাথমিকভাবে হলেও, এই ক্ষমতাটি আছে। আমি বুঝতে পারি না কিভাবে দশ-এগারো মাসের বাচ্চারা এবং বোবা-কালারা নির্দিষ্ট কিছু শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ ধারণাকে মেলাতে পারে। কিন্তু ঐ ধারণাগুলি তাদের মাথার মধ্যে আগে থাকতেই গড়ে না উঠে থাকলে এ ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠত। আরও বুদ্ধিমান প্রাণীদের সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। মিঃ লেসলি ষ্টিফেন বলেছেন, "কুকুরের মধ্যে বিড়াল বা ভেড়া সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে, এবং একজন দার্শনিকের মতোই তারা এ-ব্যাপারের প্রয়োজনীয় শব্দগুলি বুঝতে পারে; আর এই বুঝতে পারার ক্ষমতাটা কথা বলার ক্ষমতার মতোই তাদের স্বরযন্ত্রের উন্নত অবস্থার সাক্ষ্য দেয়—যদিও এই প্রমাণটা অনেক অস্পষ্ট বা নিকৃষ্ট মানের।

এটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয় যে কেন অন্যান্য অঙ্গের

১২। এই বিষয়ে অধ্যাপক হুইটনের মতো বিশিষ্ট একজন ভাষাতত্ত্ববিদের রায় আমার চেয়ে অনেক জোরালো। অধ্যাপক ব্লিকের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন (দ্রঃ "ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্ ষ্টাডিজ," পৃঃ ২৯৭), "যেহেতু ভাষা হোল চিন্তা-ভাবনার একান্ত জরুরী সহায়ক, চিন্তাশক্তির বিকাশে, সচেতনতার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করার জন্য বোধের নিজস্বতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতার বিকাশে যেহেতু ভাষা অপরিহার্য, তাই তিনি সোৎসাহে বলেছেন যে ভাষা ছাড়া চিন্তা একেবারেই অসম্ভব—অর্থাৎ, মূল ক্ষমতাটিকে তার কার্যসাধনের উপায়ের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। একইভাবে তিনি এ-ও বলতে পারতেন যে মানুষের হাত কোন যন্ত্রছাড়া কাজ করতে পারে না। এরকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করলে তিনি অনিবার্যভাবেই অধ্যাপক ম্যুলারের সেই হুঙ্কারজনক কূটাভাসেই গিয়ে পৌঁছতেন, অর্থাৎ, শিশুরা অর্থাৎ যারা এখনও কথা বলতে শেখেনি মনুষ্যপদবাচ্য নয় বা বোবা-কালারা উচ্চারিত কথায় তাদের আঙুল ব্যবহার করতে না শেখা পর্যন্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে পারে না।" অধ্যাপক ম্যুলার তাঁর মূল সূত্রটিকে বাঁকানো হরফ দিয়ে এভাবে প্রকাশ করেছেন, "শব্দ ছাড়া কোন চিন্তা হতে পারে না, আবার চিন্তা ছাড়া কোন শব্দও থাকতে পারে না।" (দ্রঃ "লেক্চারস্ অন্ মিঃ ডারউইন্স্ ফিলজফি অফ্ ল্যাঙ্গুয়েজ", তিন নম্বর বক্তৃতা)। 'চিন্তা' শব্দটির কী অদ্ভুত সংজ্ঞাই না দিয়েছেন অধ্যাপক।

তুলনায় আমাদের স্বরযন্ত্র প্রথম থেকেই এত নিখুঁত। পিঁপড়েদের ভাষা সম্বন্ধে হুবার গোটা একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে আলোচনা করেছেন এবং সেখানে তিনি দেখিয়েছেন, পিঁপড়েরা শুঁড়ের সাহায্যে খবর আদান-প্রদান করতে খুবই পারদর্শী। চেষ্টা করলে হয়তো আমাদের আঙুলকে ভাবপ্রকাশের জোরালো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেত; কারণ, দেখা গেছে, কোন জনসমাবেশের দ্রুত বক্তৃতার প্রতিটি কথাই একজন কালা লোককে আঙুল নেড়ে নেড়ে বোঝানো যেতে পারে, যদি একটু অভ্যাস করা যায়। কিন্তু এভাবে হাতকে ব্যবহার করতে হলে অন্য কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দারুণ অসুবিধায় পড়তে হত। আবার যেহেতু উচ্চশ্রেণীর সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আমাদের মতো একইরকম ভাবে গঠিত স্বরযন্ত্র আছে এবং যেহেতু তা মনের ভাব আদান-প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হয়, তাই ধরেই নেওয়া যায় যে, যদি তাদের ভাব আদান-প্রদান সম্পর্কটি আরও উন্নত হতো, তাহলে স্বরযন্ত্রের ক্ষেত্রেও আরো উন্নতি চোখে পড়ত এবং তা নিশ্চয়ই স্বরযন্ত্রের সংলগ্ন জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যেই ঘটত।[১৩] উচ্চশ্রেণীর বাঁদররা যে কথা বলার কাজে তাদের স্বরযন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে না, তার মূল কারণ তাদের বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারে নি। হয়তো ক্রমাগত দীর্ঘ অনুশীলনের সাহায্যে তারা এই যন্ত্রটিকে কথা বলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারত, যদিও বাস্তবে তা হয়নি, যেমন হয়নি কিছু পাখীর ক্ষেত্রে, গান করার অনুকূল স্বরযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও যারা কখনো গান করতে পারে না। নাইটিঙ্গেল (ইউরোপে বুলবুল পাখীর মতো রাত্রে গান করা একধরণের পাখী) ও কাক, উভয়ের স্বরযন্ত্র একইভাবে গঠিত। কিন্তু নাইটিঙ্গেলের গলা দিয়ে যখন সুরযুক্ত স্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আর কাকের গলায় ধ্বনিত হয় শুধু কর্কশ কা-কা রব।[১৪] যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন বাঁদররা বুদ্ধিতে মানুষের মতো উন্নত হতে পারল না!, তাহলে তার উত্তরে সাধারণ কিছু যুক্তিই শুধু খাড়া করা

১৩। এই প্রসঙ্গে ডঃ মোদস্লে-র কিছু মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ "দি ফিজিওলজি অ্যাণ্ড প্যাথোলজি অফ মাইণ্ড", পৃঃ ১৯৯)।

১৪. চমৎকার পর্যবেক্ষক মিঃ ব্ল্যাক্‌ওয়াল জানিয়েছেন, ম্যাগ্‌পাই পাখি (লম্বা লেজ যুক্ত ও সাদা-কালো পালক বিশিষ্ট এক ধরণের কাক) ব্রিটেনের অধিকাংশ পাখির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এক একটি শব্দ, এমনকি, ছোট ছোট বাক্য বলতে শেখে। তথাপি, এদের অভ্যাস সম্বন্ধে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালানোর পর তিনি বলেছেন, এরা প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে থাকার সময় অনুকরণ করবার কোনরকম অস্বাভাবিক ক্ষমতারই পরিচয় দেয় না (দ্রঃ "রিসার্চেস্ ইন্ জুওলজি", পৃঃ ১৫৮)।

যায়। অবশ্য এর থেকে নির্দিষ্টতর কোন উত্তর চাওয়াটাই অযৌক্তিক। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী কিভাবে বিকাশের ধারাবাহিক স্তরগুলি অতিক্রম করেছে, সে ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা অনস্বীকার্য।

বিভিন্ন ভাষা ও প্রজাতির উদ্ভব এবং সেই সঙ্গে উভয়েরই (ভাষা ও প্রজাতির) ক্রমান্বয় উন্নতির তথ্যাদির মধ্যে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা যায়।[১৫] কিন্তু খুঁজলে এরকম অনেক কথা বা শব্দই পাওয়া যেতে পারে, যেগুলি প্রজাতির উদ্ভবের অনেক আগে সৃষ্টি হয়েছে; কারণ, আমরা বুঝতে পারি ঠিক কিভাবে এগুলি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকার কারণ হলো একই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া এবং এইসব ভাষার গঠনগত সাদৃশ্যের পিছনেও একই কারণ কাজ করেছে। অন্যান্য জিনিসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও কিছু হরফ বা ধ্বনির পরিবর্তন হয়, ব্যাপারটা ঠিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু বিষয়ের পরিবর্তনের মতোই। ভাষাও প্রজাতি, উভয়ক্ষেত্রেই আমরা পুনরাবৃত্ত অংশ, একনাগাড়ে দীর্ঘ অভ্যাসের ফল প্রভৃতি বিষয়ের আধিক্য দেখতে পাই। আবার উভয়ের মধ্যে বহু লুপ্তপ্রায় অংশের উপস্থিতিও বেশী চোখে পড়ে। 'am' শব্দের মধ্যে 'm' অক্ষরটির অর্থ হলো 'I' বা আমি। তাই 'I am' বা 'আমি হই' বলার সময় আমরা একটা অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় শব্দ উচ্চারণ করে থাকি। শব্দের বানানেও অনেকসময় দেখা যায় কোন কোন অক্ষর প্রাচীন উচ্চারণের লুপ্তাংশ হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া, সজীব প্রাণীদের মতোই ভাষাকেও নানান শ্রেণী, উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভাষাকে সাধারণভাবে ক্রমবিবর্তনের মতানুযায়ী অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেও ভাগ করা যায়। আবার এও তো সত্যি যে প্রধান প্রধান ভাষা ও উপ-ভাষাগুলি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে; ফলে অন্যান্য ভাষার ক্রমাগত বিলোপ ঘটে। স্যার সি· লাইয়েল বলেছেন, কোন প্রজাতি যেমন একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর পুনরাবির্ভূত হতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন ভাষাও একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর তার পুনরাবির্ভাব ঘটে না। আবার একটি ভাষা কখনোই দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে পরস্পর

১৫। স্যার সি· লাইয়েলকৃত প্রজাতি ও ভাষার উন্নতির মধ্যে সরস তুলনাটি এখানে উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, "দি জিওলজিক্যাল এভিডেন্সেস্ অফ্ দি অ্যান্টিকিটি অফ্ ম্যান", পরিচ্ছেদ ২৩)।

সংযুক্তি বা মিশ্রণ ঘটতেই পারে।[১৬] প্রত্যেকটি ভাষার মধ্যেই বৈচিত্র্য রয়েছে এবং অবিরাম নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে ; কিন্তু আমাদের স্মরণশক্তির ক্ষমতা সীমিত বলে এক একটি শব্দ এক একটি ভাষার মতোই ধীরে ধীরে লোপ পায়। এ-ব্যাপারে ম্যাক্সম্যুলার খুব সুন্দর মন্তব্য করেছেন : "প্রত্যেকটি ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণগত রূপের অভ্যন্তরে অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্য এক নিরন্তর সংগ্রাম চলে। ফলে, সবচেয়ে সেরা, সংক্ষিপ্ত আর সহজ রূপগুলিই ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর তারা এই সাফল্য লাভ করে তাদের অন্তর্নিহিত গুণের দ্বারাই।" অবশ্য কিছু শব্দের টিঁকে থাকবার জন্য এই সব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া, নতুনত্ব ও হাল্-চলতি কেতার কথাও বলা যেতে পারে। কারণ, মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতাই হচ্ছে সব জিনিষকে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন করে নেওয়া। সুতরাং, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে ভালোলাগা কিছু শব্দের টিঁকে থাকা বা সংরক্ষণকে প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

অসভ্য জাতিগুলির মধ্যে অত্যন্ত নিয়মিত ও বিস্ময়কর রকমের জটিল ভাষাকৃতি প্রায়শই দেখা যায়। এই ব্যাপারটাকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করে অনেকেই বলে থাকেন যে, এই ভাষাগুলি হয় দৈব সূত্রে প্রাপ্ত, নতুবা তাদের পূর্বপুরুষের উন্নত কলাকৌশল ও সভ্যতার ফসল। এফ. ফন্ শ্লেগেল্ লিখেছেন : "বুদ্ধিগত উৎকর্ষতার একেবারে নিম্নস্তরে থাকা ভাষাগুলিতে আমরা হামেশাই দেখে থাকি যে সেগুলির ব্যাকরণগত কাঠামোর কলাকৌশল অত্যন্ত উন্নত ও বিস্তারিত। বিশেষ করে বাস্কে, ল্যাপ্পোনিয়ান ও অনেক আমেরিকান-ভাষা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।" কিন্তু কেবলমাত্র বিস্তার ও সু-বিন্যাসের দরুণ কোন ভাষা সম্বন্ধে ধারণা করা ভুল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা এখন স্বীকার করেন যে একত্রে মিশে যাওয়ার আগে ধাতুরূপ, শব্দরূপ ইত্যাদি পৃথক পৃথক শব্দ হিসেবেই চালু ছিল। এবং যেহেতু এরকম শব্দগুলি ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট সম্পর্ক প্রকাশ করে থাকে, তাই একেবারে প্রথম যুগে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই যে এগুলিকে ব্যবহার করত, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। নিখুঁত সামঞ্জস্যপ্রসঙ্গে এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যা থেকে বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে আমরা কত সহজে ভুলের স্বীকার হয়ে থাকি : কোন কোন ক্রিনয়েডের (crinoid—sea-lily) দেহে প্রায় ১৫০,০০০ খোলা দেখা

১৬। এই প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড এফ. ডব্লু. ফ্যারার-এর চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ "ফিলোলজি অ্যাণ্ড ডারউইনিজ্‌ম্" উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, "নেচার", ২৪-শে মার্চ, ১৮৭০, পৃঃ ৫২৮)।

যায়, যে খোলাগুলি একেবারে নিখুঁত সামঞ্জস্যে সাজানো থাকে। কিন্তু কোন প্রাণীতত্ত্ববিদই মনে করেন না যে এই ধরণের প্রাণী, তুলনামূলকভাবে কিছু কম শারীরিক অংশবিশিষ্ট (এবং সেই অংশগুলিও শরীরের দুটি পাশ ব্যতীত আর কোথাও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়) দ্বিপার্শ্বিক প্রাণীদের চেয়ে বেশী নিখুঁত। বিভিন্ন শারীরিক অংশের পার্থক্য ও বিশেষত্বকে তিনি সঠিকভাবেই নিখুঁত সামঞ্জস্যের একটা পরীক্ষা হিসেবেই বিচার করেন। ভাষার বেলাতেও দেখা যায়, সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও জটিল ভাষাটিও কোন অসম, সংক্ষিপ্ত ও বহু-উপাদান-মিশ্রিত ভাষাকে টপকে যেতে পারে না। এমনকি সেই ভাষাগুলিকেও নয়, যারা বিভিন্ন বিজিত, বিজয়ী বা দেশান্তরী জাতিগুলির থেকে বহু ব্যঞ্জনাময় শব্দ ও বাক্যগঠনের রীতি ধার করে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে।

এই সব সামান্য ও অসম্পূর্ণ মন্তব্য থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, অ-সভ্য জাতিসমূহের ভাষাগুলির অত্যন্ত জটিল ও সুসম গঠনপ্রণালী এমন কোন প্রমাণ দাখিল করে না যে কোন বিশেষ সৃজন প্রক্রিয়ার ফলেই এগুলির উদ্ভব ঘটেছে। আবার, আমরা আগেই দেখেছি, স্পষ্ট করে কথা বলার বিষয়টিও নিজে থেকে এমন কোন প্রমাণ হাজির করে না, যা দিয়ে কোন নিম্নশ্রেণীর জৈবিক আকার থেকে মানুষের উদ্ভবের তত্ত্বকে অস্বীকার করা যেত পারে।

সৌন্দর্যবোধ : বলা হয়ে থাকে যে সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটা মানুষের একান্তই নিজস্ব। প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নেওয়া ভালো, আমি এখানে সৌন্দর্যবোধ বলতে শুধু কিছু রঙ, রূপ বা শব্দ থেকে প্রাপ্ত আনন্দের কথাই বলতে চাইছি, তবে সুসভ্য লোকেদের মনে এই অনুভূতিগুলি নানান জটিল ধারণা ও ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কোন কোন পুরুষ-পাখি তার উজ্জ্বল পেখম মেলে বা রঙের চমক লাগিয়ে তার সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করে; আবার অন্য অনেক পাখি এই গুণে বঞ্চিত, ফলে তারা ঐ-সব কাজও করতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মেয়ে-পাখিটি তার পুরুষসঙ্গীর সৌন্দর্যকে প্রশংসার চোখে দেখে না। তবে সব জায়গার মেয়েরাই এইসব পালক দিয়ে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসে, কাজেই এগুলির সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় না। হামিং পাখির বাসা আর নিকুঞ্জ পাখির খেলার জায়গা রঙ-বাহারী নানা জিনিস দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজানো থাকে এবং এর থেকে বোঝা যায় যে তারা এই ধরণের জিনিষ দেখে কিছু-না-কিছু আনন্দ লাভ করে। বেশীর ভাগ জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যবোধ ব্যাপারটা বিপরীত লিঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার স্তরেই রয়ে গেছে। জোড়-বাঁধার ঋতুতে পুরুষ-পাখির মিষ্টি

গান তাদের সঙ্গিনীদের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। মেয়ে-পাখিরা যদি তাদের পুরুষ-সঙ্গীদের সুন্দর রঙ, শরীরের নানান চমৎকার আভরণ গলার স্বরের মূল্য বুঝতে না পারত, তাহলে মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে পুরুষ-পাখিদের এত কষ্ট একেবারেই জলে যেত। কিন্তু মেয়ে-পাখিরা ও-সব বোঝে না, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কেন নির্দিষ্ট কিছু উজ্জ্বল রঙেই মাত্র তাদের দারুণ আনন্দ প্রকাশ পায়, তা বলা সম্ভব নয়, যেমন বলা সম্ভব নয় কেন বিশেষ কিছু স্বাদ ও গন্ধ আমাদের আকৃষ্ট করে। তবু মনে হয়, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অভ্যাস। কেননা, প্রথমে যা আমাদের ঠিক ভালো লাগে না, পরে তা-ই বেশ ভালো লাগতে শুরু করে, এবং সেই অভ্যাসটা বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। হেলম্‌হল্‌জ্‌ (Helmholtz) শব্দ বা আওয়াজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে (শারীরবৃত্তিয় নীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি) সুরলালিত্য ও নির্দিষ্ট কিছু স্বরের ওঠা-নামা কেন আমাদের ভালো লাগে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু, কোন শব্দ বেখাপ্পাভাবে থেকে থেকে ঝংকৃত হলে আমাদের মোটেই ভালো লাগে না—রাতে জাহাজের পাটাতনে যাঁরা দড়ি ঝাপটানোর অনিয়মিত আওয়াজ শুনেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ-কথাটা স্বীকার করবেন। দেখার ব্যাপারেও এই একই নীতি প্রযোজ্য; কেননা, চোখ সর্বদাই সামঞ্জস্যপূর্ণ বা নিয়মিত-ঘটা বস্তু-আকৃতি দেখতে ভালোবাসে। এমনকি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বুনোলোকেরাও ব্যবহার করার সময় চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক গড়নই পছন্দ করে এবং কিছু পুরুষ জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও এগুলি যৌন নির্বাচনের সাহায্যে অলংকারের পদে উন্নীত হয়েছে। কোন কিছু দেখে বা শুনে কেন আমরা আনন্দ লাভ করি, তার কোন কারণ দেখাতে পারি বা না পারি, এটা কিন্তু ঠিক যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা একইরকম রঙ, মনোরম বর্ণবৈচিত্র্য, রূপ আর শব্দ দেখে বা শুনে যথেষ্ট আনন্দ পায়।

সৌন্দর্যপ্রীতি, অন্ততপক্ষে মেয়েদের সৌন্দর্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রীতি—এটা মানুষের কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে এ-ব্যাপারে ব্যাপক রুচি পার্থক্য রয়েছে। এমনকি একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতির মানুষদের মধ্যে এর বোধ সম্পূর্ণ একরকম নয়। বুনো লোকদের নানানরকম বিকট দর্শন অলংকার ব্যবহার ও অদ্ভুত গানের সুর পছন্দ করা থেকে বলা যেতে পারে যে, তাদের নান্দনিক-বোধ পাখি ইত্যাদি কিছু প্রাণীর মতো ততটা উন্নত হয়নি। স্পষ্টতই কোন জীবজন্তু রাতের তারা-ভরা আকাশে, সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য কিম্বা রুচিসম্পন্ন সংগীতের সুরে আগ্রহ

প্রকাশ করে না। কারণ এই ধরণের উন্নত রুচির জন্যে প্রয়োজন কৃষ্টি ও জটিল চিন্তা-ভাবনার সংযুক্তি, অসভ্য বা অশিক্ষিত লোকেদের পক্ষেও তাই এগুলির স্বাদ নেওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছু জিনিষ মানুষের অগ্রগতিতে অত্যন্ত সাহায্য করেছে, যেমন, কল্পনাশক্তি, বিস্ময়বোধ, কৌতূহল, অশেষ সৌন্দর্য্যবোধ, অনুকরণ-প্রবণতা, উত্তেজনা বা নতুনত্বের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি। সেইসঙ্গেই দেশাচার ও প্রচলিত রীতিকে খেয়াল-খুশি মতো পরিবর্তিত করতেও এগুলি সক্ষম। আমি এই বিষয়টিতে (খেয়াল খুশি মাফিক পরিবর্তন) জোর দিলাম কারণ হালের একজন প্রবন্ধকার অদ্ভুতভাবে বলেছেন যে খামখেয়াল হচ্ছে "জন্তুজানোয়ার ও বুনো লোকদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট একটি পার্থক্য।" কিন্তু কেন নানারকম পরস্পর বিরোধী প্রভাবের ফলে মানুষ খামখেয়ালী হয়ে ওঠে, তার কারণ যেমন আমরা আংশিকভাবে বুঝতে পারি, তেমনি নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুরাও তাদের ভালোবাসা, পছন্দ-অপছন্দ ও সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে খামখেয়ালীপনার পরিচয় দেয়, তা-ও বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাছাড়াও মনে হয় যে তারা নতুনত্ব ভালোবাসে—ভালোবাসে ব্যাপারটা নতুন বলেই।

ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম বিশ্বাস: এমন কোন প্রমাণ জানা নেই, যা থেকে বলা যায় মানুষ একেবারে আদিম অবস্থা থেকেই কোন সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করত। বরং, শুধুমাত্র দ্রুত গমনকারী পর্যটকদের কাছ থেকে জানা নয়, বুনো বা অসভ্য লোকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে এমন অসংখ্য জাতি ছিল বা এখনও আছে, যাদের এক বা একাধিক ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই এবং তাদের ভাষাতেও ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণাকে প্রকাশ করার মতো কোন শব্দ নেই। অবশ্য পৃথিবীর একজন 'সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা' আছে কিনা—সেটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন। চিরস্মরণীয় অনেক গুণীজনই এই 'সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা' থাকার স্বপক্ষে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার আমরা যদি "ধর্ম" অভিধাটির মধ্যে অদৃশ্য বা অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসকে যোগ করি, তাহলে বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে বাধ্য। কারণ, প্রায় সব জায়গার অনুন্নত জাতির লোকজনদের মধ্যেই এই বিশ্বাসটি বহুল প্রচলিত। কী করে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নেয়, তা বুঝতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় না। কল্পনাশক্তি, বিস্ময়বোধ, কৌতূহল এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতা কিছুটা উন্নত হওয়ার পর মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার চারপাশের

ঘটনাকে বুঝতে চাইল এবং নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে চিন্তা করতেও শুরু করল। মিঃ ম্যালেনাম (Mr. M 'lennam) বলেছেন, "জীবনের ঘটনাবলী সংক্রান্ত একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতেই হয়েছে মানুষকে। জীবন সর্বব্যাপী—এটাই ছিল সরলতম ভাবনা। এই ভাবনা অনুযায়ী এগোতে গিয়ে মানুষ প্রথমে সম্ভবত এটাই ভেবেছিল যে, জীবজন্তু, গাছপালা, বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (ঝড়, বৃষ্টি, খরা, বন্যা ইত্যাদি), আর মানুষের নিজের মধ্যেকার যে-সব শক্তি তাকে কার্যে প্রণোদিত করে—সেগুলির মধ্যে একটা বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে।" মিঃ টাইলর বলেছেন, স্বপ্ন দেখা থেকেও মানুষের মধ্যে এইসব ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, বন্য লোকেরা কোন্‌টি কল্পিত আর কোন্‌টি বস্তুগত—এই দুই ধারণার মধ্যে তৎক্ষণাৎ তফাৎ করতে পারে না। স্বপ্ন দেখার সময় যখন বস্তু-আকৃতি তাদের সামনে প্রতীয়মান হয়, তখন তারা মনে করে ওগুলি কোন দূরবর্তী স্থান থেকে এসে তাদের উপর ভর করছে, বা, "স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মা বাইরে বেড়াতে যায়, তারপর আবার ফিরে আসে। তখন তার সঙ্গে থাকে এতক্ষণ যা দেখেছে, তার স্মৃতি।"১৭ কিন্তু যতক্ষণ না মানুষের মনের মধ্যে কল্পনাশক্তি, কৌতূহলস্পৃহা, যুক্তি সাজানোর ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি যথেষ্ট ভালোভাবে বিকশিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল স্বপ্ন দেখা থেকে সে কোন অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কোন

১৭। টাইলরের গ্রন্থ ("আর্লি হিস্ট্রি অফ্ ম্যান্‌কাইণ্ড", পৃঃ ৬) দ্রষ্টব্য। এছাড়াও লুবকের "দি ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব রিলিজিয়ন" বিষয়ে তিনটি অসাধারণ পরিচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য (মূলগ্রন্থ : "অরিজিন অফ্ সিভিলাইজেশন", ১৮৭০)। একইভাবে মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর চমৎকার প্রবন্ধে দেখিয়েছেন (দ্রঃ "ফর্টনাইটলি রিভিউ," ১লা মে, ১৮৭০, পৃঃ ৫৩৫), পৃথিবীতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের একেবারে গোড়ার কথা হলো স্বপ্ন দেখা বা ছায়ামূর্তি দেখা এবং অন্যান্য কিছু কারণ। সে নিজেকে শরীরগত ও আত্মাগত—এই দুই উপাদানের সমন্বয় হিসেবে ভাবতে শিখেছিল। আবার যেহেতু ধরে নেওয়া হলো যে আত্মা মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে ও দারুণ শক্তিশালী, অতএব তাকে খুশী করার জন্য প্রয়োজন হলো নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপহার প্রদান এবং সেই সঙ্গে তার সাহায্য প্রার্থনাও জরুরী হয়ে উঠল। মিঃ স্পেন্সার আরও দেখিয়েছেন যে, পশুপাখী বা কোন জিনিসের নামে কোন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষদের মূল নাম বা ডাক নাম প্রদানের রীতি থেকে বহুদিন পরে গোষ্ঠীগুলির প্রকৃত আদিপুরুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতই তখন এই রকম পশুপাখি বা জিনিষকে তখন এক জীবিত-আত্মা হিসেবে বিশ্বাস করা হয়; মনে করা হয় তারা পবিত্র এবং দেবতা কল্পনায় পুজোও করা হয় তাদের। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে এর আগেও একটি প্রাথমিক ও কঠিন ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে মানুষকে, যখন শক্তিমান বা গতিময় যে কোন জিনিসকেই কোন-না-কোনভাবে সজীব বলে মনে করা হতো, এবং সেই সঙ্গেই মনে করা হতো যে আমাদের মতো সেগুলিরও চিন্তাশক্তি আছে।

ধারণা করতে পারে না,—যেমন পারে না কুকুররাও। প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলি অপার্থিব বা পার্থিব উপাদানের দ্বারা জীবন্ত হয়ে ওঠে—বুনো লোকদের এই কল্পনা-প্রবণতাকে হয়তো আমার দেখা একটি ছোট ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমার কুকুরটি গায়ে গতরে যেমন বড়, তেমনই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন। একদিন সে বাগানের ঘাসের উপর চুপচাপ শুয়েছিল। দিনটা বেশ গরম। হাওয়ার দেখা নেই। হঠাৎই সামান্য দূরে একটু হাওয়া বইতে একটি খোলা ছাতা নড়ে উঠল। কেউ সেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কুকুরটি হয়ত আদৌ সেদিকে নজর দিত না। কিন্তু যখনই সামান্য হাওয়ায় ছাতাটি নড়ছিল, তখনই কুকুরটি সাংঘাতিক রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠছিল। আমার মনে হয় সে খুব দ্রুত আর অসচেতনভাবে ভেবে নিয়েছিল—যেহেতু ছাতাটি কেন নড়ছে বোঝা যাচ্ছে না, অতএব ওখানে নিশ্চয়ই কোন তার অপরিচিত কিছু একটা রয়েছে, এবং অপরিচিত ব্যক্তিরই তার সীমানায় প্রবেশ করার অধিকার নেই!

অপার্থিব শক্তির উপর বিশ্বাস থেকে সহজেই এক বা একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের জন্ম হতে পারে। কারণ বুনো জাতের লোকেরা তাদের নিজেদের অনুভূত আবেগ, প্রতিশোধস্পৃহা বা বিচারের সহজতম পদ্ধতি ও অনুরাগকে স্বাভাবিক ভাবে আরোপ করত অপার্থিব শক্তির উপর। এব্যাপারে ফুজিয়ানরা একটি মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে। কারণ, 'বিগ্‌ল্' (Beagle) জাহাজের চিকিৎসক, মিঃ বাইনো একবার নমুনা হিসেবে পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটি হংসশাবকে গুলি করে নামিয়েছিল। তা দেখে ইয়র্কমিনস্টার নামে একজন ফুজিয়ান, গম্ভীর স্বরে বলেছিল, "কী করলেন, মিঃ বাইনো? এক্ষুণি তুমুল বৃষ্টি শুরু হবে, সাংঘাতিক বরফ পড়বে, ঝড় উঠবে দুরন্ত।" আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে—মানুষের খাবার যে নষ্ট করবে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তারপর সে একটা ঘটনার কথা বলেছিল: তার ভাই যখন একজন "বন্য প্রকৃতির লোককে" খুন করেছিল তখন ভয়ংকর ঝড় হয়েছিল, সেইসঙ্গে ছিল মুষল ধারে বৃষ্টি ও অবিরাম তুষার পাত। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আমরা ফুজিয়ান সমাজে এমন কোন প্রমাণ খুজে পাই না, যা থেকে বলা যায় তারা আমাদের ঈশ্বরের মতো কোনকিছুতে বিশ্বাস করে। এমনকি তাদের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের রীতিও চোখে পড়ে না। তাই জিমি বাটন নামে একজন ফুজিয়ান গর্বভরে বলতে পেরেছিল—তার দেশে কোন শয়তানের (ভূত—প্রেত) অস্তিত্ব নেই। কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। কেননা, অসভ্য বুনো লোকদের মধ্যে মঙ্গলময় কিছুর তুলনায় অশুভ আত্মার প্রতি বিশ্বাস অনেক বেশী মাত্রায় চোখে পড়ে।

ধর্মীয়-অনুরাগ খুবই জটিল একটি অনুভূতি। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালোবাসা, মর্যাদাপূর্ণ ও রহস্যময় এক মহান সত্বার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, নির্ভরশীলতা, ভয়, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভবিষ্যতের আশা এবং আরো নানা বিষয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিগত ও নৈতিক চেতনা মোটামুটি একটি উন্নত স্তরে উন্নীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এরকম জটিল একটি অনুভূতিতে পেঁছিনো সম্ভব নয়। তথাপি, কুকুরের মধ্যে যেন এই অনুভূতিরই খানিকটা লক্ষণ প্রকাশ পায়, যখন সে তার প্রভুর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করে, আর যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে পূর্ণ আনুগত্য, কিছুটা ভয় ও অন্যান্য আরো অনেক অনুভূতি। কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর আবার যখন কোন কুকুর তার প্রভুর সান্নিধ্যে ফিরে আসে, তখন সে যেমন আচরণ করে বা ঐ একই অবস্থায় একটি বাঁদর যেমন আচরণ করে—তেমন আচরণ কিন্তু তারা নিজেদের স্বজাতির প্রতি করে না। স্বজাতির ক্ষেত্রে তাদের উচ্ছ্বাস কিছুটা কম থাকে এবং তাদের প্রতিটি কাজেই ফুটে ওঠে যে তারা নিজেদেরকে অন্যদের সমান বলেই মনে করে। অধ্যাপক ব্রবাখ্ এমনকি এ-ও বলেছেন যে, একটি কুকুরের কাছে তার প্রভু দেবতার মতো।[১৮]

যে সব উন্নত মানসিক গুণ প্রথমে মানুষকে অদৃশ্য ও অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল এবং তারপর ভক্তিবস্তুবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ এবং অব শেষে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল, সেই গুণগুলিই চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে নানারকম কুসংস্কার ও কু-রীতির জন্ম দিয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি তো রীতিমত ভয়ঙ্কর—রক্তপিপাসু দেবতাকে খুশী করতে নরবলি, বিষপ্রয়োগ করে বা আগুনের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের বিচার করা, ডাইনীবিদ্যা ইত্যাদি। তবু এইসব কু-সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার, কারণ তার ফলে বোঝা যায় চিন্তা-ভাবনা, বিজ্ঞান ও সঞ্চিত জ্ঞানের উন্নতির কাছে মানুষের ঋণ কী অপরিসীম। স্যার জে, লুবক তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে বলেছেন, "যথেষ্ট কমই বলা হবে যদি বলা হয় যে অজানা শয়তানের বিশ্রী ভয় অসভ্য জীবনের উপর ঘন মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকে এবং যে কোন সুখের মুহূর্তকে দুর্বিষহ করে তোলে।" আমাদের উন্নত মানসিক গুণাবলীর এইসব দুঃখজনক ও পরোক্ষ ফলাফলের তুলনা করা যায় নিম্নতর প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির বিভিন্ন আকস্মিক ও কদাচিৎ ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে।

১৮। বলা হয় যে বহুদিন আগেই বেকন ও আঠারো শতাব্দীর কবি বার্নস এ-বিষয়ে একই ধারণা করতেন (দ্রঃ, ডঃ ডব্লিউ, ল্যাণ্ডার লিণ্ডসের লেখা, "জার্ণাল অফ্ মেণ্টাল সায়েন্স", ১৮৭১, পৃঃ ৪৩)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার তুলনা, পূর্বের আলোচনার পরবর্তী অংশ :

নৈতিক বোধ—মৌলিক প্রতিপাদ্য—সামাজিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য—সামাজিকতার উৎস—পরস্পরবিরোধী সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব—মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী—দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিগুলির ওপর আধিপত্য করে—কেবলমাত্র অসভ্য বন্যদের চোখে মূল্যবান সামাজিক গুণসমূহ—আত্মসম্মানবোধ—বিকাশের উন্নততর অবস্থায় অর্জিতগুণ—আচার-আচরণ সম্পর্কে একই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য—নৈতিক প্রবণতার পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা—সারসংকলন।

যে সমস্ত লেখক বলে থাকেন যে মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেকার যাবতীয় তফাতের মধ্যে নৈতিক বোধ বা বিবেকবোধই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। ম্যাকিনটশ্ বলেছেন, এই বোধ "মানুষের অন্য যে-কোন কাজের নীতির উপর ন্যায্যতই আধিপত্য করে।" এই বোধের মর্মার্থটা প্রকাশ করা যায় সেই ছোট্ট অথচ জোরালো শব্দটি দিয়ে—'উচিত' (অর্থাৎ, কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়)। ব্যাপারটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের সমস্ত গুণগুলির মধ্যে এটি মহত্তম, এই গুণের প্রভাবেই মানুষ তার প্রতিবেশীর জীবন বাঁচানোর জন্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে এতটুকুও ইতস্তত করে না; কিম্বা অধিকার বা কর্তব্যের কোন গভীর উপলব্ধির প্রেরণায় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করার পর সে মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে। ইমানুয়েল কাণ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, "কর্তব্য! চমৎকার একটি ভাবনা। সে ভালো-মন্দের বিচার করে না, তোষামোদের ধার ধারে না বা চোখরাঙানিকে ভয় পায় না; কেবল মাত্র হৃদয়ের বাস্তবনীতি দ্বারা চালিত হয়, আর তাই সবসময় বাধ্যতামূলক না হলেও, শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ই। তার সামনে আর সব ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে মাথা নত করতে হয়—তা তারা যতই মনের গোপনে দানা বাঁধুক না কেন। কোথায় এর উৎস?"

মূল্যবান এই বিষয়টি নিয়ে অনেক সুযোগ্য লেখকই আলোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও আমার পক্ষে এটি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি, আর

যতদূর জানি, কেউ-ই এই গুণটিকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশদভাবে আলোচনা করেননি। আমার এই অনুসন্ধানের অন্য একটি দিকও আছে এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের আচার-ব্যবহার মানুষের উন্নততম মানসিক গুণ অর্থাৎ নৈতিকবোধের উপর কতখানি আলোকপাত করতে সক্ষম।

নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যটিকে আমি যথেষ্ট সম্ভবপর বলেই মনে করি। প্রতিপাদ্যটি হল—সুস্পষ্ট সামাজিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট (বাবা-মা ও সন্তানের প্রতি ভালবাসাও এর অন্তর্ভুক্ত) যে-কোন জীবজন্তুই[1] নৈতিকবোধ বা বিবেকবুদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম, আর তার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত উন্নত বা প্রায় মানুষের সমানবিকশিত বুদ্ধিমত্তা। কারণ, প্রথমত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি একটি প্রাণীকে তার প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে শেখায়, তাদের জন্য কিছুটা সহমর্মিতা অনুভব করতে ও নানারকম সাহায্য করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এই কাজগুলি স্পষ্টতই সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তিগত চরিত্রসম্পন্ন হতে পারে, অথবা এগুলি সাহায্যে প্রাণীর ইচ্ছা ও তৎপরতাও প্রকাশ পেতে পারে, যেমন দেখা যায় অধিকাংশ উন্নত শ্রেণীর দলবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে; তারা তাদের প্রতিবেশীদের নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ উপায়ে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু তা'বলে

১। মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী—এই সত্যে উপনীত হবার পর স্যার বি. ব্রডি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, "তাহলে কি নৈতিক বোধের অস্তিত্বের বিতর্কিত প্রশ্নটিকে মিটিয়ে ফেলা উচিত নয়?" (দ্রঃ, "সাইকোলজিক্যাল ইন্‌কোয়্যারিস্" পৃঃ ১৯২)। সম্ভবতঃ আরও অনেকের মনেই এই রকম ধারণার উদয় হয়েছিল, যেমন হয়েছিল বহুপূর্বে মার্কাস অরেলিয়াসের মনে। মিঃ জে. এস. মিল তাঁর প্রসিদ্ধ বই, "ইউটিলিটারিয়্যানিজ্‌ম্," পৃঃ ৪৫-৪৬,—তে সামাজিক অনুভূতিকে একটি "শক্তিশালী প্রাকৃতিক ভাব" ও "উপযোগবাদী নৈতিকতার জন্য আবশ্যক ভাবের প্রাকৃতিক বনিয়াদ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবার বলেছেন, "উপরোক্ত অন্যান্য অর্জিত ক্ষমতাগুলির মত নৈতিকতার বিষয়টিও আমাদের স্বভাবের অঙ্গ না হলেও স্বভাবেরই স্বাভাবিক বিকাশের ফল তো বটেই। অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মতো এটিও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদিত হয়—তবে কিছুটা কম মাত্রায়।" কিন্তু এ সবের বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি আবার বলছেন, "আমার বিশ্বাস অনুযায়ী, নৈতিক বোধ যদি সহজাত না হয়ে অর্জিতও হয়, তাহলেও তার স্বাভাবিকত্ব হারানোর কোন প্রশ্ন ওঠে না।" বেশ কিছুটা ইতস্তত করে আমি মিঃ মিলের মতো সুখ্যাত একজন চিন্তাবিদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছি: কারণ নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সামাজিক অনুভূতিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বা সহজাত, এবং মানুষের বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? মিঃ বেইন (দ্রঃ, "দ্য ইমোশন্‌স্ অ্যাণ্ড দ্য উইল", পৃঃ ৪৮১) ও আরো অনেকে মনে করেন, প্রতিটি প্রাণীই তার জীবদ্দশায় নৈতিকবোধ অর্জন করে থাকে। কিন্তু বিবর্তনবাদের সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে তা একেবারেই অসম্ভব। মানসিক গুণগুলি যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, তা স্বীকার না করাই মিঃ মিলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি বলে মনে হয়।

এইসব অনুভূতি ও কাজ একই প্রজাতিভুক্ত সকলে সকলের জন্যে প্রকাশ করে না। কেবলমাত্র তখনি কোন প্রাণী আগ্রহ দেখায়, যখন অন্য প্রাণীটি তার গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোত্রীয় হয়। দ্বিতীয়ত, জীবের মানসিক গুণগুলি অত্যন্ত উন্নত হয়ে উঠলে, অতীতের যাবতীয় কাজ ও উদ্দেশ্যের ভাবনাগুলি তার মস্তিষ্কের মধ্যে অবিরাম চলাচল করতে শুরু করে। আর অতৃপ্তি বা দুঃখের অনুভূতি কোন-না-কোন অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকেই জন্ম নেয় অতৃপ্তি বা দুঃখের অনুভূতি জাগার ফলে প্রায়শই মনে হতে পারে যে স্থায়ী ও সর্বদা বিদ্যমান সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি বুঝি যেই মুহূর্তে শক্তিশালী অন্য কোন প্রবৃত্তির কাছে পরাভূত হচ্ছে। এগুলি মোটেই বেশীক্ষণ স্থায়ী নয় বা গভীর কোন ছাপ ফেলতেও সক্ষম নয়। স্পষ্টতই অনেক সহজাত প্রবৃত্তি—যেমন খিদে পাওয়া অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী চরিত্রের হয়ে থাকে। পরিতৃপ্তি আসার পর এগুলিকে তৎক্ষণাৎ বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে করা যায় না। তৃতীয়ত কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করার পর যখন সকলের কাছে মতামত জানানোর রাস্তা খুলে গেল, তখন সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের কিভাবে কাজ করা উচিত—সে সম্বন্ধে সকলকার মতটাই হয়ে উঠল কার্যকলাপের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, জনমতের উপর আমরা যতই গুরুত্ব দিই না কেন, প্রতিবেশীদের সম্মতি বা অসম্মতি সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধার উৎস হচ্ছে সহানুভূতি। পরে আমরা এও দেখব যে এই সহানুভূতি আসলে সামাজিক প্রবৃত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বাস্তবিক পক্ষে তার ভিত্তি-মূল। শেষত, প্রতিটি প্রাণীর অভ্যাস সমাজের প্রত্যেকের আচরণকে পথ দেখানোর কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ, সহানুভূতিও সামাজিক প্রবৃত্তি, যে-কোন প্রবৃত্তির মতোই অভ্যাসের দ্বারা দারুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সার্বজনীন ইচ্ছা ও বিচারধারার প্রতি অনুগত হতে শেখে। আমরা এখন এই সব অপ্রধান বিষয়গুলিকে খতিয়ে দেখব। গুরুত্ব অনুযায়ী অবশ্য কোন কোন বিষয় একটু বেশী জায়গা দখল করবে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই নয় যে, কোন সত্যিকারের সমাজবদ্ধ প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো এত কর্মঠ ও উন্নত হয়ে উঠলেই সে মানুষের সমান নৈতিক বোধ অর্জন করত। বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে যেমন সৌন্দর্যবোধ আছে (যদিও বিভিন্ন জন্তু বিভিন্ন জিনিষে আকর্ষণ বোধ করে), ঠিক তেমনি ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তাদের আছে। অবশ্য এই ভালো-মন্দ বিচার করার পদ্ধতিটা বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রকম। এ-বিষয়ে

একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক। ধরা যাক, মানুষ যদি মৌমাছিদের মতো একই অবস্থায় লালিত-পালিত হতো, তাহলে আমাদের অবিবাহিত মেয়েরা, ঠিক শ্রমিক-মৌমাছিদের মতোই, তাদের ভাইদের মেরে ফেলাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করত, বা মায়েরা তাদের ঋতুমতী মেয়েদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করত। কেউ তাতে কোন আপত্তিই করত না।[২] তথাপি, অনুমান-নির্ভর এই উদাহরণটি থেকে আমার মনে হয়, মৌমাছি বা দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী যে-কোন প্রাণীই এই অবস্থায় ন্যায়-অন্যায়বোধ বা বিবেক-বোধ অর্জন করে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই একটি নিজস্ব বোধ কাজ করে। সে যেমন কিছু শক্তিশালী বা অধিকক্ষণস্থায়ী সহজাত প্রবৃত্তি ধারণ করে, ঠিক তেমনি কিছু অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বা স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিকেও ধারণ করে। আর তার ফলে, কোন প্রবৃত্তিটিকে মানা হবে—তা নিয়ে এই দু'য়ের মধ্যে বেঁধে যায় জোর লড়াই। সেই সঙ্গে তৃপ্তি, অতৃপ্তি, এমনকি দুঃখকষ্টের স্মৃতিও জাগরিত হয়, কারণ অতীত ঘটনাগুলি নিরন্তর মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। এরকম সময় প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই জীবের অন্তরাত্মা (inward monitor) তাকে নির্দেশ দেয়—এটা না করে ওটা করলেই তোমার ভালো হবে। ফলে, দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি ঝোঁক তাকে মেনে নিতে হবেই, সরিয়ে রাখতে হবে অন্যটি। অর্থাৎ একটি যদি সঠিক হয়, অপরটি ভুল হতে বাধ্য। কিন্তু এখন আর নয়। পরে সুযোগ মতো এগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

সামাজিক বোধঃ অনেকজাতের জীবজন্তু-ই একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদেরও একসঙ্গে থাকার উদাহরণ আছে; যেমন,

---

২। মিঃ এইচ. সিজউইক এই বিষয়টির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান কোন মৌমাছির কাছ থেকে বহুল প্রচলিত সমস্যাটির ধীর-স্থির সমাধান আশা করা যেতেই পারে।" অধিকাংশ বন্য মানুষদের অভ্যাসকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, মানুষ এই সমস্যাটির সমাধান করেছে স্ত্রী-শিশুহত্যা, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা এবং অবাধ যৌনসম্পর্কের সাহায্যে। কাজেই, একে আদৌ কোন ধীর-স্থির পদ্ধতি বলব কিনা, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মিস্ কোবে এ-ব্যাপারে তাঁর মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, সামাজিক কর্তব্যের 'নীতিগুলি' এভাবে উল্টে যেতে পারে। বোধহয় তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কোন একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করা হলে তা অন্যদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে পারে না। কিন্তু তিনি একটি বিষয় খেয়াল করেন নি (যা তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন) ; বিষয়টি হচ্ছে—মৌমাছিদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি তাদের সমাজের মঙ্গলের জন্যই অর্জিত হয়ে থাকে। এমনকি তিনি এ-ও বলেছেন যে, এই পরিচ্ছেদে আলোচিত নীতিজ্ঞানের তত্ত্বটিকে সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া হলে "আমি মনে করি তাদের বিজয় উৎসবের মধ্যেই বেজে উঠবে মানবীয় গুণাবলীর মৃত্যু-ঘণ্টা।" অবশ্য আশার কথা, পৃথিবীতে মানবীয় গুণাবলীর স্থায়ীত্বকে এত দুর্বল, ক্ষণস্থায়ী বলে অনেকেই মনে করেন না।

কয়েক প্রকার আমেরিকান বাঁদর মিলেমিশে থাকে, আবার কিছু দাঁড়কাক, পাতিকাক ও স্টারলিং পাখিও একত্রে থাকতে পছন্দ করে। মানুষ ও কুকুর একে অপরকে দারুণ ভক্ত। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া প্রভৃতি প্রাণীরা যখন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন কী বিষন্নই না দেখায় তাদের। আবার পুর্নমিলিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড পারস্পরিক ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় এদের মধ্যে, বিশেষত ঘোড়া এবং কুকুরদের মধ্যে। যে-কোন কুকুরের কথা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার প্রভুর ঘরে বা ঐ পরিবারের কোন একজনের কাছে চুপচাপ বসে থাকে; কেউ তার দিকে নজর না দিলেও সে উচ্চবাচ্য করে না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে হলে রাগে দুঃখে সে ঘেউ ঘেউ কুঁই-কুঁই জুড়ে দেয়। আমরা শুধু উচ্চশ্রেণীর সামাজিক প্রাণীদের নিয়েই আলোচনা করব, পোকামাকড়ের কথা বাদ দিয়ে যাবো। তবু বলে রাখা ভাল যে পোকামাকড়দের মধ্যে কেউ কেউ মিলে-মিশে থাকতে ভালবাসে এবং নানাভাবে একে অপরকে সাহায্য করে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের পারস্পরিক সহায়তার সবথেকে চালু দৃষ্টান্ত হলো একে অপরকে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া। নিঃসন্দেহে সকলের সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যেই এই সাবধানবানী দেওয়া হয়। ডঃ জ্যারগার-এর মতে, শিকারী মাত্রই জানে পশুপাখিরা যখন একসঙ্গে বা দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন তাদের কাছে যাওয়া কত শক্ত। বুনো ঘোড়া বা গবাদি পশুরা বিপদকালীন বার্তা জানাতে পারে না বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এদের মধ্যে প্রথম যে শত্রুকে দেখতে পায়, তার হাবভাবই অন্যদের সতর্ক হয়ে যেতে সাহায্য করে। বিপদের গন্ধ পেলে খরগোশরা তাদের পিছনের পা জোরে জোরে মাটিতে আঁচড়াতে থাকে। ভেড়া ও কৃষ্ণসার হরিণ একইভাবে তাদের সামনের পা মাটিতে আঁচড়ায়, সেইসঙ্গে শিষ দেওয়ার মতো জোরে একটা শব্দ করা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার অনেক পাখি ও কিছু স্তন্যপায়ী জীব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করে। সীল মাছের ক্ষেত্রে সাধারণত এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় মেয়েরাই। বাঁদরদের দলপতিই প্রহরী হিসাবে কাজ করে থাকে। বিপদ এলে এবং তা দূর হয়ে গেলে সে চিৎকার করে সকলকে জানান দেয়।[৩] তাছাড়া, দলবদ্ধ প্রাণীরা

৩। দ্রঃ, ব্রেহ্‌ম্‌, "দেয়ার লেবেন", খণ্ড ১ পৃঃ ৫২, ৭৯, বাঁদরদের একে অপরের দেহ থেকে কাঁটা বের করে দেওয়া, (দ্রঃ পৃষ্ঠা নং—৫৪) বা হামাড্রিয়াস বাঁদর কর্তৃক পাথর উল্টে দেওয়ার ঘটনাটি (দ্রঃ পৃঃ নং—৭৬) আল্‌ভারেজের থেকে নেওয়া হয়েছে, যাঁর বক্তব্যকে ব্রেহ্‌ম্‌ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেন। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-বেবুন কর্তৃক কুকুরদের আক্রমণ করার ঘটনাটির জন্য দ্রঃ পৃঃ ৭৯; এবং ঈগল পাখির ঘটনা সম্পর্কে দ্রঃ, পৃঃ ৫৬।

নানারকম ছোটখাটো কাজের দ্বারা একে অপরকে সাহায্য করে। শরীরের কোন অংশ চুলকোলে ঘোড়া বা গরুরা পরস্পরকে জিভ দিয়ে চেটে দেয়। বাঁদররা তো একে অপরের শরীর থেকে উকুন বেছে দেবার কাজে সিদ্ধহস্ত। ব্রেহ্ম্ জানিয়েছেন, সার্কোপিথেকাস গ্রিসিও-ভাইরিডিস্ (Cercopithecus griseo-viridis) নামে এক জাতের বাঁদর কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে দৌড়ানোর পর গাছের ডালের উপর সটান শুয়ে পড়ে, এবং অন্য একটি বাঁদর "বিবেক-বুদ্ধি-মতে" তার দেহত্বক পরীক্ষা করতে করতে একে একে সবকটি কাঁটা বা কণ্টকময় বীজকোষ বার করে দেয়।

অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজেও জীবজন্তুরা একে অপরকে সাহায্য করে থাকে। নেকড়ে ও কিছু শিকারী জন্তু দলবদ্ধভাবে শিকার করে এবং শিকারকে আক্রমণ করার সময় একে অপরকে সাহায্য করে। পেলিক্যান পাখিদের মাছ ধরবার চেষ্টাও একটি যৌথ প্রয়াস। হামাড্রিয়াস নামক একপ্রকার বেবুন পোকা-মাকড় ইত্যাদি ধরার জন্য পাথর উলটে উলটে দেখে। সংখ্যায় ভারী হবার পর তারা পাথরটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ায়, সবাই মিলে পাথরটাকে উলটে ফেলে, এবং অবশেষে লুঠের সামগ্রী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। দলবদ্ধ প্রাণীরা একে অপরের জীবনরক্ষার জন্যও তৈরী থাকে। উত্তর আমেরিকার বাইসন-ষাঁড় (Bull Bisons) বিপদের আঁচ পেলেই মেয়েদের আর বাচ্চাদের দলের মাঝখানে রেখে নিজেরা বাইরের দিকটা পাহারা দেয়। চিলিংহামে একবার দুটো জোয়ান বুনো ষাঁড় একসঙ্গে অন্য একটি বুড়ো ষাঁড়কে আক্রমন করেছিল। আবার দুটো ঘোড়া তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি ঘোড়াকে মাদী-ঘোড়াদের দল থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে—এ-ঘটনাও সমান সত্যি। আবিসিনিয়াতে ব্রেহ্ম্ সংখ্যায় যথেষ্ট ভারী একদল বেবুন দেখেছিলেন। তারা একটি উপত্যকা পার হচ্ছিল। অবস্থাটা ছিল এরকম যে, এদের একটি অংশ বিপরীত দিকের পাহাড়ে উঠে গেছে, আর একটি অংশ তখনও উঠতে পারেনি, উপত্যকাতেই রয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় একদল কুকুর নীচের দিকের এই বেবুনদের আক্রমণ করল। তাতে কী! উপর থেকে শক্ত সমর্থ পুরুষেরা তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তারপর হাঁ করে এমন ভয়ংকরভাবে চেঁচাতে শুরু করল যে অচিরেই কুকুরগুলো দৌড়ে পালালো। একটু পরে তারা আবার নতুন উদ্যমে আক্রমন শানাতে ফিরে এল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি বাচ্চা-বেবুন ছাড়া আর সকলে উপরে পৌঁছে গেছে। বাচ্চাটি ছিল মাত্র মাস ছয়েকের। সে একটি পাথরের উপর শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে সাহায্যের জন্যে অনবরত চিৎকার

করছিল। কোন কিছু উপায় না দেখে তখন একটা ষণ্ডা-মার্কা পুরুষ-বেবুন, এক সত্যিকারের বীর, পাহাড় থেকে আবার নীচে নেমে এসে ধীরে ধীরে বাচ্চাটির কাছে গেল, তাকে অভয় দিল এবং অবশেষে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে গেল। এই ঘটনায় কুকুরগুলো এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে তারা আক্রমণ করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। এখানে আরো একটা ঘটনার কথা না বলে পারছি না। এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শী স্বয়ং ব্রেহ্‌ম্‌। একটা ঈগল সার্কোপিথেকাস জাতের একটা বাচ্চা বাঁদরকে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু বাচ্চাটা গাছের ডাল এত শক্ত করে ধরে রেখেছিল যে ঈগলটার পক্ষে তৎক্ষণাৎ শিকার নিয়ে পালানো সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে বাচ্চাটা সাহায্যের জন্য চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। তাই শুনে দলের অন্যান্যরা বিকট চিৎকার করতে করতে তাকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এল। ঈগলটিকে ঘিরে ফেলল তারা। তারপর শুরু হলো পালক ওপড়ানোর পালা। ঈগলটির তখন আর শিকারের দিকে মন ছিল না, সে তখন শুধু ভাবছিল কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রেহ্‌মের অভিমত হল, ঈগলটি ভবিষ্যতে আর কখনো কোন বাঁদর-দলের একটা বাঁদরকে একলা পেলেও আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।[৪]

নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে ওঠে। পূর্ণবয়স্ক অ-সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যে কিন্তু এই ব্যাপারটা দেখা যায় না। অবশ্য একটি প্রাণী আর একটি প্রাণীর সুখে বা দুঃখে সত্যিসত্যি কতখানি সহমর্মিতা বোধ করে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে—বিশেষত যখন কোন প্রাণী আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। তবে, সুখ্যাত পর্যবেক্ষক মিঃ বাক্সটন বলেছেন, তাঁর কাকাতুয়াগুলি (যারা আগে নরফোকে প্রকৃতির মধ্যে খোলামেলা অবস্থায় থাকত) প্রতিটি জোড়ের (একটি ছেলে ও একটি মেয়ে-কাকাতুয়ার) বাসা-বাঁধার কাজে "দারুণ আগ্রহ" প্রকাশ করত। মেয়ে-কাকাতুয়াটির যখন উড়ে চলে যাওয়ার সময় হতো, তখন তারা তাকে ঘিরে "তার সৌজন্যার্থে তারস্বরে জয়ধ্বনি করত"। আবার বেশীর ভাগ প্রাণী

৪। মিঃ বেল্ট নিকারাগুয়ার একটি এ্যাটেল্‌স্‌ জাতের বাঁদরের (চলাফেরায় অনেকটা মাকড়সার মতো) কথা বলেছেন। বাঁদরটিকে তিনি বনের মধ্যে প্রায় দু'ঘণ্টা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাতে শুনেছিলেন। কারণ, তার খুব কাছে একটি ঈগলপাখি বসেছিল। কার্যতঃ পাখিটা তাকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। মিঃ বেল্ট বাঁদরদের আচরণ সম্পর্কে মনে করেন যে, দরকার হলে তারা দু'তিনজন দল বেঁধেও ঈগলদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে (দ্রঃ, "দ্য ন্যাচারালিস্ট ইন্‌ নিকারাগুয়া", পৃঃ ১১৮)।

অদের স্ব-জাতির দুঃখ-কষ্টে সাড়া দেয় কিনা, তা বিচার করা বেশ শক্ত। গরুরা যখন তাদের মৃতপ্রায় বা মৃত সঙ্গীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তখন কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় তারা কী অনুভব করছে! হাউজো তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে আপাতভাবে তারা (গরুরা) কোন বেদনা অনুভব করে না। কখনো-কখনো জীবজন্তুদের মধ্যে সহমর্মিতার কোন ছাপই থাকে না। দেখা গেছে, কোন একটি জন্তু অসুস্থ বা জখম হলে পুরো দলটি তাকে ফেলে রেখে চলে যায়, কিম্বা তাকে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে বা কামড়িয়ে আরো দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। জীবজগতের ইতিহাসে এটাই বোধহয় সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। অবশ্য এর পিছনে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অন্য কথা। ব্যাখ্যাটা হলো, জীবজন্তুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে বা যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করবার পরই তাদের আহত সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে, যাতে অন্য কোন শিকারী-জন্তু বা মানুষ তাদের অনুসরণ করতে না পারে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরাও অনেকটা এ-রকম আচরণই করে থাকে। তারা তাদের দুর্বল সাথীদের সমতলে ফেলে আসে। ফলে তারা দ্রুত মারা যায়। ফিজিয়ানরা তো মা-বাবা বৃদ্ধ বা অসুস্থ হলে তাদের জ্যান্ত কবর দিয়ে স্বস্তি পায়!

কোন একটি প্রাণী অসুবিধায় পড়েছে বা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আর তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে অন্য একটি প্রাণী—জীবজগতে এরকম উদাহরণ নেহাৎ কম নয়। এমনকি পাখিদের মধ্যেও এরকম ঘটনা দেখা যায়। ক্যাপ্টেন স্ট্যানসবারি উটা-র একটি লবণ-হ্রদে বুড়ো ও সম্পূর্ণ অন্ধ কিন্তু বেশ নাদুসনুদুস একটা পেলিক্যান পাখি (এক ধরণের জলচর পাখি) দেখেছিলেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, পাখিটাকে নিশ্চয়ই তার সঙ্গী-সাথীরা দীর্ঘদিন ধরে আহার যুগিয়ে চলেছিল।[৫] মিঃ ব্লাইথ আমাকে জানিয়েছেন, কিছু ভারতীয় কাক তাদের দু'তিনটি অন্ধ সাথীকে খাইয়ে দিচ্ছে—এ ঘটনা তিনি দেখেছেন। গৃহপালিত মুরগীদের মধ্যে অনুরূপ একটি ঘটনার কথাও সম্প্রতি আমার কানে এসেছে। ইচ্ছে করলে এই কাজগুলিকে আমরা সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত বলে ধরে নিতে পারি। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, কোন বিশেষ সহজাত

৫। ক্যাপ্টেন ষ্ট্যান্‌স্‌বারিও একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা বলেছেন। নেহাৎ বাচ্চা একটি পেলিক্যান শাবক খরস্রোতা একটি নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। সেই সময় গোটা ছয়েক বৃদ্ধ পেলিক্যান তাকে তীরে ফিরে আসার জন্য নানারকম নির্দেশ ও উৎসাহ দিচ্ছিল।

প্রবৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা প্রায় বিরল।[৬] আর একটা ছোট ঘটনার কথা বলি। এবার প্রত্যক্ষদর্শী অন্য কেউ নয়, আমি নিজেই। একটা কুকুর আর একটা বিড়ালের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। একবার বিড়ালটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে একটা ঝুড়ির মধ্যে সবসময় শুয়ে থাকত। যখনি কুকুরটি বিড়ালটির পাশ দিয়ে যেত, তখনই দু'একবার তার শরীরে জিভ বুলিয়ে দিত। আমি নিশ্চিত যে তার মধ্যে একটা দয়ালু মনোভাব কাজ করছিল।

প্রভুকে কেউ আক্রমণ করছে দেখলে যে-কোন সাহসী কুকুর আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর উৎস কিন্তু সহমর্মিতাই। একটু উদাহরণ টেনে বলা যাক। একবার একব্যক্তি একজন মহিলাকে মারবার ভান করছিল। মহিলার কোলে ছিল ভারী শান্ত-শিষ্ট একটা ছোট কুকুর। আগে কখনো কুকুরটার এরকম অভিজ্ঞতা হয় নি। ফলে অচিরেই সে মহিলাকে বিপন্ন দেখে সাহায্যের জন্য লাফিয়ে উঠল। কিন্তু অভিনয় তো আর বেশীক্ষণ চলতে পারে না! একটু বাদেই তা শেষ হলো। আর শেষ হতেই কুকুরটা পরম আন্তরিকতায় সেই মহিলার মুখে জিভ বুলিয়ে বুলিয়ে সান্তনা দিতে লাগল। তার আচরণের মধ্যেই ফুটে উঠছিল কতটা কষ্ট পেয়েছে সে। ব্রেহ্‌ম্ জানিয়েছেন, বেবুনদের খাঁচায় তিনি যখন একটি বেবুনকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে ধরতে গেছিলেন, তখন অন্যরা তাড়াতাড়ি তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। এই ব্যাপারটিকেই আমরা সহানুভূতি বা সহমর্মিতা বলব। একটু আগেই আমরা দেখেছি বেবুন বা সার্কোপিথেকাস্ বাঁদররা কেমন করে তাদের বাচ্চাদের কুকুর বা ঈগলের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ-ও সেই সমর্মিতারই প্রকাশ। আমি এখানে সহানুভূতি ও বীরত্বপূর্ণ আচরণের আর একটিমাত্র উদাহরণ পেশ করব। এ-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু একটি খুদে আমেরিকান বাঁদর। বেশ কয়েকবছর আগে চিড়িয়াখানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁর গলার পিছনদিকে সামান্য শুকিয়ে আসা একটা গভীর ক্ষত দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন—এর জন্য দায়ী একটা গুণ্ডা বেবুন। ঐ খুদে বাঁদরটির সঙ্গে কর্মচারীটির দিব্যি একটা বন্ধুত্ব ছিল। বাঁদরটি আর বেবুনটি একই খাঁচায় থাকত—বেশ বড় মাপের খাঁচা। বিপুলাকার বেবুনটিকে খুবই ভয় পেতে বাঁদরটি। একদিন বেবুনটি আক্রমণ করে ঐ কর্মচারীটিকে। তখন, বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত দেখে, নিজের ভয়-ভীতি ভুলে, ছুটে আসে সে। শুরু করে চিৎকার, আঁচড়ে-কামড়ে বেবুনটিকে নাজেহাল

৬। মিঃ বেইন বলেছেন, "দুর্দশাগ্রস্তকে কার্যকরী সহায়তা যোগানোর উৎস হল যথার্থ সহমর্মিতা।" (দ্রঃ, "মেণ্টাল অ্যাণ্ড মর্যাল সায়েন্স", পৃঃ ২৪৫)।

করে তোলে। ফলে, পালাতে সমর্থ হয় কর্মচারীটি। পরে চিকিৎসকই তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন।

ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছাড়াও জীবজন্তুরা সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরো কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষের মধ্যে এইসব গুণকেই আমরা নৈতিক বোধ বলে থাকি। অ্যাগাসিজের সঙ্গে আমি একমত যে কুকুরদের মধ্যে বিবেকবোধ ধরণের একটা কিছু আছেই।

কুকুরদের মধ্যে খানিকটা আত্মদমন বা সহিষ্ণুতার গুণ দেখা যায়। এর সমস্তটাই যে ভয়জনিত কারণে, তা ভাবলে ভুল হবে। ব্রাখ্ বলেছেন, কুকুররা কখনো তাদের প্রভুর অনুপস্থিতিতে খাবার চুরি করে না। দীর্ঘকাল ধরেই কুকুরদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রতীক বলে মনে করা হয়। হাতিরাও তাদের মাহুত বা রক্ষকের দারুণ বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। সম্ভবত মাহুতকে তারা দল-নেতা বলেও মনে করে। ডঃ হুকার তাঁর ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে একবার হাতির পিঠে চড়ার সময় তাঁর হাতির পা এমন বিশ্রীভাবে একটি জলা-ভূমিতে পুঁতে গিয়েছিল যে পরের দিন লোকজন এসে দড়ি দিয়ে টেনে না তোলা পর্যন্ত হাতিটাকে ঐ অবস্থাতেই থাকতে হয়েছিল। সাধারণত এরকম অবস্থায় হাতিরা মৃত বা জীবিত যে-কোন বস্তুকেই শুঁড় দিয়ে টেনে হাঁটুর তলায় ফেলে দেয়, যাতে সে মাটির গভীরে আরো গেঁথে না যায়। ফলে মাহুতটি ভীত হয়ে পড়েছিল এই ভেবে যে হাতিটা হয়তো ডঃ হুকারকে তুলে নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাহুত বা হুকার, কারোরই কোন বিপদ ঘটেনি। হাতির মতো এত ভারী একটা প্রাণীর পক্ষে বিপদে পড়েও এরকম সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। নিঃসন্দেহে এটি মহান আনুগত্যেরই একটি চমৎকার নিদর্শন।

দলবদ্ধ প্রাণীরা যেহেতু যৌথভাবে আত্মরক্ষা বা শত্রুকে আক্রমণ করে, সেহেতু তারা নিশ্চয়ই একে অপরের প্রতি কিছুটা বিশ্বস্তও থাকে। আবার তারা যদি কোন একজন দল-নেতাকে মেনে চলে, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রতি তাদের কিছু আনুগত্যও থাকে। আবিসিনিয়াতে বেবুনরা দল বেঁধে শস্যক্ষেত লুঠ করতে যাওয়ার সময় তাদের নেতাকেই নিঃশব্দে অনুসরণ করে। কোন নির্বোধ বাচ্চা গোলমাল করলে অন্যদের চড়-চাঁটি তার কপালে লেখা থাকে। কড়া নির্দেশ—চুপ করো, দলনেতার অনুগত থাকো। মিঃ গ্যাল্টন সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকাতে একদল আধা-বুনো গবাদি পশুর দেখা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এই পশুরা মুহূর্তের জন্যেও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। এদের চরিত্রটাই দাসসুলভ। নেতা

হওয়ার মতো যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন কোন ষাঁড়ের নেতৃত্ব এরা মেনে নেয় নির্বিবাদে, তার চেয়ে ভালো কিছু খুঁজতে যায় না। এই সব পশুদের গলায় মানুষের প্রভুত্ব-জিন পরানোর সময় দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা ঘাস খেতে দল ছেড়ে দূরে যায়, তারা এমন আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবসম্পন্ন যে তাদের ধরা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। নিঃসন্দেহে তাদের এই মনোভাব এগিয়ে-থাকা ষাঁড়ের লক্ষণ। মিঃ গ্যাল্টনের মতে এরকম পশু খুবই দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান। আবার সংখ্যাধিক্য ঘটলে দ্রুতই এরা তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, যেমন দেখা যায় সিংহদের মধ্যে। দলছুট সিংহকে শাস্তি দেবার জন্যে তারা হন্যে হয়ে ফেরে।

কিছু সংখ্যক পশুপাখি এই যে একসঙ্গে থাকে বা একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করে, তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন তাড়না আছে। কী সেই তাড়না? সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাড়না হিসেবে কাজ করে তাদের পরিতৃপ্তি বা আনন্দ বোধ, যা তারা অর্জন করে সহজাত প্রবৃত্তির বশে বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে। আবার এমনও হতে পারে যে এটা আসলে তাদের অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করার অতৃপ্তিজনিত তাড়না। অসংখ্য ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়, আর তার চমৎকার ব্যাখ্যাও মেলে আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের দ্বারা অর্জিত সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে। মেষপালকের কুকুর কখনোই ভেড়ার পালকে বিরক্ত করে না, বরং তাদের চারপাশে মনের আনন্দে ছোটাছুটি করে, পালটাকে ঠিকঠাক চালনা করে। শিয়াল-শিকারী কুকুররা (ফক্স-হাউন্ড) শিয়াল শিকার করে খুশী হয়, আবার অন্য অনেক কুকুর শিয়ালদের মোটেই পছন্দ করে না—এ আমার নিজের চোখে দেখা। ভাবলে অবাক লাগে, মনের মধ্যে পরিতৃপ্তির কী গভীর উপলব্ধিই না একটি কর্মব্যস্ত পাখিকে তার ডিমের উপর দিনের-পর-দিন তা দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ঘুরে বেড়াতে না পারলে যাযাবর পাখিরা অবস্থা খুব করুণ হয়ে ওঠে। দু'ডানায় ভর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার মধ্যেই হয়তো তারা খুঁজে পায় অপার আনন্দ। কিন্তু অদুবনে বর্ণিত সেই হতভাগ্য ডানা-কাটা রাজহাঁসটি পায়ে হেঁটে প্রায় হাজার মাইলব্যাপী যাত্রার সময় কোনরকম আনন্দ অনুভব করেছিল বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, কিছু সহজাত প্রবৃত্তির গভীর আধার হলো দুঃখের অনুভূতি বা ভয়, যার ফলে গড়ে ওঠে আত্ম-রক্ষার কৌশল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই কৌশল বিশেষ কিছু শত্রুর দিকে পরিচালিত হয়। আমার মতে, আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে, অনেক

সময় এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আনন্দ বা দুঃখের উত্তেজনা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রেও অবিরাম অনুসৃত হতে পারে। কোন বাচ্চা শিকারী-কুকুর প্রথমবার শিকার খুঁজতে বেরিয়ে শিকারের গন্ধ পেলে চিৎকার করবেই। আবার, খাঁচার মধ্যে মধ্যে কোন কাঠবিড়ালী বাদাম ভেঙে খেতে পারে না বলেই মাটিতে কবর দেওয়ার মতো করে বাদামটাতে মৃদু মৃদু আঘাত করে। কিন্তু তা'বলে সে (কাঠবিড়ালী) কোন আনন্দ বা দুঃখ থেকে এ-কাজ করে না। আর তাই এই ধারণাটাও বোধহয় ভুল যে মানুষের প্রতিটি কাজের পিছনে রয়েছে কোন-না-কোন আনন্দ বা দুঃখের অভিজ্ঞতা। আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতি ছাড়াও কোন অভ্যাসকে মানুষ অন্ধভাবে ও সন্দেহহীনভাবে অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু এরকম অভ্যাসকে জোর করে বা হঠাৎ থামিয়ে দিলে সাধারণতঃ এক-ধরণের অতৃপ্তিবোধ সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ সময় আমরা ধরে নিই যে জীবজন্তুরা প্রাথমিক অবস্থায় দলবদ্ধ ভাবেই বসবাস করত এবং পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে অস্বস্তি বোধ আর একসঙ্গে থাকতে পারলে স্বস্তিবোধ করত। কিন্তু এর চেয়েও সম্ভাব্য মত হলো—যৌথভাবে বসবাস করার অনুভূতি প্রাণীদের মনে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এই কারণে যে, দলবদ্ধভাবে বাস করলে যে-সব প্রাণী লাভবান হবে, তারা যেন দলবদ্ধ ভাবেই থাকতে পারে, ঠিক যেমন খিদে-বোধ ও খাওয়ার আনন্দ থেকেই প্রাণীরা খেতে শিখেছিল। দলবদ্ধ ভাবে থাকার আনন্দটা হয়তো বাবা-মা বা সন্তানের প্রতি ভালোবাসারই একটা বর্ধিত রূপ, কারণ দীর্ঘদিন বাবা-মা-র সঙ্গে একত্রে থাকার পর সন্তানের মধ্যে সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি বিকশিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ভালোবাসার এই বর্ধিত রূপের পিছনে অভ্যাসের নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু এর মূল কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। কেননা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বসবাসকারী প্রাণীরা একসঙ্গে থাকার আনন্দেই শুধু মত্ত ছিল না, তারা সহজেই নানা বিপদকেও এড়িয়ে যেতে পারত, আর অন্যদিকে বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ প্রাণীরা বিশাল সংখ্যায় প্রাণ হারাত। আবার বাবা-মা ও সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসার কথা বলা হলো, যা স্পষ্টতই বিভিন্ন সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি, তার উৎস-ই বা কী? এখানেও আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু এটুকু আমরা ধারণা করতে পারি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন একে অনেকটাই সহায়তা করেছে। আবার নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে ঘৃণার অস্বাভাবিক ও বিরুদ্ধ অনুভূতিও অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল, যেমন শ্রমিক মৌমাছিরা তাদের নিষ্কর্মা ভাইদের মেরে ফেলে বা রাণী-মৌমাছি

মেরে ফেলে তার মেয়েদের। এক্ষেত্রে নিকট আত্মীয়দের ধ্বংস করার এই প্রবৃত্তিটা তাদের সমাজের কল্যাণই করে থাকে। তারা-মাছ, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে সন্তান-প্রীতি বা তার সমতুল অন্যান্য অনুভূতি খুবই কম। কখনো কখনো কোন প্রজাতির শুধুমাত্র গুটিকতক প্রাণীর মধ্যে প্রীতি-সম্পর্কীয় এই সব অনুভূতির দেখা পাওয়া যায়। ফরফিকুলা বা কেন্নোজাতীয় কিছু নিকৃষ্ট প্রাণী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সহানুভূতির জন্য যে আবেগ জরুরী, তা কিন্তু ভালোবাসার থেকে আলাদা। যেমন, ঘুমন্ত শিশুর দিকে চেয়ে মায়ের মনে ভালোবাসার এক গভীর আবেগ জেগে উঠতেই পারে, কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে মা তাঁর শিশুর জন্যে সহানুভূতি বোধ করছেন। আবার কুকুরের জন্যে তার প্রভুর ভালোবাসা বা প্রভুর জন্যে কুকুরের ভালোবাসার মধ্যেও সহানুভূতির কোন প্রশ্ন ওঠে না। মিঃ বেইন সম্প্রতি যা বলেছেন, অ্যাডাম স্মিথ তা অনেক আগেই বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—ফেলে-আসা সুখ-দুঃখকে মনের গভীরে লালন করার যে বিপুল ক্ষমতা রয়েছে আমাদের, তা-ই হচ্ছে সহানুভূতির উৎসস্থল। সেইজন্যে "অন্য কোন ব্যক্তিকে খিদে, ঠাণ্ডা বা ক্লান্তিতে কষ্ট পেতে দেখলে আমাদের মনে নিজেদের ঐরকম অবস্থার স্মৃতিগুলো জেগে ওঠে, আর এইসব স্মৃতির চিন্তাটুকু পরম যন্ত্রণাময়।" তখনই আমরা অপরের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে উদ্যোগী হই, যাতে করে একইসঙ্গে আমাদের নিজেদের দুঃখের অনুভূতিগুলোও প্রশমিত হতে পারে। একই কারণে আমরা অপরের আনন্দ বা আহ্লাদে সাড়া দিয়ে থাকি।[৭] কিন্তু, ভালোবাসার পাত্রের জন্যে যে রকম তীব্রমাত্রার সহানুভূতি প্রকাশ পায়, তা কেন অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পায় না—তার কারণকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, তা আমার জানা নেই। আবার অনেকসময় দেখা যায়, কারুর প্রতি ভালবাসা না থাকলেও, তার দুঃখ আমাদের মনের মধ্যে

৭। অ্যাডাম স্মিথ-এর "থিয়োরী অফ্ মর্যাল সেন্টিমেন্টস্" গ্রন্থের প্রথম ও চাঞ্চল্যকর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এছাড়াও দেখুন মিঃ বেইন্স্-এর লেখা "মেন্টাল অ্যাণ্ড মর্যাল সায়েন্স", ১৮৬৮, পৃঃ ২৪৪, এবং ২৭৫-২৮২, মিঃ বেইন বলেছেন, "সহানুভূতিশীল ব্যক্তির কাছে সহানুভূতি আনন্দ লাভ করার একটি পরোক্ষ উপায়", পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। পরে তিনি মন্তব্য করেছেন, "উপকৃত ব্যক্তি বা অন্যেরা সহানুভূতি এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক কাজের সাহায্যে নিজেদের প্রাপ্যের প্রতিদান দিতে পারে।" কিন্তু সহানুভূতি যদি একটি সহজাত প্রবৃত্তি হয় (আপাতভাবে তা-ই দেখা যাচ্ছে), তাহলে সহানুভূতি প্রকাশের সাহায্যে পূর্বোল্লিখিত প্রায় সকল সহজাত প্রবৃত্তির মতোই আমাদের মনে সরাসরি আনন্দের অনুভূতি জাগাই স্বাভাবিক।

জাগিয়ে তোলে নিজেদের ফেলে-আসা দুঃখের স্মৃতিকে, অনুপুঙ্খ সমেত। এর কারণ হয়তো এই যে, সমস্ত প্রাণীরা শুধুমাত্র নিজ গোষ্ঠীর প্রাণীদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকে, অর্থাৎ পরিচিত বা কম-বেশী ভালোবাসার পাত্রদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করে তারা, কিন্তু তাই বলে একই প্রজাতিভুক্ত সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখায় না। যেমন, বহু প্রাণী কিছু বিশেষ শত্রুকেই শুধু ভয় পায়। দলবদ্ধ ভাবে থাকে না এমন প্রজাতির প্রাণীরা, যেমন বাঘ বা সিংহ, তারাও কিন্তু তাদের নিজেদের বাচ্চাদের দুঃখ-কষ্টে গভীর সহানুভূতি বোধ করে, কিন্তু অন্য কোন বাচ্চার বেলায় তার লেশমাত্র চিহ্নও থাকে না। মিঃ বেইন্-এর কথা উল্লেখ করে বলা যায়, সম্ভবত মানুষের সহানুভূতি শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে তার স্বার্থপরতা, অভিজ্ঞতা ও অণুকরণপ্রিয়তা। কারণ প্রতিদান পাওয়ার আশা নিয়েই আমরা, অপরকে সহানুভূতি দেখাই। আর অভ্যাসের ফলে সহানুভূতি অনেক দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। এই অনুভূতির উৎস যত জটিলই হোক না কেন, যে-সব প্রাণীরা পরস্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করে, তাদের ক্ষেত্রে এই অনুভূতি বেড়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ। কেননা, যে সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে গভীর সহানুভূতিশীল প্রাণীর সংখ্যা সবথেকে বেশী, তাদের উন্নতিও হয় বেশী এবং তারা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নবজাতককে লালন-পালন করতেও সক্ষম।

তবে, অনেক ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যে কিছু সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে অর্জিত, নাকি সহানুভূতি, চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা, অনুকরণপ্রবণতা প্রভৃতি অন্য কিছু সহজাত প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির পরোক্ষ ফল; নাকি এগুলো শুধুমাত্র দীর্ঘ অভ্যাসের ফলস্বরূপই এসেছে। যেমন জীবজন্তুদের একটি উল্লেখযোগ্য সহজাত প্রবৃত্তি হলো দলকে বিপদ থেকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে নিজেদের মধ্যেকার একজনকে প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করা। আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র মনোবৃত্তির পরোক্ষ ফল বলে মেনে নিতে পারি না, কেননা স্পষ্টতই এটা প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত। অন্যদিকে, কিছু কিছু দলবদ্ধ প্রাণীর পুরুষরা অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে তাদের সম্প্রদায় বা দলকে রক্ষা করে কিম্বা যৌথভাবে শত্রু বা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা সম্ভবত পারস্পরিক সহানুভূতিরই প্রকাশ। কিন্তু সাহসিকতা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তি সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে আগে থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তিও অভ্যাসের মধ্যে কতকগুলি অন্যদের তুলনায় বেশী শক্তিশালী, অর্থাৎ, এগুলির চর্চায় পাওয়া যায় বেশী আনন্দ এবং এগুলিকে চেপে রাখলে কষ্টের পরিমাণও বাড়ে। অথবা, আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এগুলি বংশানুক্রমে অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে, এবং তার জন্য সুখ-দুঃখের বিশেষ কোন অনুভূতিও সৃষ্টি হয় না। আমরা নিজেদের

বেলাতেও জানি এমন কতকগুলি অভ্যাস আমাদের থাকে, যেগুলিকে অন্য অনেক অভ্যাসের মতো সহজে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায় না। তাই প্রায়ই প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বা কোন সহজাত প্রবৃত্তি ও কিছু অভ্যাসগত আচরণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়। যেমন, একটি কুকুর কোন খরগোশকে তাড়া করার সময় যদি তিরস্কৃত হয়, তাহলে সে মুহূর্তের জন্যে থামে, একটু ইতস্তত করে, তারপর আবার ছুটে যায়, কিম্বা লজ্জিত হয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসে। আবার কোন মেয়ে-কুকুর একদিকে তার বাচ্চারা অন্যদিকে তার প্রভু, এই দু'য়ের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে সমস্যায় পড়ে। তাই যখন সে তার বাচ্চাদের কাছে চুপি চুপি সরে পড়ে, তখন তার প্রভুকে সঙ্গ না দেওয়ার লজ্জা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু এই বিষয়ে আমার জানা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক উদাহরণটি হলো দেশান্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তিটির কাছে মাতৃত্বের মতো একটি প্রবৃত্তিও তুচ্ছ হয়ে যায়। দেশান্তর গমনের প্রবৃত্তি এতই শক্তিশালী যে, যদি কোন পাখিকে তার দেশান্তরের মরশুমে খাঁচা-বন্দী করে রাখা হয়, তাহলে সে খাঁচার তারে নিজের বুক ঘষতে থাকে, আর যতক্ষণ না তা পালকশূন্য ও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ এই মরণ-যজ্ঞ শেষ হয় না। আবার এই প্রবৃত্তির বশেই স্যামন মাছেরা তাদের বাঁচার পক্ষে অনুকূল জল থেকে ডাঙায় লাফিয়ে ওঠে এবং একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আত্মাহুতি দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বা মাতৃত্ববোধ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সহজাত বোধ, আর তার প্রভাবেই ভীরুস্বভাব দুর্বল পাখিরাও আত্মরক্ষার কথা ভুলে চরম বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে—অবশ্য কিছু দ্বিধা তাদের থাকেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দেশান্তর গমনের প্রবৃত্তি এত শক্তিশালী যে শরৎকালের শেষে সোয়ালো, হাউস-মার্টিন, সুইফ্‌ট্ প্রভৃতি পাখিরা বাসায় তাদের অসহায় বাচ্চাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখেও দিব্যি উড়ে যায়।[৮]

৮। রেভারেণ্ড এল. জেনিন্স জানিয়েছেন (দ্রঃ, জেনিন্স সম্পাদিত "হোয়াইটন্ হ্যাচারাল হিস্ট্রি অব, সেলবরন", ১৮৫৩, পৃঃ ২০৪), মহান জেনার সর্বপ্রথম এই ঘটনাটি নথিভুক্ত করেছিলেন (দ্রঃ "ফিল্. ট্রানজ্যাক্ট." ১৮২৪ খ্রীঃ) এবং তারপর অনেকেই, বিশেষ করে মিঃ ব্ল্যাকওয়াল, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দু'বছর ধরে ৩৬টি পাখির বাসায় অনুসন্ধান চালান; সময় হিসেবে বেছে নেন শরৎকালের শেষ দিকটা। তিনি দেখেন—১২-টি বাসায় পড়ে আছে পাখির মৃত ছানা, ৫-টিতে ফুটনোন্মুখ ডিম, আর ৩-টিতে রয়েছে অপরিণত ডিম। যে-সব পাখি তখনও দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার মতো সক্ষম হয়ে ওঠেনি, তাদেরকেও ফেলে যাওয়া হয়েছে (দ্রঃ, ব্ল্যাকওয়াল-এর "রিসার্চেস ইন, জুওলজি", ১৮৩৪, পৃঃ ১০৮, ১১৮)। খুব একটা দরকার না থাকলেও অতিরিক্ত প্রমাণাদির জন্য দেখুন, লেরয়-এর "লেটারস্ ফিলং", ১৮০২, ২১৭, আর সুইফট পাখিদের বিবরণ জানার জন্য দেখুন, গোল্ড-এর "ইনট্রোডাক্শন টু দ্য বার্ডস্ অফ, গ্রেট ব্রিটেন", ১৮২৩, পৃঃ ৫)। মিঃ অ্যাডাম্স্-ও কানাডাতে অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেছেন (দ্রঃ, "পপুলার সায়েন্স রিভিউ", জুলাই ১৮৭৩, পৃঃ ২৮৩)।

কোন একটি সহজাত আবেগ যদি একবার কোন প্রজাতির পক্ষে অন্যান্য বা বিপরীতধর্মী সহজাত প্রবৃত্তি অপেক্ষা বেশী উপকারী বলে মনে হয়, তবে তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বাদবাকীদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ঐ আবেগটি বিশেষভাবে বিকশিত হয়, বাস্তবে তারাই বেশী সংখ্যায় টিকে থাকে। অবশ্য এইভাবে মাতৃস্নেহের সঙ্গে দেশান্তরে উড়ে যাওয়ার প্রবৃত্তির তুলনা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কেননা, বছরের কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়েই সারা দিন যাযাবর পাখিদের এই অধ্যবসায় বা ব্যস্ততা অত্যধিক মাত্রায় বেড়ে উঠতে দেখা যায়।

মানুষ সামাজিক প্রাণী : মানুষ যে সামাজিক প্রাণী, সে-ব্যাপারে কারোরই দ্বিমত থাকার কথা নয়। মানুষের এই সামাজিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন দেখি সে একা একা থাকতে পছন্দ করে না বা পারিবারিক জীবনের বাইরেও অন্যদের সঙ্গ কামনা করে। তাই তার পক্ষে নির্জন কারাবাস একটি কঠিন শাস্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়। কোন কোন লেখক মনে করেন, একেবারে গোড়ার দিকে মানুষ পৃথক পৃথক পরিবারে বিভক্ত হয়ে বাস করত। কিন্তু বর্তমানে কোন একটিমাত্র বা একসঙ্গে দু'তিনটি অ-সভ্য পরিবার নির্জন বনে-জঙ্গলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালেও, একই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তাদের সবসময় একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকেই। তেমন প্রয়োজন হলে এই পরিবারগুলি একে অপরের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে, এমনকি বিপদের সময় তারা দলবেঁধে শত্রুর মোকাবিলাও করে। একথা ঠিক যে পাশাপাশি অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ সময় হানাহানি লেগেই থাকে। কিন্তু এর থেকে যদি সিদ্ধান্ত করতে বসি যে অ-সভ্য লোকেরা সামাজিক প্রাণী নয়— তাহলে সেটা অসঙ্গত হবে। কেননা একই প্রজাতিভুক্ত সকল প্রাণীর মধ্যেই যে সমাজবদ্ধতার সহজাত প্রবণতা দেখা যাবে, এমন কোন কথা নেই। চার হাত-পা-ওয়ালা অধিকাংশ প্রাণীর আচার-আচরণ একইরকম বলে আমরা ধরে নিতে পারি, মানুষের বানর-সদৃশ আদি পূর্বপুরুষরাও তাদের মতোই সামাজিক প্রাণী ছিল। তবে এটা আমাদের আলোচনায় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একথা ঠিক যে বর্তমান সময়ের মানুষের মধ্যে তাদের আদি-পুরুষের দ্বারা অর্জিত বিশেষ বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে প্রায় সবকটি নষ্ট হয়ে কয়েকটি মাত্র টিকে আছে। কিন্তু তাই বলে সে তার পাড়াপড়শীর জন্যে কিছু পরিমাণ সহজাত প্রবৃত্তিগত ভালোবাসা ও সহানুভূতি বোধ করবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। সত্যি বলতে কি, আমরা প্রত্যেকেই জানি, আমাদের

মধ্যে এরকম সহানুভূতি বোধ রয়েছে,[৯] কিন্তু আমাদের সচেতনতা দিয়ে আমরা বলতে পারি না যে এগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মতো একইরকম উপায়ে বহু দিন আগে সৃষ্ট কোন সহজাত প্রবৃত্তি, নাকি আমরা প্রত্যেকে আমাদের শৈশবে এগুলি অর্জন করে থাকি। আবার মানুষ সামাজিক প্রাণী বলেই আমরা প্রায় নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, উত্তরাধিকারসূত্রেই সে তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি বিশ্বস্ত হতে ও গোষ্ঠীর দলপতিকে মেনে চলতে শেখে। অধিকাংশ সমাজবদ্ধ প্রাণীদের মধ্যেই এই গুণগুলি দেখা যায়। এই গুণের ফলে মানুষের মধ্যে কিছুটা আত্ম-সংযমের ক্ষমতাও থাকে। তাছাড়া, বংশগত প্রবৃত্তির বশেই সে তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে শত্রুর মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয় এবং তার সঙ্গীদের যে-কোন উপায়ে সাহায্য করতে তৈরী থাকে, যদি না—তাতে তার নিজের উন্নতি বা প্রবল ইচ্ছার ক্ষেত্রে তেমন কোন বড় রকমের হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। সমাজবদ্ধ জীবদের মধ্যে যারা নীচের সারিতে রয়েছে তারা প্রায় পুরোপুরিভাবে আর উপরের সারিতে অবস্থিত জীবেরা অনেকটা পরিমাণে, বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিজ নিজ সমাজের অন্যান্যদের সাহায্য করে থাকে। কিন্তু সেইসঙ্গেই তারা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতির দ্বারাও পরিচালিত হয়, আর তার পাশাপাশি থাকে কিছুটা যুক্তি-বিবেচনা। যদিও একটু আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের এমন কোন বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তি থাকে না যা তাকে তার প্রতিবেশীদের সাহায্য করার উপায় বাতলে দিতে পারে, তবু এ-কথা অনস্বীকার্য যে তার মধ্যে একটা আবেগ বা তাড়না কাজ করে থাকে এবং উন্নত বৌদ্ধিক ক্ষমতা থাকার ফলে এ-ব্যাপারে সে তার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই চালিত হয়। আবার, সহজাত প্রবৃত্তিগত সহানুভূতির ফলে সে তার সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকে। মিঃ বেইন স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্খা, গৌরব অর্জনের প্রবল ইচ্ছা এবং অবজ্ঞা ও অপযশ সম্বন্ধে নিদারুণ ভীতি—"সহানুভূতিই এ-সবের জন্মদাতা।" ফলে, মানুষ তার সঙ্গী-সাথীদের ইচ্ছা, সম্মতি ও দোষারোপ দ্বারাই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়, যে ভাবগুলি ফুটে ওঠে তাদের অঙ্গভঙ্গী ও কথার মধ্যে।

৯। হিউম্ বলেছেন (দ্রঃ, "অ্যান্ ইন্কোয়্যারি কন্সার্নিং দ্য প্রিন্সিপ্ল্স অফ্ মর্যাল্স", ১৭৫১, পৃঃ ১৩২) "একটা কথা স্বীকার করা দরকার যে, অপরের সুখে বা দুঃখে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না, কিন্তু অন্যের আনন্দের বিষয়টি……আমাদের মনের ভিতরে খুশীর ঝরণা বইয়ে দেয়, আর তাদের দুঃখ……আমাদের কল্পনার জগতে এক বিষাদ কালো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"

তাই, অত্যন্ত আদিম অবস্থায় থাকার সময়, এমনকি হয়তো সেই বানর-সদৃশ আদি পূর্বপুরুষদের সময়েই অর্জিত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি আজও মানুষকে সবচেয়ে ভালো কয়েকটি কাজ করার প্রেরণা যোগায়। তা সত্ত্বেও তার কাজের অনেকটাই তার প্রতিবেশীদের ইচ্ছা ও মতামতের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং দুর্ভাগ্যবশত প্রায়শই তাতে তার নিজের স্বার্থপর ইচ্ছার থাবাও জাঁকিয়ে বসে। কিন্তু ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আত্মসংযম অভ্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠলে এবং চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলে মানুষ তার সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারে, এবং ক্ষণস্থায়ী কোন সুখ-দুঃখের ব্যাপারে ছাড়া, সে তার আচার-আচরণের কিছু নির্দিষ্ট রীতিও ঠিক করে নেয়। আর তখনি সে ঘোষণা করে—না, কোন বর্বর বা অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে এ-রকম ঘোষণা করা সম্ভব নয়—আমিই আমার আচার-আচরণের সর্বোচ্চ বিচারক, আর, কাণ্টের কথায় বলতে গেলে বলা যায়, আমি নিজে থেকে কখনো মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করব না।

অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি স্বল্পস্থায়ী প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে: এখনো পর্যন্ত আমরা মুখ্য বিষয়টিতে এসে পেঁছাইনি, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী যা নৈতিক বোধ সংক্রান্ত সমগ্র প্রশ্নটির বনিয়াদ-স্বরূপ। কেন মানুষ কোন একটি সহজাত প্রবৃত্তির বদলে অপর একটি প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করার দায়িত্ব অনুভব করে? আত্ম-রক্ষার নিদারুণ তাড়নার কাছে নতিস্বীকার করে নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রতিবেশীকে বাঁচাতে না গেলে মনে মনে সে দারুণ কষ্ট পায় কেন? কেনই বা সে খিদের জ্বালায় চুরি করে খেয়ে পরে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়?

প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলা উচিত, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত আবেগ বা তাড়নার মধ্যে শক্তির নানা তারতম্য আছে। একজন অ-সভ্য মানুষ তার নিজ সম্প্রদায়ের সহজাত কোন একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত অপরিচিত একজনের বিপদে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। আবার, অনভিজ্ঞা কোন ভীরু জননী নিজে শিশুকে বাঁচানোর জন্য মাতৃস্নেহের বশে যে-কোন বিপদের মুখে ছুটে যান নির্দ্বিধায়, কিন্তু অন্য কোন শিশুর বেলায় সেভাবে ছুটে যান না। তথাপি অনেক সভ্য লোক, এমনকি ছোট ছোট ছেলেরাও, যারা হয়তো আগে কখনো অন্যের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি কিন্তু দারুণ সাহসী ও সহানুভূতিশীল, তারাও অনেক সময় আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে অগ্রাহ্য করে জলস্রোতে হাবুডুবু

খাওয়া কোন ব্যক্তিকে (সে অপরিচিত হলেও) ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করে। এক্ষেত্রে মানুষও সেই একই সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, যে প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়েই পূর্বোল্লিখিত খুদে কিন্তু যথার্থ বীর আমেরিকান বাঁদরটি তার প্রভুকে রক্ষা করার জন্য বৃহদাকার মারাত্মক বেবুনটিকে আক্রমণ করেছিল। এখানে উল্লিখিত এই ধরণের কাজগুলি হচ্ছে অন্য যে-কোন সহজাত প্রবৃত্তি বা উদ্দেশ্যের তুলনায় সামাজিক বা মাতৃসুলভ প্রবৃত্তির অধিক শক্তিমত্তারই ফল। কেননা এই সব কাজ করার জন্য কোনরকম চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পাওয়া যায় না কিম্বা ঠিক সেই মুহূর্তে কোন আনন্দ বা দুঃখের অনুভূতিও কাজ করে না। তবে কোন কারণে এ-সব কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলে নির্দিষ্ট প্রাণীটি দুঃখ বা নৈরাশ্য বোধ করে। অন্যদিকে, ভীরু প্রকৃতির লোকেদের মধ্যে আত্ম-রক্ষার প্রবণতা এত জোরদার হতে পারে, যার দরুণ তারা এই ধরণের ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না, এমনকি নিজের সন্তানের বিপদের সময়েও না।

জানি, কেউ কেউ বলবেন উপরোল্লিখিত কাজগুলি নিছকই আবেগতাড়িত, কাজেই এগুলিকে নৈতিক বোধের আওতায় আনা যায় না এবং নীতিসম্মত বলে আখ্যাতও করা যায় না। বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে দমন করার পর বা কোন মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের ক্ষেত্রেই শুধু তাঁরা এই অভিধাটিকে (নীতিসম্মত) প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু এই ধরণের কোন পার্থক্য-রেখা টানা প্রায় অসম্ভব।[১০] মহৎ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বলা যায়—অ-সভ্য মানুষদের সম্পর্কে এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, যেখানে দেখা গেছে যে মানবজাতির হিতাহিত সম্পর্কে কোন বোধ বা কোনরকম ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াই, নিজেদের সাথীদের বাঁচানোর জন্য তারা স্বেচ্ছায় বন্দীদশা মেনে নিয়েছে,[১১] তবু প্রতারণা করে নি। তাদের এই আত্মত্যাগকে নৈতিক মূল্য দিতেই হবে। স্বেচ্ছাকৃত কাজ

১০। এখানে আমি 'বস্তুগত নৈতিকতা'র সঙ্গে 'প্রথাগত নীতিজ্ঞানে'র পার্থক্যের কথাই বলেছি। অধ্যাপক হাক্সলিও এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত জেনে আমি খুবই খুশী হয়েছি (দ্রঃ, "ক্রিটিক্স অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্", ১৮৭৩, পৃঃ ২৮৭)। মিঃ লেস্লী ষ্টিফেন বলেছেন (দ্রঃ, "এসেজ অন্ ফ্রি থিঙ্কিং অ্যাণ্ড প্লেন স্পিকিং", ১৮৭৩, পৃঃ ৮৩), "বস্তুগত ও প্রথাগত নৈতিকতার মধ্যেকার অধিবিত্তক পার্থক্যের এই ধরণের অন্য যে-কোন পার্থক্যের মতোই অবান্তর।"

১১। এ-রকম একটি ঘটনার কথা আমি জানি। নিজেদের সহযোদ্ধাদের যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা শত্রুর কাছে ফাঁস না করার জন্য তিনজন পাটাগনিয়ান ইণ্ডিয়ানকে একের পর এক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল (দ্রঃ, "জার্ণাল অফ্ রিসার্চেস্", ১৮৪৫, পৃঃ ১০৩)।

ও বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যকে দমন করা সম্বন্ধে বলা যায়—নিজেদের সন্তান কিম্বা সাথীদের বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করার সময় জীবজন্তুরা অনেক সময় দুই বিপরীত প্রবৃত্তির দোলা-চলে পড়ে। তখন তাদের কাজকে (তা অন্যের কল্যাণের জন্য হলেও) নৈতিক বোধ সম্পন্ন বলা চলে না। উপরন্তু, যে-সব কাজ আমরা হামেশাই করে থাকি, সেগুলিকে শেষ পর্যন্ত আর চিন্তাভাবনা বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে করতে হয় না, আপনা-আপনিই হয়ে যায়। আর তখন সেগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তির থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু তাসত্ত্বেও বলা চলে না যে এই কাজগুলি আর নৈতিকবোধ সম্পন্ন নয়। বিপরীতপক্ষে, আমরা সকলেই বুঝতে পারি যে কোন কাজকে যথাযথ বা মহত্তম উপায়ে সম্পাদিত বলে মনে করা যায় না, যদি তা আবেগতাড়িত না হয়, প্রচুর চিন্তা-ভাবনা বা প্রচেষ্টা ছাড়াই যদি তা করা না হয়—ঠিক যেমনভাবে কাজ করে থাকেন এই ধরণের সহজাত গুণসম্পন্ন মানুষরা। কাউকে যদি কোন কাজ করার আগেই তার ভয়-ভীতি জয় করতে বা সহানুভূতির অভাব মেটাতে বাধ্য করা হয়, তাহলে একদিক থেকে তার কাজ সহজাত গুণসম্পন্ন কোন ব্যক্তির স্বতোৎসারিত হাজার ভালো কাজের তুলনায় অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে ঠিকমতো পার্থক্য করতে পারি না বলেই আমরা নৈতিকবোধ সম্পন্ন কোন মানুষের বিশেষ কিছু কাজকে নৈতিক কাজ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি।

নৈতিক বোধসম্পন্ন মানুষ আমরা তাকেই বলি, যে তার অতীত ও ভবিষ্যতের কাজ বা উদ্দেশ্যের মধ্যে তুলনা করতে এবং সেগুলির ভালো-মন্দ বিচার করতে সক্ষম। তাবলে ভাববার কোন কারণ নেই যে নিম্নশ্রেণীর কোন প্রাণীর মধ্যেও এই ক্ষমতা আছে, আর সেইজন্যেই যখন কোন সন্তরণপটু কুকুর (New foundland dog) জল থেকে কোন শিশুকে উদ্ধার করে, কিম্বা যখন কোন বাঁদর তার সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হয় বা বাপ-মা হারা অন্য একটি বাঁদর-ছানার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তখন আমরা তাদের আচরণকে নৈতিকতামণ্ডিত বলে দাবী করতে পারি না। একমাত্র মানুষকেই নৈতিক সত্ত্বার মর্যাদা দেওয়া হয়, এবং তার বিশেষ একধরণের কাজকে নীতিসম্মত কাজ বলা হয়—তা সেই কাজ ভাবনা-চিন্তা করে করা হোক, বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যর সঙ্গে লড়াই করার পর স্বেচ্ছাকৃত ভাবে সম্পাদিত হোক বা সহজাত প্রবণতার ফলে আবেগতাড়িত হয়ে বা ধীরে ধীরে আয়ত্তাধীন অভ্যাসের ফল থেকে, যে-ভাবেই হোক না কেন।

যাইহোক, আমরা বরং আমাদের বর্তমান আলোচনায় ফিরে আসি। সন্দেহ নেই যে কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি অন্যগুলির তুলনায় শক্তিশালী, এবং সেগুলির প্রভাবে

যথোচিত কাজও সম্পাদিত হয়। তবু এ-কথাটা মেনে নেওয়া মুস্কিল যে মানুষের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি (সুনামপ্রীতি ও দুর্নামভীতিসহ) আত্মরক্ষা, ক্ষুধা, যৌন কামনা, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি সহজাত প্রবণতার চেয়ে বেশী শক্তিশালী কিম্বা দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাহলে কেনই বা মানুষ কোন একটি প্রবৃত্তির বদলে অন্য একটি প্রবৃত্তিমাফিক কাজ করার জন্য অনুশোচনা করে—এমনকি এরকম অনুশোচনার কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করেও সে সফল হয় না ? আবার কেনই বা তার মনে হয় যে নিজের কাজের জন্য পরে তাকে অনুশোচনা করতে হবে ? আসলে এখানেই মানুষের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বিপুল পার্থক্য রয়ে গেছে। তবুও চেষ্টা করলে আমরা হয়তো এই পার্থক্যের কারণ কিছুটা অনুধাবন করতে পারি।

মানুষের মধ্যে মানসিক বিষয়গুলি কাজ করার দরুণ সে কিছুতেই চিন্তা-ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অতীতের নানান ঘটনা ও ছবি অবিরাম তার মনের ভিতর আসা-যাওয়া করে। যে সব প্রাণী সর্বদা দলবদ্ধভাবে থাকে, তাদের মধ্যে সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিও সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এইসব প্রাণীরা অভ্যাস বশে বিপদ-সংকেত জানাতে বা নিজ সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে কিম্বা সঙ্গী-সাথীদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। সঙ্গী-সাথীদের জন্যে কিছুটা ভালোবাসা বা সহানুভূতির বোধ তাদের মধ্যে থাকেই, আর তার জন্য বিশেষ কোন আবেগ বা ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘ বন্ধুবিচ্ছেদ তাদের মনমরা করে রাখে, আবার পুনর্মিলন আনন্দের জোয়ার আনে। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একইরকম। এমনকি সম্পূর্ণ একা থাকার সময়ও আমরা আনন্দ বা দুঃখের সঙ্গে প্রায়শই ভাবি—অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, কল্পনা করি তারা কিসে সম্মত, কিসে অসম্মত। এ-সব কিছুরই উৎস হচ্ছে সহানুভূতি, যা যাবতীয় সামাজিক প্রবৃত্তির একটি মৌলিক উপাদান। তাই যে ব্যক্তির মধ্যে এই ধরণের কোন সহজাত প্রবৃত্তি নেই, তাকে এক অস্বাভাবিক দানব ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় ! অন্যদিকে, খিদে বা প্রতিহিংসার মত কোন কোন প্রবৃত্তির চরিত্রটা অস্থায়ী ধরণের, এবং কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য এগুলিকে পুরোপুরি মেটানোও যায়। খিদের মতো কোন অনুভূতিকে পরে হুবহু মনে করা মোটেই সহজ নয়, বা বলা যায়, প্রায় অসম্ভব। কোন দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিকেও হুবহু মনে করা দুষ্কর—এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। আবার, বিপদ দোরগোড়াতে এসে না পড়লে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও জেগে ওঠে না। আর তাই অনেক ভীরুপ্রকৃতির লোক নিজেদের সাহসী বলে

দাবী করলেও, তার সত্য-মিথ্যা যাচাই হয়তখনই যখন শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশ্ন ওঠে। অপরের সম্পত্তি গ্রাস করার আকাঙ্খাও অন্যান্য অনেক আকাঙ্খার মতোই এক দুর্নিবার আকাঙ্খা। কিন্তু তাহলেও, সত্যি সত্যি অন্য কারোর সম্পত্তি দখল করার মধ্যে যে পরিতৃপ্তি, তা অন্যের সম্পত্তি দখলের আকাঙ্খার চেয়ে দুর্বল একটি অনুভূতি। অনেক চোর (স্বভাব-চোরদের কথা আলাদা) চুরি করার পর ভাবে—তাইতো, চুরিটা আমি কেন করলাম ?[১২]

মানুষ ইচ্ছে করলেই তার মনের ভিতর অতীত ঘটনার নিরন্তর আসা-যাওয়া বন্ধ করতে পারে না। ফলে সে অতীতের খিদে পাওয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণ বা বিপদের মুখে অন্যকে ঠেলে দিয়ে নিজে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাকে বিচার করে দেখতে বাধ্য হয়। আর তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে সেই প্রায়-সর্বদা বিদ্যমান সহানুভূতি এবং প্রশংসাযোগ্য বা নিন্দাযোগ্য কাজ সম্বন্ধে অন্যদের কী ধারণা—সে সংক্রান্ত পূর্বলব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞান তার মন থেকে মুছে যায় না এবং প্রবৃত্তিগত সহানুভূতির দরুণ এই জ্ঞানকে মানুষ দারুণ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করে। ফলে সে তখন মনে করে, হয়তো

১২। বিদ্বেষ বা ঘৃণা একটি দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতি, সম্ভবত অন্য যে-কোন অনুভূতির চেয়েই দীর্ঘস্থায়ী। অন্য কেউ চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিলে বা পর পর সাফল্য লাভ করলে তার প্রতি যে বিদ্বেষ জন্মায় অন্যদের—তাই হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। বেকন জোরের সঙ্গে বলেছেন (দ্রঃ, প্রবন্ধাবলী; ৯ম খণ্ড), "সমস্ত আসক্তির মধ্যে পরশ্রীকাতরতাই হচ্ছে সবচেয়ে নাছোড়বান্দা; আর তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।" অপরিচিত লোকজন বা অপরিচিত কুকুরের প্রতি সাধারণত কুকুরদের ঘৃণা খুব প্রবল হয়, বিশেষ করে অপরিচিতের দল যদি তাদের পরিবার; উপজাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও কাছাকাছি কোথাও আস্তানা গাড়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই অনুভূতিটা একান্তই সহজাত এবং অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ীও বটে। সত্যিকারের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির পরিপূরক বা বিপরীত হচ্ছে এই অনুভূতি। অ-সভ্য লোকজন সম্পর্কে আমরা যা জানি তা থেকে বলা যায় যে; তাদের মধ্যেও এই ধরণের অনুভূতি কাজ করে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে যে-কোন লোক তার নিজের গোষ্ঠীভুক্ত কারুর সম্বন্ধেও এই ধরণের অনুভূতি পোষণ করতে পারে; যদি সেই লোকটি তার কোন ক্ষতি করে এবং শত্রুতে পরিণত হয়ে থাকে। আবার, শত্রুকে আঘাত করার জন্য তাদেরকে আদিম বিবেকবোধের তাড়না অনুভব করতে হবে—এটাও সম্ভব নয়। শত্রুর ওপর প্রতিশোধ না নিলেই বরং তাকে বিবেকের দংশনে ভুগতে হয়। লোকে তোমার খারাপ চাইছে। বেশতো, তুমি তাদের ভালো কর, বা শত্রুকেও ভালোবাসতে শেখো—নিঃসন্দেহে এ-সব নৈতিকতার অনেক উচ্চস্তরের গুণ। কিন্তু আমাদের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি নিজে থেকে আমাদের সেই স্তরে উন্নীত করতে পারে কি না, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ-ধরণের কোন মূল্যবান নীতির কথা ভাবা বা মেনে চলার আগে যুক্তি, নির্দেশ এবং ঈশ্বরপ্রীতি বা ঈশ্বরভীতির সাহায্যে অত্যন্ত উন্নত ও করে তুলতে হবে এইসব প্রবৃত্তিকে এবং সহানুভূতিকে; একযোগে।

সাম্প্রতিক কোন প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের অনুসরণ করতে গিয়েই তাকে নিরাশ হতে হলো। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই এই ব্যাপারটি অসন্তোষ, এমনকি দুঃখ-কষ্টও সৃষ্টি করে।

সাধারণত যে প্রবৃত্তিটি অন্য প্রবৃত্তিগুলিকে দমিয়ে রাখে, তাকে হঠিয়ে অন্য কোন স্বল্পস্থায়ী অথচ সেই-মুহূর্তে-শক্তিশালী প্রবৃত্তি কিভাবে মাথা তোলে — তার দৃষ্টান্ত হিসেবে পূর্বোল্লিখিত সোয়ালো পাখিদের ঘটনাটিকে গ্রহণ করা যায় (অবশ্য দৃষ্টান্তটা একটু উল্টো ধরণেরই হবে)। নির্দিষ্ট একটি ঋতুতে এই পাখিরা দেশান্তরে উড়ে যাবার ইচ্ছাতেই সারাদিন বন্দ হয়ে থাকে। তাদের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, চঞ্চল হয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দেয় এবং দলে দলে এক জায়গায় জড়ো হয়। অবশ্য পক্ষী-মা যখন তার শাবকদের খাওয়ায় কিম্বা তাদেরকে ডানা দিয়ে ঢেকে রাখে, তখন মাতৃস্নেহের কাছে দেশান্তরে উড়ে যাবার প্রবৃত্তি সম্ভবত হার মানে। কিন্তু যে প্রবৃত্তিটি দীর্ঘসময় ধরে টিকে থাকে, জয় হয় তারই। তাই, তার সন্তানেরা চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই সে তাদের ফেলে রেখে উড়ে যায়। দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের পর সে তার গন্তব্যে পৌঁছোয় এবং এই যাযাবর প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটে। পাখিদের মানসিক ক্ষমতা যদি খুব উন্নত ধরণের হতো, তাহলে তার মনের মধ্যে অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠত অণুক্ষণ—পাখিহীন সেই উত্তর ভূখণ্ডে খিদে আর ঠাণ্ডায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তার সন্তানরা ! মনের এই ক্ষমতা থাকলে গন্তব্যে পৌঁছোনোর পর এক অন্তহীন যন্ত্রনায়, অনুশোচনায়, দগ্ধ হতো যাযাবর পাখিরা।

কাজ করার সময় মানুষ তার জোরালো আবেগের বশেই তৎপর হয়ে ওঠে। এইরকম জোরালো আবেগের বশে সে মাঝে-মধ্যে ভালো কাজ করলেও, সাধারণত কিন্তু সে এ-রকম আবেশের ধাক্কায় অন্যের ক্ষতি করেই নিজের আকাঙ্খা চরিতার্থ করে থাকে। অবশ্য পরে যখন অতীতের ঝাপসা-হয়ে-আসা এই স্মৃতিকে সে বিচার করতে বসে তার চিরস্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তির আলোয়, প্রতিবেশীদের শুভ মতামতের প্রতি তার শ্রদ্ধার আলোয়—তখন তার মধ্যে জেগে ওঠে বিপরীত ভাব। কৃতকার্যের জন্যে সে তখন অনুশোচনা করে, পাপ করেছে ভেবে পরিতাপ করে, দুঃখিত, লজ্জিত হয়। তবে শেষের এই বোধটি (লজ্জিত হওয়া) মূলত অন্যদের মতামতের ওপরেই নির্ভর করে। এর ফলে সে কম-বেশী দৃঢ়তা সহকারে সিদ্ধান্ত নেয়—না, ভবিষ্যতে আর এরকম কাজ করব না। এই হচ্ছে বিবেকবোধ। কারণ বিবেকবোধ মানুষকে পিছনে ফিরে দেখতে বাধ্য করে এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করে।

যে সমস্ত অনুভূতিকে আমরা দুঃখ, লজ্জা, পরিতাপ বা অনুশোচনা বলে থাকি, সেগুলির প্রকৃতি ও শক্তি শুধুমাত্র যে সহজাত প্রবৃত্তিটিকে লঙ্ঘন করে—তার উপরেই নির্ভর করে না, কিছুটা নির্ভর করে প্ররোচনার শক্তির উপরে এবং সাধারণত বেশি বেশি ভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের মতামতের উপরে। কোন একজন ব্যক্তি অপরের উপলব্ধিকে কতখানি গুরুত্ব দেবে, তা নির্ভর করে তার সহজাত বা অর্জিত সহানুভূতি বোধের উপর এবং নিজের কাজের ভবিষ্যত ফলাফল বিচার করার ক্ষমতার উপর। আরো একটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (যদিও তেমন আবশ্যকীয় নয়)—ঈশ্বর বা অজানাশক্তি সম্বন্ধে ভয় বা ভক্তি। মূলত এই ভয় বা ভক্তি থেকেই অনুশোচনার জন্ম। কয়েকজন সমালোচক আপত্তি তুলে বলেছেন, এই পরিচ্ছেদে উত্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ছোটখাট দুঃখ বা পরিতাপের ব্যাখ্যা করা গেলেও, হৃদয়-তোলপাড়-করা অনুশোচনা বোধকে এ-দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই আপত্তি খুব জোরদার নয়। কেননা, আমার সমালোচক বন্ধুরা ঠিকমতো বলতে পারেননি যে অনুশোচনা বলতে তাঁরা কী বোঝাতে চাইছেন। আমি নিজেও অনুশোচনা বলতে একটা প্রচণ্ড পরিতাপবোধ ছাড়া আর কোন সংজ্ঞা দাঁড় করাতে পারিনি। ক্রোধের সঙ্গে রাগের, কিম্বা ব্যথার সঙ্গে যন্ত্রণার যে সম্পর্ক, অনুশোচনার সঙ্গে পরিতাপেরও সম্ভবত সেই একই সম্পর্ক। এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে মাতৃস্নেহের মতো অত্যন্ত শক্তিশালী ও মর্যাদাময় কোন প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা হলে নিদারুণ যন্ত্রণার উদ্রেক হয় এবং সেইসঙ্গেই অতীতে এই প্রবৃত্তিকে অমান্য করার কারণ সংক্রান্ত স্মৃতিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি যখন কোন কাজ বিশেষ কোন সহজাত প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে না, তখনও যদি আমরা জানতে পারি যে ঐ কাজটি করার জন্য বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের ঘৃণা করছে, তাহলে সেটুকুই আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক গভীর দুঃখবোধ। ভয় পেয়ে দ্বন্দযুদ্ধ (Duel) এড়িয়ে যাওয়ার পর বহুজনই লজ্জায় জর্জরিত হয়েছে—এ কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? শোনা যায়, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই অস্পৃশ্যদের ছোঁয়া খাবার খাওয়ার পর মরমে মরে থাকেন। এখানে আর একটি ঘটনার কথা বলছি, যাকে অনুশোচনাবোধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ডঃ ল্যাণ্ডর যখন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন, তখন তাঁর খামারের কাজে নিযুক্ত একজন আদিবাসীর একটি স্ত্রী অসুখে ভুগে মারা যায়। লোকটি তখন ল্যাণ্ডরের কাছে এসে বলে যে, "সে একটি দূরবর্তী গোষ্ঠীর কোন একজন স্ত্রীলোককে বর্শা বিঁধিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছে, কেননা তবেই সে তার নিজের স্ত্রীর প্রতি শেষ কর্তব্য পালন করতে পারবে এবং

নিজেও শান্তি পাবে। আমি তাকে সাবধান করে বললাম, এমন কাজ করলে তাকে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করব। মাস কয়েক সে আগের মতোই খামারে পড়ে রইল, কিন্তু ক্রমশ রোগা হতে শুরু করল। শেষে একদিন বলল যে সে কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, খাওয়া-দাওয়া করতে পারছে না; তার স্ত্রীর আত্মা তাকে সবসময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে, কারণ মৃতা স্ত্রীকে খুশি করার জন্য সে তখনও পর্যন্ত অন্য একটি প্রাণহানি ঘটাতে পারে নি। এ-কথার কী জবাব দেব বুঝতে না পেরে আমি শুধু তাকে বললাম যে এমন কাজ করলে কোন কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।" অতঃপর লোকটি বছরখানেকের জন্য উধাও হলো। তারপর একসময় ফিরে এল বেশ খোজমেজাজী হয়ে! ব্যাপারটা কী খোঁজ করতে লোকটির অপর একজন স্ত্রী ডঃ ল্যাণ্ডরকে জানায় যে তার স্বামী দূরবর্তী একটি গোষ্ঠীর জনৈকা স্ত্রীলোককে খুন করে ফিরেছে। কিন্তু আইনমতে কোন সাক্ষ্য পাওয়া না যাওয়ায় তাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় নি। এভাবে কোন আইনকে লঙ্ঘন করা, যাকে আদিবাসীরা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে, তা তাদের মধ্যে এক গভীরতম অনুভূতির জন্ম দেয়, এবং এই অনুভূতি সামাজিক প্রবৃত্তির থেকে একেবারেই আলাদা, অবশ্য সেই আইনটি গোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে রচিত হলে আলাদা কথা। সারা পৃথিবী জুড়ে এতসব বিচিত্র কুসংস্কার কিভাবে সৃষ্টি হল, তা আমরা জানি না, যেমন জানি না নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবৈধ সংগম বা স্বজনমেহনের মতো প্রকৃতই মারাত্মক কিছু অপরাধকে একেবারে নিম্নশ্রেণীর বন্যদশার মানুষরাও কিভাবে ঘৃণাভরে পরিহার করতে শিখল (অবশ্য সমস্ত বন্যরাই যে এ-সব পরিহার করে, তা নয়)। এমনকি কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অনাত্মীয় অথচ একই পদবীবিশিষ্ট দুজন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি ভয়ের কারণ হিসেবে স্বজনমেহনকে দেখা হতো কিনা, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। "এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে (একই পদবীবিশিষ্ট দুজন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক) যে পাপ হয়, অস্ট্রেলিয়ানরা তাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। উত্তর আমেরিকার কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম ঘৃণার স্বীকৃতি মেলে। এই দুই অঞ্চলের কোন লোক যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ভিন্ন গোষ্ঠীর কোন মেয়েকে খুন করা আর স্বজাতির একটি মেয়েকে বিয়ে করা—এই দুয়ের মধ্যে কোনটি তার কাম্য, তাহলে সে কোন-রকম ইতঃস্তত না করে আমাদের মনোভাবের ঠিক উল্টো জবাবটাই দেবে।" তাহলে, সম্প্রতি কিছু লেখকের জোর গলায় বলা মতবাদটিকে আমরা বাতিল বলে ধরে নিতে পারি। তাঁরা বলেছিলেন, স্বজনমেহনের প্রতি তীব্র ঘৃণার কারণ হচ্ছে

আমাদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রদত্ত বিবেক নামক বিশেষ বস্তুটির অধিষ্ঠান। মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে, সহানুভূতির মতো এত শক্তিশালী একটি ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত হলে (যদিও তা উপরোক্তভাবেই গড়ে ওঠে) মানুষ এমনভাবে কাজ করে, যাকে সে প্রায়শ্চিত্ত বলে ভাবতে শিখেছে। যেমন, নিজেকে সে তখন আইনের হাতে তুলে দেয়।

বিবেকের প্রেরণায় মানুষ দীর্ঘ অভ্যাসের সাহায্যে এমন এক আত্ম-সংযম অর্জন করে যে একসময় তার আকাঙ্খা ও আবেগ বিনা দ্বন্দ্বে আত্মসমর্পণ করে তার সামাজিক সহানুভূতি ও প্রবৃত্তির কাছে, আর প্রতিবেশীদের মতামত সম্বন্ধে তার অনুভূতির কাছে। সেইজন্যে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়েও অনেক মানুষ খাবার চুরি করবার কথা ভাবে না বা তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। সম্ভবত আত্ম-সংযমের অভ্যাস আর সকল অভ্যাসের মতোই বংশগত; পরে আমরা দেখব যে তা সম্ভবও বটে। অবশেষে মানুষ তার অর্জিত ও খুব সম্ভব বংশগত অভ্যাসের সাহায্যে বুঝতে পারে যে অধিক স্থায়ী আবেগকে মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। 'উচিত' নামক কর্তব্যব্যঞ্জক শব্দটি কেবলমাত্র আচরণের নিয়ম মেনে চলার জন্য ব্যক্তির সচেতনতাকেই বোঝায়, তা সে নিয়মের সৃষ্টি যেভাবেই হয়ে থাক না কেন। আগে তো হামেশাই প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বলা হতো যে অপমানিত ব্যক্তি মাত্রেরই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া 'উচিত'। এমনকি আমরা এ-ও বলে থাকি যে শিকারী কুকুরের শিকার খোঁজা 'উচিত' এবং উদ্ধার-কারী কুকুরের 'উচিত' ভূপাতিত শিকারকে তুলে আনা। আর তা করতে না পারলে বলা হয় তারা কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভুলভাবে কাজ করেছে।

কোন একটি কাজ করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি যদি অপরের ভালো না করে ক্ষতি করে, এবং সেই কাজের স্মৃতি রোমন্থনের সময় তা সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির সমান বা তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী রূপ নেয়, তাহলে কাজটি করার জন্য মানুষটির মনে তেমন কোন গভীর দুঃখের উদ্রেক হয় না। কিন্তু সে এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে যে প্রতিবেশীরা তার কাজের কথা জানতে পারলে মোটেই তাকে সমর্থন করত না। এ-ধরণের ঘটনার পরেও কোন অস্বস্তিবোধ করে না, এমন সহানুভূতিহীন মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আর সত্যিই যদি কারুর মধ্যে সহানুভুতি না থাকে এবং তার মন্দ কাজ করার ইচ্ছা জোরালো হয়, আর এইসব কাজের কথা মনে করার সময় যদি স্থায়ী সামাজিক প্রবৃত্তি ও অন্যদের মতামত তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে না তোলে—তাহলে সে অবশ্যই একজন খারাপ প্রকৃতির

লোক।[১৩] তখন তার মধ্যে আত্ম-সংযমের যে একমাত্র প্রবণতাটি দেখা যায়, তা হচ্ছে স্রেফ শাস্তি পাওয়ার ভয়। আর সেইসঙ্গে থাকে একটা বিশ্বাস যে, নিজের চেয়ে অপরের ভালো গুণকে শ্রদ্ধা জানানোটাই ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার পক্ষে অনুকূল হবে।

স্পষ্টতই প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ কিছু না ভেবে সহজ সরল মনেই নিজে ইচ্ছা পূরণ করে থাকে, অবশ্য যদি না সেইসব ব্যক্তিগত ইচ্ছা তার সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করে, অর্থাৎ যদি না অপরের মঙ্গল সাধনে কোন ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু আত্ম-ভর্ৎসনা বা নিদেনপক্ষে দুশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাবার জন্য সে তার প্রতিবেশীদের সম্মতি নেই এরকম কোন কাজ (তা সে অসম্মতি যুক্তিসঙ্গত হোক বা না-ই হোক) এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলিও তাকে পরিহার করতে হয় না, বিশেষ করে সেগুলি যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে তো একেবারেই নয়। কারণ তা করতে গেলে সে নিশ্চিতভাবেই অসন্তুষ্টির শিকার হবে। একইভাবে সে তার জ্ঞানমতে বা অন্ধ ধারণার বশে যে ঈশ্বর বা বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তার বা তাদের প্রত্যাখ্যান থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে। অবশ্য এর সঙ্গে প্রায়শই ঈশ্বরদত্ত শাস্তির ভয়ও তার মনের মধ্যে কাজ করে চলে।

প্রথমে প্রকৃত সামাজিক নীতিজ্ঞান সমূহকেই মান্য করা হতো: নৈতিক বোধের উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে উপরে যে দৃষ্টিভঙ্গীটির কথা বলা হল, তা আমাদের বলে দেয়-কী করা উচিত। এবং বিবেকবোধ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হল, তা আমাদের ভর্ৎসনা করে অনুচিত কাজ করলে। এইদৃষ্টিভঙ্গীগুলির সঙ্গে মানুষের মধ্যে এই গুণটির প্রারম্ভিক ও অনুন্নত অবস্থার যথেষ্ট মিল রয়েছে। বর্বর অবস্থায় একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবার জন্য মানুষের মধ্যে অন্তত সাধারণভাবেও যে গুণগুলি থাকার দরকার ছিল, আজও সেগুলিকেই মানুষের সবথেকে প্রয়োজনীয় গুণাবলী বলে মনে করা হয়। কিন্তু এগুলি প্রায় পুরোপুরিভাবে কেবলমাত্র একই গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। অন্য গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে একেবারে বিরুদ্ধ আচরণ করলেও তাকে কোন অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। খুন, লুঠতরাজ, প্রতারণা প্রভৃতি ঘটনা একেবারে যথেচ্ছ হয়ে উঠলে কোন গোষ্ঠীই মিলে-মিশে বাস করতে পারত না। তাই কেউ তার নিজের গোষ্ঠীর

১৩। ডঃ প্রস্পার ডেস্পাইন তাঁর "সাইকোলজি ন্যাচারেল", (১৮৬৮) গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃঃ ২৪৩ ; খণ্ড ২, পৃঃ ১৬৯) বেশ কিছু জঘন্য অপরাধীর ঘটনা বিবৃত করেছেন, যাদের মধ্যে আপাতভাবে কোনরকম বিবেকবোধই নেই।

মধ্যে এই ধরণের অপরাধ ঘটালে সে "আজীবন অপযশের ছাপযুক্ত হয়", কিন্তু অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে এসব ঘটনা ঘটালে অপযশের প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। উত্তর আমেরিকার কোন ইণ্ডিয়ান যদি ভিন্ন কোন গোষ্ঠীর কারো মাথার খুলি উপড়ে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে সে নিজে যেমন সন্তুষ্ট হয়, তেমনি গোষ্ঠীর অন্যেরাও তাকে অভিনন্দন জানায়। শুধু তাই নয়, ডিয়াক্‌রা অনেকসময় অকারণেই কোন নিরীহ মানুষের মাথা কেটে আনে, তারপর জয়ের স্মারক হিসেবে সেটাকে যত্ন করে শুকিয়ে রাখে। শিশুহত্যা তো সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবেই চালু আছে,[১৪] কিন্তু তার জন্য হত্যাকারীদের কোন সমালোচনার মুখে পড়তে হয় না। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শিশু হত্যা, বিশেষ করে মেয়ে-শিশু হত্যাকে মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়, বা এই হত্যাকে কোন ক্ষতিকর কাজ বলে অন্তত মনে করা হয় না। আগেকার দিনে আত্মহত্যাকে সাধারণত কোন অপরাধ বলে মনে করা হতো না,[১৫] বরং সাহসের নিদর্শন হিসেবে কাজটাকে সম্মানজনক কাজ বলেই বিবেচনা করা হতো। এখনও পর্যন্ত কিছু অর্ধ-সভ্য ও বন্য জাতির মধ্যে আত্মহত্যার জন্য কোনরকম ভর্ৎসনা করা হয় না, কারণ কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে গোষ্ঠীর অন্যদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। জানা যায় যে, ভারতবর্ষের ঠগীরা তাদের বাপকাকাদের মতো অগুণতি লুটতরাজ বা পথচারীদের নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে না পারলে অত্যন্ত অনুশোচনা করে থাকে। সত্যি বলতে কি, সভ্যতার আদি অবস্থায় অপরিচিতের জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়াটাকে সম্মানজনক কাজ বলেই মনে করা হতো।

প্রাচীনকালে ক্রীতদাসপ্রথার কিছু উপকারী ভূমিকা থাকলেও, আসলে এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। তথাপি, এই সেদিন পর্যন্ত এমনকি অত্যন্ত সুসভ্য জাতিগুলিও এই প্রথাকে কোন অপরাধ বলে মনে করত না। আর তার

১৪। এ বিষয়ে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখেছি ডঃ গারল্যাণ্ড-এর "Ueber dan Aussterben der Natarviolker" (১৮৬৮) শীর্ষক রচনায়। শিশুহত্যা সম্বন্ধে পরবর্তী কোন পরিচ্ছেদে আমি আবার আলোচনা করব।

১৫। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে লেকি-র "হিস্ট্রি অফ্‌ ইউরোপীয়ান মর‍্যাল্‌স্‌" গ্রন্থের খণ্ড-১, ১৮৬৯, পৃঃ ২২৩-এর চিত্তাকর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। মিঃ উইনউড রিয়াদ বন্ধদের ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছেন, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোরা হামেশাই আত্মহত্যা করে থাকে। এটা সুবিদিত যে স্পেন কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর দক্ষিণ আমেরিকার হতভাগ্য আদিবাসীদের মধ্যে আত্মহত্যা হয়ে উঠেছিল প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য-"নোভারা"-র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, আর অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য-মূ্যলার-এর রচনা,—এগুলি মূ্যলার তাঁর "Les Facultes Mentales" গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃঃ ১৩৬-এ উদ্ধৃত করেছেন।

মূল কারণ ছিল এই যে, সাধারণত ক্রীতদাস ও তাদের প্রভুরা ছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক। অন্যদিকে, বর্বর লোকেরা সাধারণত তাদের স্ত্রীদের কথায় কোন আমল দেয় না। ফলে এই স্ত্রীলোকরা কার্যত ক্রীতদাসী হয়েই দিন কাটায়। অধিকাংশ বন্য জাতির লোকজন তাদের অপরিচিত লোকদের দুঃখ-কষ্টে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে, এমনকি তা দেখে মনে মনে মজাও অনুভব করে। হয়-তো অনেকেই জানেন উত্তর আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের বউ-বাচ্চারা তাদের শত্রুকে পীড়ন করার সময় যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কোন কোন বন্য জাতির লোকেরা জীবজন্তুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এক বীভৎস উল্লাস অনুভব করে। তাদের কাছে মানবিকতা এক অজানা বিষয়। তা সত্ত্বেও, পারিবারিক প্রীতির পাশাপাশি, একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একটা মায়া-মমতার বাঁধন থাকেই, এবং সেটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় দলের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো গোষ্ঠীর বাইরের লোকদের প্রতিও তাদের মমতা-আর্দ্র হাতটি বাড়ানো থাকে। এসম্পর্কে মুঙ্গো পার্ক একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, অরণ্যবাসী একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় আচরণ করেছিল। বন্য জাতের লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি চমৎকার বিশ্বস্ততার অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যায়, কিন্তু অপরিচিত আগন্তুকদের ক্ষেত্রে তাদের আচারণ একেবারেই বিপরীত। অভিজ্ঞতা বলেছে, তাদের সম্বন্ধে স্পেনীয়দের প্রবচনটা ন্যায্যই ছিল—“না, না, কখনো কোন ইণ্ডিয়ানকে বিশ্বাস কোরো না।” সত্য না থাকলে বিশ্বস্ততা আসতে পারে না। একই গোষ্ঠীর লোকজনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই প্রধানতম চরিত্র গুণ মোটেই বিরল ঘটনা নয়। মুঙ্গো পার্ক নিজের কানে শুনেছিলেন, নিগ্রো স্ত্রীলোকটি তার শিশুদের সত্যি কথা বলার উপদেশ দিচ্ছে। এই গুণটি এত গভীর ভাবে তাদের মনের মধ্যে গেঁথে যায় যে অনেক সময় অপরিচিত আগন্তুকদের ক্ষেত্রেও বন্যরা সত্যের কোন অন্যথা করে না, এমনকি এর জন্য তারা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারও করে থাকে। অবশ্য আধুনিক কূটনীতিবিদ্যার ইতিহাস স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে শত্রুর কাছে মিথ্যা কথা বলাটা খুব একটা দোষের কিছু নয়। যে মুহূর্তে কোন গোষ্ঠীর একজন স্বীকৃত নেতার উদ্ভব হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই বিশ্বস্ততাহীনতাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়; এমনকি চরম অন্ধ আনুগত্যও একটা মহান গুণ হিসেবেই বিবেচিত হয়। আদিম অবস্থায় কোন লোকের সাহস না থাকলে তাকে তার গোষ্ঠীর পক্ষে উপকারী বা বিশ্বস্ত বলে মনে করা হতো না। ফলে সারা পৃথিবীতেই এই গুণটি দারুণ সম্মান পেতো। সভ্য দেশে একজন ভালো কিন্তু ভীতু মানুষও

সমাজের পক্ষে একজন সাহসী লোক অপেক্ষা অনেক বেশী উপকারী হতে পারে, তবু কিন্তু আমরা সাহসী লোকের চেয়ে ভীতু লোককে বেশী সম্মান করি না, তা সে সমাজের যতই উপকার করুক না কেন। অন্যদিকে, একজনের বিচক্ষণতার সঙ্গে অন্যদের কল্যাণের তেমন কোন সম্পর্ক না থাকলেও, এটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। কিন্তু কখনোই সেটা যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। আত্মোৎসর্গ, আত্মসংযম ও সহ্য শক্তি না থাকলে কোন মানুষই তার গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে না, ফলে এই গুণগুলিকে অধিকাংশ সময়ই উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সঠিকভাবেই মূল্যায়ণ করা হয়। অসভ্য আমেরিকানরা তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহসের প্রমাণ দেওয়া ও তা বাড়ানোর জন্য মারাত্মকরকম সব শারীরিক পীড়নের হাতে নিজেদের সমর্পন করে, মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। অবশ্যই এরা প্রশংসার দাবীদার। ভারতীয় ফকিররাও প্রসংসার দাবী রাখে যখন তারা দেহের মাংসের মধ্যে একটা আঁকশি আটকে দোল খায়; অবশ্য এর পিছনে থাকে নির্বোধ ধর্মীয় প্রেরণা।

অন্যান্য তথাকথিত আত্ম-বিবেচনামূলক গুণাবলীর সঙ্গে গোষ্ঠীর কল্যাণ অকল্যাণের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই—যদিও পরোক্ষ সম্পর্ক থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু বন্য-মানুষরা এগুলিকে কখনোই তেমন গুরুত্ব দেয় নি। অবশ্য সভ্য জাতিগুলি এখন এই গুণগুলিকে যথেষ্ট মর্যাদা দিচ্ছে। বন্য জাতিগুলির মধ্যে অপরিমিত সুরা পানের অভ্যাস কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। এদের মধ্যে চরম কামুকতা ও অস্বাভাবিক অপরাধের হার আশ্চর্যরকম বেশী। কিন্তু যখন থেকে বহুগামি বা একগামি বিবাহের প্রথা চালু হলো, তখন থেকে এরা ঈর্ষনীয় ভাবে নারীর গুণাবলীকে মর্যাদা দিতে শিখল। অবিবাহিত মেয়েরাও এই মর্যাদার অংশীদার হলো। পুরুষদের মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছিল খুব ধীরে ধীরে, আমাদের আজকের সমাজ তো তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সতীত্বের জন্য আত্ম-সংযম একান্তই প্রয়োজন। সেই জন্যই সভ্য মানুষের নৈতিক ইতিহাসের সূচনা থেকেই একে এত সম্মান করে আসা হচ্ছে। আর তার ফলে সেই সুদূর সময় কাল আজো কৌমার্য রক্ষার নিরর্থক প্রয়াস একটি মহৎ গুণ হিসেবে উচ্চাসন দখল করে আছে। অশোভন আচরণকে ঘৃণা করাটা আমাদের কাছে এত স্বাভাবিক, যে মনে হয় যেন তা আমাদের মজ্জাগত। আবার সতীত্ব রক্ষার জন্য এই ব্যাপারটা খুব মূল্যবানও বটে। স্যার জি. ষ্ট্যানটোনের মতে, এটা শুধুমাত্র সভ্য জীবনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট একটি আধুনিক গুণ। বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে, পম্পেঈ নগরের দেওয়াল-চিত্রে

এবং নানান বন্য জাতির কাজকর্মের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে বন্য লোকেরা, এবং সম্ভবত আদিম মানুষেরাও কোন কাজের ভালো-মন্দ বিচার করত তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর কল্যাণ-অকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে—সমগ্র মানবজাতি কিম্বা গোষ্ঠীর কোন একজন সদস্যের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। আর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর বলা যায়, তথাকথিত নৈতিক বোধ প্রাথমিকভাবে সামাজিক প্রবৃত্তি থেকেই গড়ে ওঠে, কারণ দেখতে গেলে এই দুটিই পুরোপুরিভাবে সমাজ সম্পৃক্ত। আবার আমাদের মানদণ্ডের বিচারে বন্য লোকজনদের নৈতিক মান নিম্ন হওয়ায় প্রধান কারণ হচ্ছে একই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই তাদের সহানুভূতি সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা যথেষ্ট দুর্বল হওয়ায় তারা অনেক গুণকে গুণ বলে চিনতেই পারে না, বিশেষ করে আত্মোপলব্ধিগত গুণগুলিকে, যা তাদের গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য একান্ত দরকারী। যেমন, অধিকাংশ সময়ে বন্যরা মিতাচার, সতীত্ব ইত্যাদির অভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত অশুভ বিষয়গুলিকে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়ত, তাদের আত্ম-সংযমের ক্ষমতা বেশ দুর্বল। কেননা, তাদের এই ক্ষমতাটি দীর্ঘদিনের—সম্ভবত জন্মগত—অভ্যাস, নির্দেশ ও ধর্মের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি।

এখানে আমি বন্য লোকজনের অনৈতিক কাজকর্মের বিশদ ব্যাখ্যা দিলাম এইজন্যে যে সম্প্রতি কোন কোন লেখক হয় তাদের নৈতিক চরিত্রকে প্রশংসার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শুরু করেছেন, অথবা তাদের অধিকাংশ অপরাধকে পথভ্রষ্ট পরোপকারীতা বলে দেখাতে চেয়েছেন। এইসব লেখকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন বন্যদের সেইসব গুণের ওপর ভিত্তি করে, যেগুলি তাদের পরিবার ও গোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষে কার্যকরী, এবং প্রয়োজনীয়ও বটে—নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে এইসব গুণ তাদের বেশ উচ্চ মাত্রাতেই আছে।

সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্যসমূহ : নীতিজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক মতবাদপন্থী দার্শনিকদের দল মনে করতেন, নৈতিকতার ভিত্তি হল এক ধরণের স্বার্থপরতা। কিন্তু অতি আধুনিককালে 'চরম সুখের নীতি'-কেই এর ভিত্তি বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, শেষোক্ত নীতিটিকে মানুষের আচার-আচরণের মাপকাঠি হিসাবে দেখাটাই যুক্তিযুক্ত, মোটেই তার আচার-আচরণের চালিকাশক্তি-

নয়। তথাপি, যে-সব লেখকের লেখা আমি পড়েছি, তাঁদের দু'একজনে বাদে[১৬] সবাই এমনভাবে লিখেছেন, যেন প্রত্যেকটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট হেতু বা চালিকাশক্তি থাকে, আর তা অবশ্যই কোন-না-কোন আনন্দ বা নিরানন্দের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় মানুষ আনন্দ সচেতন না হয়ে কেবল সহজাত প্রবৃত্তি বা দীর্ঘ অভ্যাসের বশে আবেগ প্রণোদিত হয়ে কাজ করে—মৌমাছি বা পিঁপড়েরা যেভাবে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, অনেকটা সেরকমই। মনে করা যাক কোথাও আগুন লেগেছে। এটি নিশ্চয়ই একটি চরম বিপজ্জনক ঘটনা। তখন আমরা কী দেখি?—দেখি একজন লোক এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় সে নিশ্চয়ই কোন আনন্দ অনুভব করে না। আবার, প্রতিবেশীকে উদ্ধারের চেষ্টা না করলে পরবর্তীকালে তার নিজের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সময়ও তখন সে পায় না। পরবর্তী সময়ে নিজের আচরণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে সে বুঝতে পারে তার মধ্যে আবেগ তাড়িত একটি শক্তি রয়েছে, যা আনন্দ বা সুখ সন্ধানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর এটাই হচ্ছে মনের মধ্যে গভীর ভাবে জাঁকিয়ে বসা তার সহজাত প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রবৃত্তির ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, মনে হয় এটা বলা বেশী সুপ্রযুক্ত হবে যে তাদের এই প্রবৃত্তি সমগ্র প্রজাতির সুখের জন্য বিকশিত হয়নি, বিকশিত হয়েছে সমগ্র প্রজাতির সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য। সার্বজনীন-মঙ্গল বলতে আমরা কী বুঝি? বিশাল সংখ্যক প্রাণীকে

১৬। মিল্ খুব পরিষ্কার ভাবেই স্বীকার করেছেন (দ্রঃ "সিস্টেম অফ্ লজিক", ২য় খণ্ড পৃঃ ৪২২), আনন্দের প্রত্যাশা না করেই কেবল অভ্যাসের বশেও অনেক কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। মিঃ সিজ্‌উইকও আনন্দ ও ইচ্ছা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন (দ্রঃ "দ্য কনটেম্পোরারি রিভিউ", এপ্রিল ১৮৭২, পৃঃ ৬৭১), "সংক্ষেপে, আমাদের সচেতন ও তৎপর আবেগ সর্বদাই আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে—এই মতবাদটির বিরুদ্ধে আমি বলতে চাই যে, আমরা আমাদের সচেতনতার মধ্যে সর্বত্রই বাড়তি উপলব্ধির আবেগ খুঁজে পাই যার লক্ষ্য আনন্দ নয়, অন্য কিছু। অনেক সময় এই আবেগ আত্মপোলব্ধির সঙ্গে এতই সঙ্গতিহীন হয়ে ওঠে যে এ দুটি সচেতনতার মধ্যে একসঙ্গে সহজে সহাবস্থান করতে পারে না।" আমাদের আবেগ কোন প্রকারেই সবসময় সমসাময়িক বা প্রত্যাশিত আনন্দের অনুভূতি থেকে উৎপন্ন হয় না—সাধারণ এই অনুভূতিই হলো নৈতিকতার স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান-উপলব্ধি-তত্ত্ব গ্রহণের পিছনে একটি বড় কারণ। শুধু তাই নয়, এই অনুভূতি থাকার জন্যই উপযোগবাদ বা 'চরম সুখের' নীতিটিও পরিত্যক্ত হয়। শেষের মতবাদটির ব্যাপারে প্রায়শই আচরণের মাত্রা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, কিন্তু আসলে এ দুটি কিছুটা এক হয়েই মিশে থাকে পরস্পরের সঙ্গে।

তাদের নিজ নিজ অবস্থার মধ্যেই পূর্ণ প্রাণশক্তিতে ও স্বাস্থ্যে ভরপুর করে তোলা, এবং তা করতে গিয়ে তাদের মানসিক গুণাবলীর কোন ক্ষতি না করা। সন্দহ নেই মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সামাজিক প্রবৃত্তি প্রায় একইরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এই পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে সম্ভবপর হলে উভয়ের এই প্রবৃত্তির জন্য একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা এবং নৈতিকতার মাপকাঠি হিসাবে সার্বিক সুখের বদলে সার্বিক মঙ্গল বা কল্যাণকেই গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্রের বিচারে এই সংজ্ঞার মধ্যে কিছু ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

যখন কোন লোক নিজের জীবন বিপন্ন করে তার প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে ছুটে যায়, তখন তার কাজকে মানবজাতির সার্বিক সুখের জন্য না ভেবে সার্বিক মঙ্গলের জন্য ভাবাই যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মঙ্গল আর সুখ সাধারণত সমার্থকই হয়ে থাকে, এবং সন্তুষ্ট ও সুখী কোন মানবগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট ও অসুখী একটি মানবগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক ভালোভাবে বিকাশ লাভ করে। আমরা আগেই দেখেছি যে, মানব ইতিহাসের প্রারম্ভিক সময়ে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ইচ্ছা প্রতিটি সদস্যের আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করত। আর সকলেই যেহেতু সুখ কামনা করে, তাই "চরম সুখের নীতি" একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গৌণ নির্দেশক বা লক্ষ্যের রূপ নেয় তবে, সহানুভূতি (যা কিনা অন্যদের সম্মতি বা অসম্মতিকে মূল্য দিতে শেখায় আমাদের) আর সামাজিক প্রবৃত্তিই মুখ্য আবেগ ও নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই, আমাদের চরিত্রের মহত্তম অংশটি গড়ে উঠেছে স্বার্থপরতার নীতির ভিত্তিতে—এ অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। নিজের সত্যিকারের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে প্রতিটি প্রাণী যে তৃপ্তি পায় আর সেই কাজে বাধা পেলে যে অতৃপ্তি দেখা দেয়, তাকে স্বার্থপরতা বলা হলে অবশ্য আলাদা কথা।

একই গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের ইচ্ছা বা মতামত প্রথমে মৌখিকভাবে জানানোর চল ছিল, পরে লিখিতভাবে জানানোও শুরু হয়, আর সকলকার এই ইচ্ছা বা মতামতই হয় আমাদের আচার-আচরণের একমাত্র নির্দেশক হিসাবে কাজ করে অথবা আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তিগুলিকে দারুণরকম শক্তিশালী করে তোলে। তবে, এই ধরণের মতামত কখনো কখনো সরাসরি এই সব প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে। শেষোক্ত ঘটনাটিকে ভালোভাবে বোঝা যায় সম্মান-নীতির (Law of Honour) সাহায্যে, অর্থাৎ, যে নীতি অনুযায়ী আমরা শুধু আমাদের সমকক্ষদের মতামতকেই গুরুত্ব দিই, সমগ্র দেশবাসীর মতামতকে গুরুত্ব দিই না। এই

নিয়ম লঙ্ঘন করলে—এমন কি সেই নিয়মলঙ্ঘন প্রকৃত নৈতিকতার সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ হলেও—মানুষ সত্যিকারের কোন অপরাধ করার থেকে ও বেশী যন্ত্রণা অনুভব করে। একই ব্যাপার দেখা যায় তীব্র লজ্জাবোধের ক্ষেত্রেও। এ বোধ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই ঘুরে-ফিরে আসে। শিষ্টাচারের কোন তুচ্ছ অথচ প্রথাগত নিয়ম ভঙ্গ করার অনেক বছর পরেও সে ঘটনার কথা মনে পড়লে আমরা লজ্জিত হই। সাধারণত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিচারধারা গড়ে ওঠে কিছু স্থূল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যে অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় গোষ্ঠীর সকল সদস্যের পক্ষে আখেরে কোনটা সবথেকে ভালো ফল দেবে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় এই বিচারধারা তাদের অজ্ঞতা বা চিন্তা-ভাবনার দুর্বলতার দরুণ একটা ভুল জায়গায় গিয়ে পেঁছোয়। আর তাই দুনিয়া জুড়ে নানান অদ্ভুত অদ্ভুত দেশাচার ও কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যেগুলি মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও সুখের পুরোপুরি পরিপন্থী। হিন্দুধর্মাবলম্বী কোন গোঁড়া ব্যক্তি তার জাত-পাঁচিল একবার টপকালে প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কার অনুশোচনার তীব্রতা বেশী, ঝোঁকের মাথায় নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে পরে অনুশোচনকারী একজন জাত-হিন্দুর, না চুরি করার পর কেন চুরি করলাম ভেবে কষ্ট পাওয়া একজন চোরের। সম্ভবত চোরের তুলনায় গোঁড়া-হিন্দুর মনস্তাপই বেশী দুঃসহ।

আচার-আচরণের এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত নীতি, অজস্র অদ্ভুত অদ্ভুত ধর্মীয় বিশ্বাসের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে, আমরা সঠিক জানি না। কিভাবেই বা এগুলি পৃথিবীর সর্বত্র মানব-মনের উপর এত গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারল—তা-ও জানা নেই আমাদের। কিন্তু একথা ঠিক যে জীবনের ঊষালগ্নে আমাদের মস্তিষ্ক তীব্র সংবেদনশীল থাকে, অর্থাৎ যা শোনে তা-ই করে বা যা দেখে তা-ই শেখে; তখন যদি কানের সামনে অনবরত নির্দিষ্ট একটি বিশ্বাসের বুলি আওড়ানো হয়, তাহলে তা অচিরেই প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির স্তরে পেঁছে যায়, আর সহজাত প্রবৃত্তির মূল কথা হলো যুক্তি ভাবনা ছাড়াই ঐ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করা। অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় কিছু বন্য গোষ্ঠী কেন কয়েকটি শুভ গুণকে—যেমন সত্যের প্রতি ভালবাসাকে—বেশি মর্যাদা দেয়, তা-ও আমরা জানি না। কেনই বা অত্যন্ত সভ্য জাতিগুলির মধ্যেও একইরকম মত পার্থক্য দেখা যায়—তা-ও আমাদের অজানা। এই সব অদ্ভুত দেশাচার ও কুসংস্কার-গুলি কত দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে, তা আমরা জানি। ফলে, যুক্তিসিদ্ধ আত্মো-পলব্ধির গুণকে আমরা যে আজ একান্ত স্বাভাবিক ও প্রায় সহজাত গুণ বলেই

মনে করি—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আদিমযুগের মানুষরা কিন্তু এই গুণের কোন মূল্যই দিত না।

মনের ভিতর যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সাধারণত নৈতিক নিয়মের কোনগুলি উৎকৃষ্ট আর কোনগুলি নিকৃষ্ট-এর মধ্যেকার তফাৎ চটপট বুঝে নিতে পারে। উৎকৃষ্ট নিয়মগুলি সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, আর সেই সঙ্গে সর্বসাধারণের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই নিয়মগুলির পিছনে থাকে যুক্তির জোর আর আমাদের প্রতিবেশীদের সম্মতি অন্যদিকে নিকৃষ্ট নিয়মগুলির মধ্যে কয়েকটি আত্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, ফলে সেগুলিকে ঠিক নিকৃষ্ট বলা চলে না। এছাড়া বাকি নিকৃষ্ট নিয়মগুলি মূলত আত্মস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, জনমত এগুলির জন্ম দেয় এবং অভিজ্ঞতা ও চর্চার সাহায্যে এগুলি ক্রমশ পরিণত হয়ে ওঠে। তাই অ-সভ্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এগুলির প্রচলন দেখা যায় না।

যখন থেকে মানুষ সভ্যতার দিকে যাত্রা শুরু করল আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ভুক্ত হলো, তখন থেকে প্রতিটি মানুষই বুঝতে শুরু করল যে তার সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি ও সহানুভূতিকে জাতির সকলের কাজে লাগাতে হবে—এমনকি নিজের সম্প্রদায়ের যাদেরকে সে চেনে না, তারাও এর বাইরে থাকবে না। একবার সে এই অবস্থায় পেঁাছোনোর পর সমস্ত দেশ ও সমস্ত জাতির মানুষের জন্যই সে নিজের সহানুভূতিকে ছড়িয়ে দিতে পারে, মাঝে থাকে শুধু একটা কৃত্রিম বাধার দূরত্ব। ঐ সব মানুষদের সঙ্গে চেহারায় ও অভ্যাসে যদি তার বিপুল পার্থক্য থাকে, তাহলে তাদেরকে নিজের সমধর্মী বলে মনে করতে তার অনেক দেরি হয়—এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী! কেবল মানুষের গণ্ডীতেই নয়, তাকে অতিক্রম করে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের প্রতিও সহানুভূতি অর্থাৎ মানবতা দেখানোর ব্যাপারটা সম্ভবত অনেক পরে অর্জিত গুণগুলির অন্যতম। আপাতভাবে বন্যদের মধ্যে এই বোধ অনুপস্থিত; অবশ্য নিজেদের পোষা জীবজন্তুর প্রতি তাদের যথেষ্টই সহানুভূতি থাকে। প্রাচীন রোমবাসীদের মানবতাবোধ কত কম ছিল, সেটা তাদের ঘৃণ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের (পেশাদার একজন যোদ্ধা বা গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে কোন জন্তু বা মানুষের আমৃত্যু লড়াই) প্রদর্শনী থেকেই বোঝা যায়। আমি যতদূর জানি পম্পাস নগরীর রাখালদের কাছে মানবতাবোধের ধারণা ছিল একেবারেই অপরিচিত। মানুষের এই মহান গুণটি (মানবতাবোধ) খুব সম্ভবত সহানুভূতি থেকেই গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ আমাদের সহানুভূতি যতই কোমলতর হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে

পড়েছে, আমরা যতই সহানুভূতি বোধ করেছি যাবতীয় সজীব বস্তু সম্বন্ধে—ততই গড়ে উঠেছে আমাদের মানবতাবোধ। প্রথমে অল্প কয়েকজন মানুষ এই বোধটিকে মর্যাদা দিতে শুরু করে এবং প্রয়োগ করতে শুরু করে, তারপর তাদের উপদেশ আর দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা ছড়িয়ে পড়ে নবীনদের মধ্যে, এবং অবশেষে জনমতের মধ্যে স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে এই মানবতাবোধ।

নৈতিক কৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছিলে আমরা বুঝতে পারি যে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, আর "যে-সব পাপ আমাদের অতীতকে মনোরম করে তুলেছিল, সেগুলিকে এমনকি একেবারে অন্তরতম চিন্তাতেও ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়"। কোন্‌টা খারাপ কাজ, তা চিনতে যা-কিছু আমাদের সাহায্য করে, তা-ই আবার ঐ কাজটাকে সহজ করেও তোলে। মার্কাস অরেলিয়াস বহুদিন আগেই বলেছিলেন, "আপনার অভ্যাসগত চিন্তা-ভাবনা যেমন হবে, আপনার মনের গঠনও হবে তেমনই। কারণ চিন্তা-ভাবনার রঙেই রঞ্জিত হয় আমাদের আত্মা।"

মহান দার্শনিক হাবার্ট স্পেন্‌সার সম্প্রতি নৈতিকবোধ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয় মানবজাতির সমস্ত অতীত প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে উপযোগিতা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠেছে, সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে, তা আমাদের মধ্যে নানান সময়ে নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। আর এই পরিবর্তন, অবিরাম চলতে চলতে আর নানা কিছু সঞ্চয় করতে করতে, আমাদের নৈতিক স্বজ্ঞার কিছু বিশেষ ক্ষমতা, বিশেষ আবেগ গড়ে তুলেছে, যা আমাদের জানিয়ে দেয় কোন্‌টা সঠিক আচরণ আর কোন্‌টা বেঠিক। উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আপাতভাবে তার ভিত্তিতে কিন্তু এই স্বজ্ঞা বা আবেগ গড়ে ওঠে না।" বিভিন্ন গুণমণ্ডিত প্রবণতাগুলি বেশ কিছুটাই উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায় বলে আমার মনে হয়। আমাদের গৃহপালিত পশু-পাখিরা তাদের বিভিন্ন ঝোঁক ও অভ্যাস যে নিজেদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে চারিয়ে দেয়, সে কথা না-হয় বাদই দিচ্ছি। কিন্তু এমন অনেক প্রামান্য ঘটনার কথাও আমি শুনেছি, যেখানে উচ্চশ্রেণীর অনেক পরিবারের মধ্যে চুরি করার ইচ্ছা আর মিথ্যা কথা বলার একটা প্রবণতা বংশপরম্পরাক্রমে চালু থাকতে দেখা গেছে। সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে চুরি করা একটা নেহাতই বিরল অপরাধ। কাজেই, একই পরিবারের দুই বা তিনজনের মধ্যে চুরি করার ঝোঁক থাকাটা নিছক কোন আকস্মিক সমাপতন হতে পারে না। খারাপ প্রবণতাগুলি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হতে পারে, তাহলে ভালো প্রবণতাগলির পক্ষেও

ঐভাবে সঞ্চারিত হওয়া একান্তই সম্ভব। হজম কিম্বা যকৃৎ-সংক্রান্ত গণ্ডগোলে যাঁরা দীর্ঘদিন ভুগেছেন, তারা ভালো করেই জানেন যে শরীরের অবস্থা ছাপ ফেলে মস্তিষ্কের ওপর, এবং সেটা আমাদের নৈতিক প্রবণতার ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। "মানসিক গণ্ডগোলের একেবারে প্রাথমিক লক্ষণগুলির অন্যতম হচ্ছে নৈতিক বোধের বিকৃতি বা ভাঙন"—এই ঘটনার মধ্যেও সেই একই সত্যের প্রতিধ্বনি শুনি।[১৭] মস্তিষ্কবিকৃতিও অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে বর্তায়। মানবজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে নৈতিক প্রবণতার ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয়, তাকে বুঝতে হলে নৈতিক প্রবণতার এই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হওয়ার নিয়মের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে প্রাথমিক আবেগগুলি আমরা অর্জন করে থাকি, সেগুলির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে গুণমণ্ডিত প্রবণতাগুলির এমনকি আংশিক সংকলনও এক দারুণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে গুণমণ্ডিত প্রবণতাগুলি বংশানুক্রমেই অর্জিত হয়, তাহলে অন্ততপক্ষে সতীত্ব, মিতাচার, জীবজন্তুর ওপর দরদ প্রভৃতি ব্যাপারে একটা বিশেষ ঘটনাকে সম্ভবপর বলেই মনে হয়। ব্যাপারটা এ-রকম—এই গুণগুলি একই পরিবারভুক্ত বেশ কিছু প্রজন্ম জুড়ে চলে আসা বিভিন্ন অভ্যাস, নির্দেশ আর দৃষ্টান্তের সাহায্যেই কোন মানুষের মনের ওপর ছাপ ফেলে, আর এইসব গুণবিশিষ্ট যে-সব ব্যক্তি জীবন-ধারণের সংগ্রামে সবথেকে সফল হতে পেরেছে, তারা অন্য কোন মানুষের মনে খুব কমই ছাপ ফেলে কিম্বা আদৌ কোন ছাপই ফেলে না। এ ধরণের কোন উত্তরাধিকার সম্ভব কি না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আর সেই সন্দেহের মূল কারণটা হল এই যে, তাহলে তো ঐ নিয়ম অনুযায়ী যে কোন অর্থহীন প্রথা, কুসংস্কার আর রুচিও—যেমন অপবিত্র খাবার সম্বন্ধে হিন্দুদের আতঙ্ক—বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারত! কিন্তু কোন কুসংস্কারমূলক প্রথা কিম্বা অর্থহীন অভ্যাসের এইভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হওয়ার সমর্থনে কোন প্রমাণ আমার চোখে পড়েনি। সাধারণভাবে বিচার করলে অবশ্য মনে হয়, জীবজন্তুরা যেমন বংশানুক্রমে কিছু বিশেষ খাদ্যপ্রীতি বা বিশেষ কিছু শত্রু ভীতির শরিক হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও বংশানুক্রমে নানান গুণের অধিকারী হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

শেষত, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মতো মানুষও তার সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি অর্জন

১৭। মডস্লে, "বডি অ্যাণ্ড মাইণ্ড", পৃঃ ৬০।

করেছিল গোটা সমাজের মঙ্গলের জন্যই, আর একেবারে প্রথম থেকেই এগুলি তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার একটা আকাঙ্খা, সহানুভূতিবোধ, এবং তাকে বাধ্য করেছে প্রতিবেশীদের অনুমোদন বা অনুমোদনকে মান্য করতে। অনেক প্রাচীনযুগে সঠিক বেঠিক নির্ণয়ের একটা স্থূল নিয়ম হিসেবে এইসব আবেগ মানুষকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মননক্ষমতার উন্নতি ঘটলো, নিজের কার্যকলাপের সুদূরপ্রসারী ফলাফলকে সে বুঝতে শিখল, ক্ষতিকর প্রথা আর কুসংস্কার বর্জন করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করল, অন্যান্য মানুষদের মঙ্গলের কথাই শুধু নয় বরং তাদের সুখের কথাও বেশি করে ভাবতে শুরু করল। কল্যাণদায়ী অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠা অভ্যাস, বিভিন্ন নির্দেশ আর দৃষ্টান্ত তার সহানুভূতিকে আরও কোমল, আরও প্রসারিত করে তুলল, তার মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হল সমস্ত জাতির মানুষের জন্য, জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ আর সমাজের অন্যান্য অকর্মণ্য সদস্যদের জন্য, এমনকি নিম্নতর প্রাণীদের জন্যও—আর এইসব গুণ অর্জন করার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার নৈতিকবোধের মানও অনেক উন্নত হয়ে উঠল। সিদ্ধান্তমূলক চিন্তার অনুগামী নীতিবাদীরা এবং কিছু স্বজ্ঞাবাদীও স্বীকার করেন যে মানব-ইতিহাসের আদি যুগ থেকেই মানুষের নৈতিকবোধের মান উন্নত হতে শুরু করেছে [১৮]।

নিম্নতর প্রাণীদের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মাঝে-মাঝে একটা পারস্পরিক সংঘাত বাধতে দেখা যায়। কাজেই, মানুষের ক্ষেত্রেও যে তার নানান সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘাত বাধবে, সংঘাত বাধবে তার আহৃত গুণাবলী আর নিম্নতর (কিন্তু সেই মুহূর্তে শক্তিশালী) আবেগ বা আকাঙ্খার মধ্যে—তা আর আশ্চর্য কী! মিঃ গ্যাল্টন বলেছেন[১৯]—ব্যাপারটার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কেননা তুলনামূলক বিচারে মানুষ বর্বর অবস্থা থেকে উন্নীত হয়েছে যথেষ্টই সাম্প্রতিক কালে। কোন প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে পড়ার পর আমরা একটা অসন্তুষ্টি, লজ্জা, অনুশোচনা বা অনুতাপ বোধ করি, আর এই অনুভূতিটা হচ্ছে অন্য কোন শক্তিশালী প্রবৃত্তি বা আকাঙ্খা অতৃপ্ত থাকলে বা

১৮। একজন লেখক এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন (দ্রঃ, "নর্থ ব্রিটিশ রিভিউ', জুলাই, ১৮৬৯, পৃঃ ৫৩১)। মিঃ লেকীও তাঁর সঙ্গে কিছুটা মতের মিল খুঁজে পেয়েছেন (দ্রঃ, "হিস্ট অফ মর‍্যালস", ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।

১৯। তাঁর বিশিষ্ট রচনা "হেরিডিটারি জিনিয়াস", পৃঃ ৩৪৯ দ্রষ্টব্য। আর্জিলের ডিউকও মানব প্রকৃতির মধ্যে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন (দ্রঃ, "প্রিমিভ্যাল ম্যান", পৃঃ ১৮৮)।

ব্যাহত হলে যেমন অনুভূতি হয়, ঠিক তেমনই। অতীতের কোন উত্তেজনার ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতিকে আমরা তুলনা করে থাকি আমাদের সদ্য-কৈশোরে অর্জিত ও সারাজীবন ধরে সুদৃঢ় হয়ে ওঠা সদা-বর্তমান সামাজিক প্রবৃত্তি অথবা অভ্যাসগুলির সঙ্গে, আর যতক্ষণ না এগুলি প্রায় সহজাত প্রবৃত্তির মতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ততক্ষণ এ-রকম তুলনা আমরা করেই চলি। ঐ একই প্ররোচনা সামনে থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা তাতে আর উত্তেজিত না হই, তাহলে তার কারণ হচ্ছে হয় আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তি কিম্বা কোন প্রথা সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে তীব্রভাবে জেগে উঠেছে, অথবা আমরা জেনে গেছি যে কিছুদিন পর ঐ প্ররোচনার ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতির সঙ্গে আমাদের সামাজিক প্রবৃত্তি বা প্রথাটির তুলনা করলে প্রবৃত্তি বা প্রথাটিকেই বেশি জোরদার বলে মনে হবে, আর সেই সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি যে ঐ প্রবৃত্তি বা প্রথাকে লঙ্ঘন করলে তা আমাদের মধ্যে যন্ত্রণার জন্ম দেবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আমরা আশা করতে পারি যে গুণমণ্ডিত অভ্যাসগুলি তাদের মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, আর উত্তরাধিকার সূত্রে সম্ভবত মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাবে। তখন মানুষের উচ্চতর আর নিম্নতর আবেগগুলির মধ্যেকার সংঘাতের তীব্রতা অনেক কমে যাবে, এবং সদ্‌গুণাবলীই নেবে বিজয়ীর ভূমিকা।

শেষ পরিচ্ছেদদুটির সংক্ষিপ্তসার—নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে নিম্নতম পর্যায়ে থাকা মানুষের মন আর উচ্চতম পর্যায়ের জীবজন্তুদের মন—এ দুটোর মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। কোন বনমানুষ যদি তার নিজের অবস্থাকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারত, তাহলে সে অবশ্যই স্বীকার করত যে, কোন বাগান লুঠ করার একটা সুকৌশলী পরিকল্পনা হয়ত সে তৈরী করতে পারে, লড়াই করা কিম্বা বাদাম ভাঙার জন্য পাথরও হয়ত ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পাথর দিয়ে অস্ত্র বা যন্ত্র বানানোর চিন্তা করার মত ক্ষমতা তার নেই। আর কোন অধিবিদ্যক যুক্তিধারা অনুসরণ করা, কিম্বা কোন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা, বা ঈশ্বর বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা অথবা কোন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা—এ-সব ক্ষমতা তো আদৌ নেই তার। তবে হ্যাঁ, কোন কোন বনমানুষ অবশ্য দাবী করতে পারে যে বিয়ের সময় তাদের সঙ্গী বা সঙ্গীনীদের রঙবাহারী ত্বক আর লোমের সৌন্দর্যের মর্যাদা দিতে তারা জানে, এবং দিয়েও থাকে! এইসঙ্গেই বনমানুষদের স্বীকার করতে হবে যে, কোন কিছু দেখলে বা খুব সাধারণ কোন জিনিস দরকার হলে তারা অনেকসময় চিৎকার করে সেটা

অন্য অন্য বনমানুষদের জানাতে পারলেও, নির্দিষ্ট শব্দ দিয়ে প্রকাশ করার ধারণা কখনোই তাদের মাথায় আসেনি। নিজের দলের অন্য বনমানুষদের নানাভাবে সাহায্য করতে; তাদের জন্যে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে আর তাদের বাপ-মা মরা সন্তানদের দায়িত্ব নিতে আমরা রাজি—এমন দাবী হয়ত বনমানুষরা করতেও পারে। কিন্তু তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে সমস্ত সজীব প্রাণীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ব্যাপারটা—যা মানুষের মহত্তম গুণ—তাদের সমস্ত বোধ-বুদ্ধির বাইরে।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও, মানুষ আর উচ্চতর জীবজন্তুর মনের পার্থক্যটা (তা সে যতই পার্থকই থাকুক না কেন) হচ্ছে মাত্রার পার্থক্য, উভয়ের মনের গড়নে কোন পার্থক্য নেই। আমরা আগেই দেখেছি যে বিভিন্ন বোধ, স্বজ্ঞা, নানান আবেগ আর মানসিক ক্ষমতা, যেমন ভালোবাসা, স্মরণশক্তি, কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া, কৌতূহল, অনুকরণ প্রবণতা, বিচারশক্তি প্রভৃতি যে-সব গুণের জন্য মানুষ গর্ববোধ করে, সেগুলি নিম্নতর জীবজন্তুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায়, এমনকি কখনও কখনও বেশ উচ্চ মাত্রাতেও দেখা যায়। উত্তরাধিকারগত কিছু কিছু উন্নতি ঘটাতেও তারা সক্ষম, যেমনটা আমরা দেখেছি নেকড়ে বা শিয়ালের সঙ্গে গৃহপালিত কুকুরের তুলনা করার সময়। যদি প্রমাণ করা যেত কিছু কিছু উঁচুমানের মানসিক ক্ষমতা, যেমন সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা, আত্ম-সচেতনতা প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতা শুধুমাত্র মানুষেরই একচেটিয়া ব্যাপার (যে সম্বন্ধে আদৌ নিঃসংশয় হওয়া যায় না), তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারতাম যে এই গুণগুলি হচ্ছে আসলে অন্যান্য অত্যুন্নত মননগত ক্ষমতারই স্বাভাবিক ফল মাত্র, আবার ঐ মননগত ক্ষমতাগুলিও হচ্ছে মূলত একটা উন্নত ভাষাকে অবিরাম ভাবে ব্যবহার করারই ফল। ঠিক কোন্ বয়সে পেঁছনোর পর একটি নবজাত শিশু বিভিন্ন বিষয়ের মূল জিনিসটাকে বুঝতে পারে অর্থাৎ বিমূর্তীকরণের ক্ষমতা অর্জন করে, অথবা আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠে, আর নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে শেখে ? আমাদের জানা নেই। ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়ে ওঠার জৈবিক বিন্যাসের ব্যাপারেও আমাদের সঠিক উত্তর জানা নেই। ভাষার আধা-কৌশলও আধা-সহজাত প্রবৃত্তিমূলক চরিত্রের মধ্যে এই ক্রমান্বয় বিবর্তনের ছাপ আজও রয়ে গেছে। সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি মহৎ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় না, আর অপ্রাকৃত শক্তিসমূহের প্রতি বিশ্বাসটা একান্ত স্বাভাবিক-ভাবেই গড়ে ওঠে অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার সাহায্যেই। মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যেকার সবথেকে বড় পার্থক্যটা সম্ভবত নৈতিক বোধের মধ্যেই খুঁজে

পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করছি না, কেননা কিছুক্ষণ আগেই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে সক্রিয় মননগত ক্ষমতা এবং অভ্যাসের প্রভাবের সাহায্যে সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি—যা মানুষের নৈতিক কাঠামোর মুখ্য নীতি[২০] স্বভাবতই উপনীত হয় সেই অমূল্য নিয়মে, "তুমি যেমন ব্যবহার করবে, অন্য মানুষরাও তোমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহারই করবে ; অতএব তুমিও তাদের প্রতি একইরকম আচরণ করো।" আর এটাই হচ্ছে নৈতিকতার ভিত্তি।

সম্ভাব্য যে-সমস্ত পদক্ষেপ ও উপায়ের সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। এই ধরণের বিবর্তন যে সম্ভব, তা মোটেই অস্বীকার করা যায় না, কারণ প্রতিটি শিশুর মধ্যে এইসব ক্ষমতার ঠিকানা প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে। আর, নিম্নতর জীবজন্তুদের থেকেও নিম্নমানের কোন চরম নির্বোধের মন থেকে শুরু করে কিভাবে ধাপে ধাপে নিউটনের মত মনও গড়ে উঠেছে—তা-ও আমরা খুঁজে দেখতে পারি।

২০। "দ্য থট্‌স্ অফ মার্কাস অরেলিয়াস", পৃঃ ১৩৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আদিম ও সভ্য যুগে মননগত ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ প্রসঙ্গে

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মননগত ক্ষমতার অগ্রগতি—অনুকরণের গুরুত্ব—সামাজিক ও নৈতিক কার্যক্ষমতা—একই গোষ্ঠীর মধ্যে এইসব ক্ষমতার বিকাশ—প্রাকৃতিক নির্বাচন যেভবে সুসভ্য জাতিগুলিকে প্রভাবিত করেছে—সুসভ্য জাতিগুলিও যে একদা বর্বর অবস্থায় ছিল তার প্রমাণাবলী।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এ-বিষয়ে আমি কিছু অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত আলোচনাই শুধু করতে পারি। আমরা আগে মিঃ ওয়ালেসের যে মূল্যবান রচনাটির কথা উল্লেখ করেছি, সেই রচনায় তিনি বলেছেন—যে সব মননগত এবং নৈতিকগুণ মানুষকে নিম্নতর জীবজন্তুদের থেকে পৃথক করে তুলেছে সেই গুণগুলি আংশিকভাবে অর্জন করার পর প্রাকৃতিক নির্বাচন বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের আর কোন শারীরিক পরিবর্তন ঘটে না। কারণ, নিজের মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে "পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা নিজের শরীরকে অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে" মানুষ সক্ষম। নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের অভ্যাসকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক দারুণ ক্ষমতা আছে মানুষের। খাদ্য সংগ্রহ আর নিজেকে রক্ষা করবার জন্য নানান অস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং বহুবিধ কৌশল উদ্ভাবন করেছে সে। কোন শীতপ্রধান অঞ্চলে গিয়ে পড়লে সে গরম পোশাক ব্যবহার করে, আচ্ছাদন বানায়, আগুন জ্বালায়। আগুনের সাহায্যে সে এমন সব খাদ্য রান্না করে নেয় যে খাদ্যগুলি কাঁচা অবস্থায় দুষ্পাচ্য থাকে। নিজের প্রতিবেশীদের সে নানাভাবে সাহায্য করে, এবং ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে পারে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করে। এমনকি বহু প্রাচীন যুগেও মানুষ কিছু কিছু শ্রম-বিভাজন চালু করেছিল। অন্যদিকে, অবস্থার বিপুল পরিবর্তনের মধ্যে টিকে থাকার জন্য নিম্নতর জীবজন্তুদের শারীরিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। নতুন শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয়, কিম্বা আরও তীক্ষ্ন দাঁত নখের দরকার হয়; অথবা, ধরা পড়া আর বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। শীতলতর আবহাওয়ায় গিয়ে পড়লে

দরকার হয় শরীরজোড়া আরও ঘন রোমরাজি, কিম্বা শারীরিক ধাত পরিবর্তন। এইসব পরিবর্তন না ঘটলে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মিঃ ওয়ালেস অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, মানুষের মননগত ও নৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। এই ক্ষমতাগুলি পরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনগুলি যে বংশপরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়—তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেই, প্রাচীন যুগের মানুষ আর তাদের বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে যদি এই গুণগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ যথাযথ বা উন্নত হয়ে উঠেছে। মননগত গুণগুলি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা এই গুণগুলির জোরেই মানুষ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছে। সমাজের একেবারে আদিম অবস্থায় যে-সব লোক সবথেকে বিচক্ষণ ছিল, যারা সবথেকে ভালো হাতিয়ার বা ফাঁদ তৈরী করতে আর তা ব্যবহার করতে পারত, এবং যারা সবথেকে ভালোভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারত, তারাই সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তান লালন-পালন করতে সক্ষম ছিল। যে-সব গোষ্ঠীর মধ্যে এ-রকম গুণী লোক প্রচুর থাকত, তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠত এবং ছাপিয়ে যেত অন্য গোষ্ঠী-গুলিকে। কোন জায়গার জনসংখ্যা কত হবে, সেটা প্রধানত নির্ভর করে জীবন-ধারণের উপকরণের ওপর, আর সেটা আবার নির্ভর করে আংশিকভাবে সেই দেশের প্রাকৃতিক চরিত্রের ওপর এবং তার থেকেও অনেক বেশি ভাবে নির্ভর করে ঐ দেশে যে-সব কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়—তার ওপর। গোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যা এভাবেই বেড়ে চলে। তারা অন্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করলে সেই গোষ্ঠীর সদস্যরাও তাদের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা আরও বেড়ে ওঠে।[১] কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের দৈহিক উচ্চতা কত, শরীরের শক্তি কেমন—এ-সমস্ত গোষ্ঠীর সাফল্যের ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আংশিকভাবে নির্ভর করে ঐ এলাকায় কী ধরণের ও কত পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়, তার ওপর। ইউরোপের ব্রোঞ্জ যুগের মানুষরা অন্য একটি অধিকতর শক্তিশালী জাতির দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। ঐ শেষোক্ত জাতিটির তরবারির হাতল ছিল অনেকটা বেশি লম্বা, অর্থাৎ তাদের হাতের দৈর্ঘ্যও ছিল বড়। এটা তাদের

১। স্যার হেনরি মেইন্ বলেছেন ("এনসিয়েন্ট ল", পৃঃ ১৩১), কোন গোষ্ঠী অপর কোন গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে ঐ প্রথম গোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করতে শুরু করে যে বিজয়ী গোষ্ঠীটির পূর্বপুরুষরাই তাদেরও আদিপুরুষ।

কিছুটা সুবিধা নিশ্চয়ই দিয়েছিল, কিন্তু সম্ভবত তাদের সাফল্যের অনেক বড় কারণ ছিল কলাকৌশলের উৎকর্ষতা।

বন্যদের সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানি, অথবা তাদের বিভিন্ন প্রথা আর প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলি থেকে যেটুকু অনুমান করতে পারি,—আজকের বাসিন্দারা যেগুলির ইতিহাস প্রায় ভুলেই গেছে—তা থেকে বোঝা যায় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ গোষ্ঠীগুলি অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে ছলে বলে কৌশলে দখল করে আসছে। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য অঞ্চলে, আমেরিকার বনময় সমতলে, প্রশান্ত মহাসাগরের মহাসাগরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিলুপ্ত বা বিস্মৃত বহুগোষ্ঠীর নানান নিদর্শন। আজকের দিনে সভ্য জাতিগুলি সর্বত্রই বর্বর জাতিগুলির উপর কৌশলে প্রভুত্ব কায়েম করছে; শুধু যে-সব জায়গায় জলবায়ু একটা সাঙ্ঘাতিক বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেইসব জায়গা বাদে। এ-কাজে সভ্য জাতিগুলি পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই সফল হতে পারছে তাদের কলাকৌশলের সাহায্যেই—যা একান্তভাবে উন্নত মননশক্তিরই ফসল। কাজেই, এটা খুবই সম্ভবপর যে মানবজাতির ক্ষেত্রে মননগত ক্ষমতাগুলি মূলত যথাযথ হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে, এবং তা ঘটেছে ধীরে ধীরে। আমাদের আলোচনার পক্ষে এই সিদ্ধান্তটুকুই যথেষ্ট। প্রতিটা পৃথক পৃথক ক্ষমতা নিম্নতর প্রানীদের মধ্যে যে অবস্থায় থাকে, তার থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় থাকে মানুষের। প্রতিটা ক্ষমতার এই উত্তরণের ধারাকে খুঁজে বার করতে পারলে যে খুবই ভালো হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কাজ করার মত সামর্থ্য বা জ্ঞান আমার নেই।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, মানুষের পূর্বপুরুষরা সামাজিক জীব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে (সম্ভবত তা ঘটেছিল বহুকাল আগেই) তাদের অনুকরণের নীতি, চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা আর অভিজ্ঞতাও অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিল, আর তার ফলে তাদের মননগত ক্ষমতাতেও দেখা দিয়েছিল বিরাট পরিবর্তন। নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতার কিছু সূক্ষ্ম ছাপ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। নিম্নতম স্তরের বন্য মানুষদের মতোই বনমানুষরাও অনুকরণের ব্যাপারে খুব পারদর্শী হয়ে থাকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর একই জায়গায় একই ফাঁদ পেতে কোন জন্তুকেই আর ধরা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় জীবজন্তুরা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় এবং অন্যদের কেও সতর্কতার সঙ্গে অনুকরণ করে। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় বিচক্ষণ কোন লোক যদি একটা নতুন ধরণের ফাঁদ কিম্বা হাতিয়ার, অথবা আক্রমণ বা আত্মরক্ষার অন্য

কোন নয়া উপায় উদ্ভাবন করে, তাহলে গোষ্ঠীর বাকি সদস্যরাও তার অনুকরণ করতে শুরু করে এবং প্রত্যেকেই লাভবান হয়। এই অনুকরণের জন্য খুব বেশি চিন্তাশক্তির দরকার হয় না, নিছক আত্মস্বার্থই তাদেরকে ঠেলে নিয়ে যায়। নতুন নতুন প্রতিটা কলাকৌশলের অভ্যাসগত অনুশীলনের ফলে মননশক্তিও একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। নতুন উদ্ভাবনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে গোষ্ঠীটির লোকসংখ্যা বাড়ে, ছড়িয়ে পড়ে তারা এবং অন্য গোষ্ঠীদের স্থানচ্যুত করে তাদের এলাকা দখল করে। এইরকমভাবে সংখ্যায় বেড়ে ওঠা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে আরও উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ও উদ্ভাবনক্ষম মানুষ জন্মানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই ধরণের মানুষদের সন্তান থাকলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে তার ঐ মানসিক উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে, আর সেক্ষেত্রে আরও বেশি উদ্ভাবনশীল মানুষ জন্মানোর সম্ভাবনাও অনেক জোরদার হয়ে ওঠে। খুব ছোট কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তো এই সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে। মানসিক উৎকর্ষযুক্ত ঐ-সব মানুষদের কোন সন্তান যদি না-ও থাকে, তাহলেও গোষ্ঠীর মধ্যে তার জ্ঞাতিরা তো থাকেই, আর তাদের মধ্যেও এ-সব উৎকর্ষতার স্ফুরণ ঘটা সম্ভব। কৃষিতত্ত্ববিদ্‌রা জানিয়েছেন—যখন কোন জন্তুকে জবাই করার সময় জানা যায়, জন্তুটি সবদিক দিয়ে উৎকর্ষযুক্ত; তখন তার পরিবারের অন্যান্যদের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয় যাতে সেই বাচ্চাটিকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্য দিয়ে তার জন্মদাতার গুণগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে।

এবার সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলির কথায় আসা যাক। সামাজিক জীব হয়ে ওঠার জন্য আদিম মানুষকে অথবা তার বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষকে সেই সহজাত অনুভূতি অবশ্যই অর্জন করতে হয়েছিল, যে অনুভূতির প্রভাবেই অন্যান্য জীবজন্তুরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। নিঃসন্দেহেই বলা যায়, ঐ-সব জীবজন্তুদের মত প্রবণতা তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল। নিজের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি কিছুটা ভালোবাসা দেখা দিয়ে ছিল মানুষের মধ্যেও, তাদের থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে অস্বস্তি অনুভব করত। বিপদের গন্ধ পেলে একে অপরকে সতর্ক করত, আক্রমণ বা আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করত পরস্পরকে। এই সবকিছুর মধ্যে সহানুভূতি, বিশ্বস্ততা ও সাহসের একটা চিত্রই ফুটে ওঠে। নিম্নতর প্রাণীদের জীবনে এইসব সামাজিক গুণ যে চরম গুরুত্বপূর্ণ, সে-কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য। নির্দ্বিধায় বলা চলে, মানুষের আদি পূর্বপুরুষরাও জীবজন্তুদের মত একইভাবে, অর্থাৎ, উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জিত অভ্যাসের সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎই, এইসব সামাজিক

গুণ অর্জন করেছিল। ধরা যাক আদিম মানুষদের দুটি গোষ্ঠী একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করে। কোন এক সময় তাদের মধ্যে দেখা দিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধরা যাক গোষ্ঠী দুটির অন্য সব অবস্থা একইরকম, কিন্তু একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সাহসী, সহানুভূতিশীল ও বিশ্বস্ত সদস্যের সংখ্যা অপর গোষ্ঠীটির চেয়ে বেশি, এবং তারা বিপদ সম্বন্ধে পরস্পরকে সতর্ক করার জন্য, পরস্পরকে সাহায্য ও রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে ঐ গোষ্ঠীটিই জয়লাভ করবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মনে রাখা দরকার, বন্যদের অবিরাম যুদ্ধের আঙিনায় বিশ্বস্ততা আর সাহসের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন বিশৃঙ্খল দলের তুলনায় কোন সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর সৈনিকরা যে অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে থাকে, তার মূল কারণ হল—সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি সদস্য তার সাথীদের প্রতি আস্থা রাখে। মিঃ বেগ্‌হট্‌ চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন, যে-কোন ধরণের সরকারের ক্ষেত্রেই আনুগত্য একটি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বার্থপর ও কলহপ্রিয় লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে পারে না, আর মিলে-মিশে কাজ করতে না পারলে কোন কিছুই অর্জন করা যায় না। এইসব গুণে সমৃদ্ধ কোন গোষ্ঠী সহজেই বিস্তার লাভ করে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কালের গতিপথে অন্য কোন আরও বেশি গুণসমৃদ্ধ গোষ্ঠীর কাছে এদেরকেও একদিন-না-একদিন মাথা নোয়াতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলি ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে ওঠে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েও পড়তে পারে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে—কোন একটাই গোষ্ঠীর মধ্যেকার বেশ কিছু মানুষ প্রথমে কিভাবে এইসব সামাজিক ও নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, আর সেগুলির উৎকর্ষতার মানই বা কিভাবে উন্নত হয়ে উঠেছিল? সহানুভূতি-প্রবণ ও পরোপকারী নারী-পুরুষের সন্তান, অথবা সাথীদের প্রতি সবথেকে বিশ্বস্ত নারী-পুরুষের সন্তানদের সংখ্যা ঐ একই গোষ্ঠীভুক্ত স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক নারী-পুরুষদের সন্তানদের চেয়ে বেশি হত কি না—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। নিজের সাথীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার বদলে যারা তাদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিত (বন্যদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়), তারা প্রায়শই নিজেদের মহান চরিত্রের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোন সন্তান রেখে যেতে পারত না। যে-সব সাহসী মানুষ সবসময়েই এগিয়ে যেত যুদ্ধের সামনের সারিতে, অন্যদের জন্য স্বেচ্ছায় বিপন্ন করত নিজেদের জীবন—স্বাভাবিকভাবেই তাদের গড়পড়তা মৃত্যুর হার

অন্যদের তুলনায় বেশি হত। কাজেই, প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকার নীতি অনুযায়ী এই ধরণের গুণসম্পন্ন মানুষদের সংখ্যা অথবা তাদের উৎকর্ষতার মান ক্রমেই বেড়ে চলবে—এটা মোটেই সম্ভব নয়। কেননা এখানে আমরা কোন একটি গোষ্ঠী কর্তৃক অপর কোন গোষ্ঠীকে পরাজিত করার বিষয়ে আলোচনা করছি না।

একই গোষ্ঠীর মধ্যে এইরকম গুণসমৃদ্ধ মানুষদের সংখ্যা কোন্ কোন্ পরিস্থিতির দরুণ বেড়ে চলতে পারে, তা স্পষ্টভাবে খুঁজে বার করা খুবই জটিল ব্যাপার। তবু, সম্ভাব্য কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমত, গোষ্ঠীর সদস্যদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা ও দূরদর্শিতা উন্নত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষই বুঝতে শিখেছিল যে সে যদি অন্যদের সাহায্য করে, তাহলে সে নিজেও পাল্টা সাহায্য পেতে পারবে। এই হীন উদ্দেশ্য থেকেই হয়ত সে ধীরে ধীরে অর্জন করেছিল অন্যদের সাহায্য করার অভ্যাসটা, আর এই পরোপকার করার অভ্যাসটা নিশ্চিতভাবেই জোরদার করে তুলেছিল সহানুভূতি-বোধকে। মানুষ যে পরোপকার করতে চায়, তার কারণ হচ্ছে এই সহানুভূতিবোধ। তাছাড়া, কোন একটা অভ্যাস বহু প্রজন্ম ধরে অনুশীলিত হতে হতে একসময় উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাতে শুরু করেছিল, এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয়!

কিন্তু সামাজিক গুণাবলীর বিকাশে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে আমাদের প্রতিবেশীদের প্রশংসা ও নিন্দা। আমরা আগেই দেখেছি যে, সহানুভূতি সংক্রান্ত প্রবৃত্তিটির সাহায্যে আমরা সঙ্গতভাবেই অন্যদের প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি, কিন্তু নিজেদের বেলায় প্রশংসা পেতে ভালোবাসি আর নিন্দাকে অপছন্দ করি। অন্যান্য সামাজিক প্রবৃত্তির মত এই সহজাত প্রবৃত্তিটাও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই অর্জন করেছিল মানুষ। মানুষের পূর্বপুরুষরা তাদের বিকাশের গতিপথে ঠিক কতদিন আগে অন্য মানুষদের প্রশংসা বা নিন্দাকে অনুভব করতে বা তার দ্বারা আলোড়িত হতে শুরু করেছিল, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু এমনকি কুকুররাও উৎসাহ, প্রশংসা বা নিন্দা উপলব্ধি করতে পারে বলেই মনে হয়। একেবারে অ-সভ্যতম বন্যদের মধ্যেও গৌরব অর্জনের মানসিকতা কাজ করে। এই মানসিকতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই এইসব ঘটনার মধ্যে—নিজেদের শৌর্যের স্মারক তারা রক্ষা করে সযত্নে, তাদের মধ্যে দেখা যায় অতিরিক্ত দম্ভোক্তি করার প্রবণতা, এমনকি নিজেদের চেহারা আর সাজগোজের ব্যাপারেও তারা অতীব মনোযোগী। নিজের সঙ্গী-সাথীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিলে এ-সব অভ্যাসের কোন অর্থই থাকে না।

নিজেদের কোন গৌণ নিয়ম ভঙ্গ করলে এরা লজ্জা তো অনুভব করেই, সম্ভবত অনুতাপেও দগ্ধ হয়। জনৈক অস্ট্রেলিয়ান তার মৃতা স্ত্রী-র আত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য অপর একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করতে চেয়েছিল। কাজটা করতে দেরি হওয়ার দরুণ লোকটি অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং কৃশকায় হয়ে গিয়েছিল। এই ধরণের আর কোন ঘটনার কথা আমার জানা না থাকলেও এ-কথাটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, যে বন্যরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তবু গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বন্দীত্ব মেনে নেয় তবু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না—তারা তাদের ধারণামতে কোন পবিত্র কর্তব্য সমাধা করতে না পারলে অন্তরের অন্তঃস্থলে কোনরকম অনুশোচনা বোধ করবে না, তা হতেই পারে না।

কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, খুব প্রাচীনকালে আদিমযুগের মানুষ তার সঙ্গী-সাথীদের প্রশংসা আর নিন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যায়, একই গোষ্ঠীর সদস্যরা সেইসব আচরণকেই অনুমোদন করবে যেগুলি তাদের সবার পক্ষে মঙ্গলজনক, আর সেইসব আচরণের নিন্দা করবে যেগুলি তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। নৈতিকতার বনিয়াদ হচ্ছে অন্যদের উপকার করা—অন্যদের সঙ্গে তুমি যেমন আচরণ করবে, তারাও তোমার সঙ্গে তেমন আচরণই করবে। তাই, আদিমযুগের মানুষের পক্ষে প্রশংসা-প্রীতি আর নিন্দা-ভীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করাটা মোটেই অতিরঞ্জন নয়। কোন মানুষ যদি কোন গভীর, সহজাত অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে অন্যদের উপকারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার বদলে কোন গৌরব অর্জনের তাড়নায় তার জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার সেই কাজটাও অন্য মানুষদের মধ্যে ঐ গৌরব অর্জনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে, আর নানাজনের এই ধরণের কাজের ফলে অন্যদের সম্মান জানানোর মহৎ অনুভূতিটিও জোরদার হয়ে ওঠে। নিজের মহৎ গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোন সন্তান রেখে না গিয়েও সে এইভাবে তার গোষ্ঠীর অনেক বেশি উপকার করতে পারে।

অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনার শক্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার কাজকর্মের সুদূরপ্রসারী ফলাফলকে বুঝতে শেখে, আর মিতাচার, সতীত্ব প্রভৃতির মত যে-সব আত্ম-সংযমমূলক গুণকে একসময় কোনরকম মর্যাদাই দেওয়া হত না, সেগুলি বিপুল মর্যাদা পেতে শুরু করে, এবং এরকম কোন কোন গুণকে এখনও পবিত্র ব্যাপার বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে চতুর্থ পরিচ্ছেদে যা বলে এসেছি, তার আর পুনরাবৃত্তি করছি না। আমাদের নীতিবোধ বা বিবেকবোধ শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অত্যন্ত জটিল অনুভূতিতে, যার উদ্ভব হয়

সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে, বহুলাংশে পরিচালিত হয় আমাদের সঙ্গী-সাথীদের অনুমোদন-অননুমোদনের দ্বারা, যার দিক-নির্দেশ করে চিন্তাশক্তি, আত্মস্বার্থ এবং পরবর্তীকালে গভীর ধর্মীয় অনুভূতি, আর যা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে নির্দেশ ও অভ্যাসের সাহায্যে।

কোন ব্যক্তি ও তার সন্তানদের নৈতিকতার মান খুব উঁচু হলেও তার দরুণ তারা নিজেদের গোষ্ঠীর অপর সদস্যদের তুলনায় খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে না, এ-কথা সত্য। কিন্তু কোন গোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ গুণসমন্বিত মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও তাদের নৈতিকতার মান উন্নত হলে সেই গোষ্ঠীটি অন্য গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে—একথাটা জোর দিয়েই বলা যায়। দেশপ্রেম, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, সাহস, সহানুভূতি, পরস্পরকে সাহায্য করার তীব্র আকাঙ্খা, সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গকরা—এইসব মহৎ গুণে সমৃদ্ধ মানুষ যে গোষ্ঠীতে বেশি থাকত, তারা সহজেই অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারত, তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারত। আর এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। দেখা যায়, পৃথিবীর সব দেশে সব কালেই এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করেছে। যেহেতু ঐ-সব গোষ্ঠীর সাফল্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নৈতিকতা, তাই সর্বত্রই এই নৈতিকতার মান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে উচ্চ গুণসমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেতে দেখা গেছে।

তবে, কোন বিশেষ গোষ্ঠী কেন সফল হতে এবং সভ্যতার স্তরে উন্নীত হতে পারল, আর অপর একটি গোষ্ঠী কেন তা পারল না—সেটা নির্ধারণ খুবই করা মুস্কিল। বেশ কয়েক বছর আগে যখন বিভিন্ন বন্য জাতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা অনেকেই একইরকম অবস্থায় ছিল। মিঃ বেগহট্ সঠিকভাবেই বলেছেন, মানবসমাজের অগ্রগতির ব্যাপারটাকে আমরা নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে করে থাকি, কিন্তু ইতিহাস তাতে সায় দেয় না। প্রাচীন কালের মানুষেরা এ নিয়ে ভাবতোই না, আজকের প্রাচ্য জাতিগুলিও ভাবে না। আর এক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ স্যার হেনরি মেইন্ বলেছেন, "মানবজাতির অধিকাংশের মধ্যে তাদের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করার সামান্যতম আকাঙ্খাও কখনো দেখা যায়নি।" নানাধরণের আনুষঙ্গিক অনুকূল অবস্থার উপরই অগ্রগতি নির্ভর করে, যেগুলিকে খুঁজে বার করা একান্তই দুরূহ। তবে, একটা শান্ত, নিরুদ্বেগ পরিবেশ যে অগ্রগতি ও বিকাশের পক্ষে খুবই অনুকূল, এবং সেটা যে মানুষের মধ্যে এনে দেয় শিল্প গড়ে তোলার ক্ষমতা, নানান চারু ও কারু শিল্পের দক্ষতা—এ-কথা বহুজনই স্বীকার করেছেন।

নিদারুণ প্রয়োজনের তাগিদে এস্কিমোরা সুদক্ষ কৌশলে বহু কিছু উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু তাদের অঞ্চলের জলবায়ু মোটেই ধারাবাহিক অগ্রগতির অনুকূলে নয়। যাযাবরসুলভ অভ্যাসও সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক—তা সে বিস্তৃত সমতল অঞ্চল জুড়েই হোক, বা উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের ঘন অরণ্যানীর মধ্যেই হোক, কি সমুদ্রের উপকূল বরাবরই হোক। টিয়েরা দেল্ ফুয়েগো-র বর্বর অধিবাসীদের পর্যবেক্ষণ করার সময় আমার মনে হয়েছিল, কিছু অস্থাবর সম্পত্তি, একটা স্থায়ী আবাস, আর একজন প্রধানের অধীনে বেশ কিছু পরিবারের একত্রবাস—এগুলিই সভ্যতার অপরিহার্য পূর্বশর্তাবলী। এই ধরণের অভ্যাস-সমূহ কৃষিকাজকে প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। অন্যত্র আমি দেখিয়েছি, সম্ভবত কোন-না-কোন আকস্মিক ঘটনা থেকেই কৃষিকাজের সূত্রপাত হয়েছিল। যেমন, হয়ত কোন আবর্জনা-স্তুপের ওপর কোন ফলের বীজ পড়ল, কিছুদিন পর সেই আর্বজনা-স্তুপের মধ্যে মানুষ দেখল এক আশ্চর্য জিনিস: গাছ! শুরু হল কৃষিকাজ। তবে, বন্য মানুষ প্রথমে সভ্যতার দিকে কিভাবে পা বাড়িয়েছিল, সেটা আজ নির্দিষ্ট করে বলতে পারা খুবই কঠিন কাজ।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে সুসভ্য জাতিগুলিকে প্রভাবিত করে: এখনও পর্যন্ত আমি শুধু অর্ধ-মানবীয় অবস্থা থেকে মানুষ কিভাবে আধুনিক বন্য অবস্থায় এসে পেঁছিল, তা নিয়েই আলোচনা করেছি। সুসভ্য জাতিগুলির ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, সে প্রসঙ্গে এবার কিছু বলা দরকার। মিঃ ডব্লিউ. আর. গ্রেগ এবং তার আগে মিঃ ওয়ালেস ও মিঃ গ্যাল্টন এ-বিষয়ে বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এই তিনজনের রচনা থেকেই আমি আমার অধিকাংশ বক্তব্য সংগ্রহ করেছি। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বল লোকদের বন্যরা বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখে না; আর যারা টিকে থাকে, তাদের শরীর-স্বাস্থ্য সাধারণত দারুণ হয়। অন্যদিকে, আমরা অর্থাৎ সভ্য মানুষরা আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি দুর্বলদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে। জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ ও অসুস্থদের জন্য আমরা গড়ে তুলি নানান সেবা-প্রতিষ্ঠান, দরিদ্রদের ত্রাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য রচনা করি আইন, প্রতিটি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেদের যাবতীয় দক্ষতা উজাড় করে দেন আমাদের চিকিৎসকরা। অতীতে শারীরিক দুর্বলতার দরুণ যারা গুটি-বসন্তে আক্রান্ত হত, এমন হাজার হাজার মানুষ আজ যে গুটি-বসন্তের টীকা নেওয়ার ফলে রক্ষা পেয়েছে—তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সভ্য সমাজের দুর্বল সদস্যরাও এইভাবে টিকে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। গৃহপালিত পশুদের প্রসব-দৃশ্য

যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একমত হবেন যে ঐ-রকম প্রসব প্রক্রিয়া মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিচর্যার অভাব কিম্বা ভুল পরিচর্যা অল্পদিনের মধ্যেই যে-কোন গৃহবাসী প্রজাতির দারুণ ক্ষতি করতে পারে। তবে, শুধু নিজেদের ব্যাপারটা (অর্থাৎ মানুষের বংশবিস্তার) বাদে, কোন মানুষই নিকৃষ্টতম শারীরিক গঠন ও গুণসম্পন্ন জন্তু-জানোয়ারদের বংশবিস্তার করতে দিতে চায় না।

অসহায়দের সাহায্য করার যে তাড়না আমরা মনের মধ্যে অনুভব করে থাকি, তা আসলে আমাদের সহানুভূতি বিষয়ক প্রবৃত্তিটিরই একটি স্বাভাবিক ফল। এই প্রবৃত্তিটি মানুষ প্রথম অর্জন করেছিল তার সামাজিক প্রবৃত্তির অংশ হিসাবেই। কিন্তু পরবর্তীকালে (পূর্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ায়) তা আরও কোমল, আরও বহুবিস্তৃত হয়ে ওঠে। আমাদের চরিত্রের মহত্তম অংশের অবনতি না ঘটিয়ে আমরা আমাদের সহানুভূতিকে রুদ্ধ করে রাখতে পারি না, এমনকি তা রুদ্ধ করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকলেও নয়। শল্য-চিকিৎসার সময় কোন শল্য-চিকিৎসক নিজের মনকে কঠোর, নির্মম করে তুলতে পারেন, কারণ তাতেই রোগীর মঙ্গল। কিন্তু দুর্বল ও অসহায়দের কি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করতে পারি? ভীষণ রকম ক্ষতিকর কোন আশু বিষয়ের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য হয়ত করতে পারি, অন্যথায় নয়। অক্ষম, দুর্বল মানুষদের টিকে থাকা ও বংশবিস্তার করার সন্দেহাতীত ক্ষতিকর ফলাফলের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। তবে, এইসব মানুষদের দ্রুত বংশবিস্তারের পথে অন্তত একটা প্রতিবন্ধক আছে: সমাজের দুর্বল ও অক্ষম মানুষরা সুস্থ-সবল মানুষদের মত সহজে বিবাহ করতে পারে না। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা আদৌ বিবাহ না করলে এই প্রতিবন্ধকটা সবথেকে বেশি কার্যকরী হতে পারত। তবে সেটা শুধু আশাই করা যায়, বাস্তবে তা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।

যে-সব দেশে প্রচুর সংখ্যক সৈন্যবিশিষ্ট নিয়মিত সৈন্যবাহিনী আছে, সেখানে সবথেকে সুস্থ-সবল যুবকদের বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছায় সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলত যুদ্ধের ময়দানে তারা অকালে প্রাণ দেয়, প্রায়শই নানান কদভ্যাসে লিপ্ত হয়, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে বিবাহ করতে পারে না। অন্যদিকে, দুর্বল, রুগ্ন মানুষদের যুদ্ধে যেতে হয় না, নিজেদের ঘরেই থাকতে পায় তারা, ফলে বিবাহ ও বংশবিস্তার করার সম্ভাবনাও তাদের অনেক বেশিই থাকে।

জীবনে মানুষ যে-সব সম্পদ বা সম্পত্তি অর্জন করে, সেগুলি সে রেখে যায় তার সন্তানদের জন্য। ফলে, সাফল্যের প্রতিযোগিতায় দরিদ্রদের সন্তানদের

তুলনায় ধনীদের সন্তানরা সবসময়ই এগিয়ে থাকে, আর তার জন্য শারীরিক বা মানসিক উৎকৃষ্টতার কোন প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, ক্ষীণজীবি ও অল্প বয়সে মৃত পিতা-মাতার সন্তানদের শরীর-স্বাস্থ্যও সাধারণত দুর্বল হয়, এবং তাদের বয়সী অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের তুলনায় অনেক আগেই পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্যদের থেকে অল্প বয়সে বিবাহও করে, আর নিজেদের দুর্বলতার উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে যায় অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যাপারটা এমনিতে মোটেই ক্ষতিকর নয়, কারণ পুঁজির সঞ্চয় না হলে শিল্পের উন্নতিসম্ভব নয়। আর মূলত এই শিল্পোদ্যোগ জোরেই সভ্য জাতিগুলি নিজেদের এলাকা বাড়াতে পেরেছে, আজও বাড়িয়ে চলেছে আর দখল করে চলেছে অপেক্ষাকৃ নিকৃষ্ট জাতিগুলির এলাকা। পরিমিত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াও কোনভাবে ব্যাহত হয় না। কোন দরিদ্র মানুষ মোটামুটি ধনী হয়ে উঠলে তার সন্তানরা এমন সব ব্যবসা বা পেশায় হাত দেয় যেখানে সংগ্রাম বেশ তীব্র, আর তার ফলে দেহে-মনে সক্ষম ব্যক্তিরাই সেখানে সবচেয়ে সাফল্যলাভ করে। দৈনন্দিন রুজি-রুটির জন্য যাদের পরিশ্রম করতে হয় না, এমন কিছু সুশিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতি সমাজে একান্তই দরকার। যে-সব কাজে উচ্চ মননশীলতার প্রয়োজন, সে-সব কাজ এঁরাই করে থাকেন, আর এইসব কাজের ওপরেই নির্ভর করে সমস্ত ধরণের বস্তুগত অগ্রগতি—এছাড়াও অন্যান্য উচ্চতর সুযোগ-সুবিধার কথা আর না-ই বা বললাম! সুপ্রচুর সম্পদ অবশ্য মানুষকে অকর্মণ্য ও অলস করে তোলে, তবে এ-রকম সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আর এক্ষেত্রেও একটা ঝাড়াই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলমান। প্রতিদিনই আমরা অনেক বোকা বা অপব্যয়ী ধনী ব্যক্তিকে নিজেদের সম্পদ বেহিসেবীভাবে উড়িয়ে দিতে দেখে থাকি।

বিক্রয়-অযোগ্য সম্পত্তির ওপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারও একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্যাপার, আর এটা সমস্ত যুগেই দেখা গেছে। অবশ্য এ-রকম উত্তরাধিকারের ফলে একটা প্রভাবশালী শ্রেণী সৃষ্টি হয়, এবং একসময় সেটা হয়ত সমাজের পক্ষে সুবিধাজনকই ছিল। শারীরিক বা মানসিকভাবে দুর্বল হলেও অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিবাহ করে, আর দেহে-মনে শ্রেষ্ঠতর হলেও তার পরের ভাইরা অনেক সময়েই বিবাহ করতে পারে না। বিক্রয়-অযোগ্য সম্পত্তিকে অপদার্থ জ্যেষ্ঠ পুত্ররা নানান বদখেয়ালে উড়িয়ে দিতেও পারে না। কিন্তু অন্যান্য সব ব্যাপারের মত এক্ষেত্রেও সভ্য জীবনের সম্পর্কগুলি এত জটিল যে

এই অসুবিধাটা এড়ানোর কিছু উপায়ও তারা হাতে পেয়ে যায়। জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের স্ত্রী হিসাবে সমাজের সুন্দরী নারীদের বেছে নিতে পারে। আর এইসব নারীরা সাধারণত স্বাস্থ্যবতী ও মানসিকভাবে সক্রিয় হয়ে থাকে। যোগ্যতা বিচার না করে এইভাবে একই বংশধারায় উত্তরাধিকার বর্তাতে থাকে। এর অশুভ ফলাফলকে (যা একান্তই স্বাভাবিক) প্রতিহত করতে পারে এমন কিছু ব্যক্তি, যারা সবসময়ই নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তি বাড়াতে উৎসুক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীদের বিবাহ করেই তারা নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি করে। কিন্তু, মিঃ গ্যাল্টন দেখিয়েছেন, যে-সব মেয়ে তাদের পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, তারা সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে। ফলে, উচ্চবংশীয় পরিবারগুলির সরাসরি বংশধারা ক্রমাগত ছিন্ন হয়, আর তাদের সম্পদ হস্তান্তরিত হয় বংশের অন্য কোন শাখার লোকজনদের হাতে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, এইভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার সময় যারা তা পাচ্ছে, তারা কে কতটা যোগ্য, সে ব্যাপারে কোনরকম বিচার-বিবেচনা করা হয় না।

এইভাবে সভ্যতা প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজকে নানাভাবে বাধা দিলেও, ভাল খাদ্য যুগিয়ে ও বিভিন্ন কষ্টকর কাজ লাঘব করে শরীরের উন্নতি ঘটাতেও সভ্যতা সাহায্য করে। এই কথার সমর্থনে আমরা দেখতে পাই, বন্যদের তুলনায় সভ্য মানুষরা শারীরিকভাবে বেশি শক্তিশালী হয়। বহু দুঃসাহসিক অভিযানে দেখা গেছে সভ্য মানুষদের সহ্য ক্ষমতা বন্যদের চেয়ে মোটেই কম নয়। এমনকি ধনীদের প্রচুর বিলাস-ব্যসনও খুব একটা ক্ষতিকর কিছু নয়, কেননা দেখা গেছে আমাদের অভিজাতদের মধ্যেকার সকল বয়সের নারী-পুরুষের আয়ুষ্কাল নিম্নশ্রেণীর স্বাস্থ্যবান ইংরেজদের চেয়ে এমন কিছু কম নয়।

এবার মননশীল ক্ষমতার বিষয়টিতে আসা যাক। সমাজের সকল স্তরের সমস্ত সদস্যকে উচ্চ মননশীলতাসম্পন্ন ও নিম্ন মননশীলতাসম্পন্ন—এই দু'ভাগে সমানভাবে ভাগ করা গেলে নিঃসন্দেহেই দেখা যেত যে প্রথমোক্তরাই সমস্ত কাজে সফল হচ্ছে আর শেষোক্তদের চেয়ে অনেক বেশি সন্তানসন্ততির জন্ম দিচ্ছে। জীবনের একেবারে সাদামাটা ব্যাপারগুলিতেও দক্ষতা ও সামর্থ্য কিছু সুবিধা দিয়েই থাকে। অবশ্য কোন কোন বৃদ্ধিতে চূড়ান্ত শ্রম-বিভাজনের দরুণ এই সুবিধা খুবই অল্প হয়ে থাকে। তাই সমস্ত সভ্য জাতির উচ্চ মননশীলতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সংখ্যা ও গুণগত মান বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে এই প্রবণতার বিপরীত চিত্রটা একেবারেই অনুপস্থিত। যেমন, বেপরোয়া ও অদূরদর্শীব্যক্তিদেরও অনেক সন্তান-

সন্ততি জন্মায়। তা সত্ত্বেও, দক্ষতার কিছু বিশেষ সুবিধা থাকেই।

উপরোক্ত ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে প্রায়শই বলা হয়—পৃথিবীর বিশিষ্টতম ব্যক্তিরা তাঁদের সুমহান মননশীলতার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য কোন সন্তান রেখে যান নি। মিঃ গ্যাল্টন বলেছেন, "বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন নারী-পুরুষরা সন্তানের জন্মদানে অক্ষম হন কিনা, বা তাঁদের মধ্যে কতজন এ-রকম অক্ষম হন—সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে, আমি দেখিয়েছি যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সন্তানের জন্মদানে মোটেই অক্ষম হন না।" মহান আইনপ্রণেতারা, মঙ্গলময় ধর্ম প্রবর্তকরা, মহান দার্শনিকরা এবং বিজ্ঞান-জগতের আবিষ্কারকরা তাঁদের কাজের সাহায্যেই মানবসমাজের প্রগতিতে অনেক বড় অবদান রেখে যান। প্রচুর সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে পারলেন কি না, সেটা তাঁদের ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কোন প্রজাতির শারীরিক কাঠামোর অগ্রগতি ঘটে কিছুটা-উন্নত কাঠামোবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন আর কিছুটা-কমজোরি কাঠামোবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাতিল হয়ে যাওয়ার সাহায্যে, সুস্পষ্ট ও বিরল ব্যতিক্রমগুলিকে রক্ষা করার সাহায্যে নয়। মননগত ক্ষমতার ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য, কেননা সমাজের সমস্ত স্তরেই কিছুটা-বেশি সক্ষম ব্যক্তিরা কিছুটা-কম সক্ষম ব্যক্তিদের থেকে অধিক সাফল্য পেয়ে থাকে, এবং ফলস্বরূপ, অন্য কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হলে তাদের বংশবিস্তারও দ্রুততর হয়। কোন দেশে মননশীলতার মান ও মননশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হয়ে উঠলে, গড়পড়তা হিসাব থেকে বিচ্যুতির নিয়ম অনুসারে (মিঃ গ্যাল্টন যেমন দেখিয়েছেন) সে দেশে আগের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

নৈতিক বোধের ব্যাপারে বলা যায়, এমনকি সবথেকে সুসভ্য দেশগুলিতেও, মানুষের চরিত্রের খারাপ উপাদানগুলি বিলুপ্ত করার একটা প্রক্রিয়া সারাক্ষণই চলে। কুখ্যাত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় বা দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখা হয়, ফলে তারা আর নিজেদের খারাপ দিকগুলিকে অন্যদের মধ্যে অবাধে ছড়িয়ে দিতে পারে না। বিষাদ-রোগাক্রান্ত ও উন্মাদ ব্যক্তিদের উন্মাদ-আশ্রমে অন্তরীণ রাখা হয়, কিম্বা তারা আত্মহত্যা করে। হিংসাপ্রবণ ও কলহপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রায়শই এক ভয়ঙ্কর পরিণতির শিকার হয়। যে-সব অস্থিরচিত্ত মানুষ কোন নির্দিষ্ট বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে রাজি নয়,—বর্বর অবস্থার এই সব স্মারকরা সভ্যতার পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক রূপে দেখা দেয়। কোন সদ্য গড়ে ওঠা দেশে চলে যায় তারা এবং সেখানে খুবই কার্যকরী পথিকৃতের ভূমিকা-পালন থাকে। অসংযম ব্যাপারটা মানুষকে

দারুণ ভাবে ক্ষইয়ে দেয়। এটা এতদূর ক্ষতিকর যে, ত্রিশ বছর বয়সের সময় অসংযমী ব্যক্তিদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল থাকে আর মাত্র ১৩.৮ বছর, আর ঐ একই বয়সকালে ইংল্যান্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল থাকে আরও ৪০.৫৯ বছর। অসচ্চরিত্র নারীরা খুব বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে না, আর অসচ্চরিত্র পুরুষরা প্রায়শই বিবাহ করে না। এই ধরণের নারী-পুরুষ উভয়েই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। গৃহপালিত পশুদের বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে, স্পষ্টতই নিকৃষ্টতর পশুগুলির বাতিল হয়ে যাওয়াটা তাদের অগ্রগতির পথে যথেষ্টই গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার। যে-সব ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য পূর্বানুবৃত্তির সাহায্যে বার বার ফিরে আসে, সেগুলির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে সত্য ; যেমন, ভেড়াদের গায়ের কালো রঙ। অনেকসময় মানুষের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু খারাপ স্বভাব কোনরকম নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই কোন কোন পরিবারেয় মধ্যে দেখা দেয়, আর তা এক বন্য দশার পূর্বানুবৃত্তির দ্যোতকও হয়ে উঠতে পারে—বন্যদশা থেকে আমরা তো এখনও খুব বেশি এগিয়ে আসিনি! এই ভাবনাটাই ফুটে ওঠে চালু প্রবচনের মধ্যে। চালু প্রবচনে বলা হয়—এ-সব লোক হচ্ছে পরিবারের কালো ভেড়া (অর্থাৎ কলঙ্ক)। সুসভ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে নৈতিকতার উচ্চ মান, আর বেশি সংখ্যক যথেষ্ট ভালো মানুষ থাকার ব্যাপারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তেমন কোন ভূমিকা নেই। অবশ্য একেবারে বুনিয়াদী সামাজিক প্রবৃত্তিগুলিকে মানুষ প্রথম অর্জন করেছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই। কিন্তু কোন্ কোন্ কারণ সমূহ আমাদের নৈতিকবোধকে উন্নত করে তোলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করে এসেছি নিম্নতর জাতিগুলির কথা বলবার সময়। যে কারণগুলির কথা আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলি হল—অন্যান্য মানুষদের অনুমোদন, দৃষ্টান্ত ও অনুকরণ, চিন্তাশক্তি, অভিজ্ঞতা, এমনকি আত্মস্বার্থ, অল্প বয়সে প্রাপ্ত বিভিন্ন নির্দেশ ও ধর্মীয় অনুভূতি।

সুসভ্য দেশগুলিতে সব দিক থেকে উন্নতশ্রেণীর মানুষদের সংখ্যা বেড়ে চলার পথে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাধার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন মিঃ গ্রেগ এবং মিঃ গ্যাল্টন। বাধাটা হল এই যে, অতি দরিদ্র ও বেপরোয়া লোকেরা, প্রায়শই যারা নানা কদভ্যাসে লিপ্ত থাকে, প্রায় সবসময়ই অল্প বয়সে বিবাহ করে তারা, আর অন্যদিকে সাবধানী ও মিতব্যয়ী লোকেরা, যারা সাধারণত নীতি-পরায়ণ হয়, তারা বিবাহ করে একটু বেশি বয়সে, যাতে করে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ভরণ-পোষণ ভালোভাবে চালানো যায়। ডঃ ডান্কান দেখিয়েছেন, যারা অল্পবয়সে বিবাহ করে, তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

শুধু যে বেশি সংখ্যক প্রজন্ম বা পুরুষ (পুত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি) সৃষ্টি করে তা-ই নয়, তারা অনেক বেশি সন্তানেরও জন্ম দেয়। তাছাড়াও, মায়েদের পরিপূর্ণ যৌবনকালের সন্তানদের থেকে অল্প বয়সের সন্তানরা বেশি হৃষ্টপুষ্ট ও আয়তনে বড় হয়, ফলে সম্ভবত তাদের জীবনীশক্তিও বেশি হয়। তাই সমাজের বেপরোয়া, মর্যাদাহীন ও অনেক সময় অসৎ ব্যক্তিরা বিচক্ষণ ও সুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে। মিঃ গ্রেগ ব্যাপারটাকে এইভাবে বলেছেন : "অসতর্ক, দারিদ্র্যপীড়িত, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন আইরিশরা খরগোশের মত বংশবৃদ্ধি করে চলে, আর মিতব্যয়ী, দূরদর্শী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্কটরা, যারা নৈতিকতায় অবিচল, উচ্চস্তরের চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাসী, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তায় সুশৃঙ্খল—তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটায় সংগ্রাম করে, কৌমার্য বজায় রেখে; তারা বিবাহ করে দেরিতে, এবং খুব বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয় না। কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যদি এক হাজার স্যাক্সন আর এক হাজার কেল্ট থাকে, তাহলে দেখা যাবে দশ-বারো প্রজন্মের মধ্যেই ঐ এলাকার মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ হয়ে গেছে কেল্টরা, কিন্তু যাবতীয় সম্পত্তি, ক্ষমতা, মননশক্তির ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ চলে গেছে ঐ এক-ষষ্ঠাংশ স্যাক্সনদের হাতে। চিরন্তন সেই 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে' নিকৃষ্টতর ও কম সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা জাতিরাই টিকে থেকেছে। তবে এই টিকে থাকাটা তাদের ভালো গুণাবলীর ফল নয়, বরং তাদের দোষ-ত্রুটিগুলিই টিকিয়ে রেখেছে তাদেরকে।"

তবে এই নিম্নমুখী প্রবণতার কিছু প্রতিরোধক ব্যবস্থাও আছে। আমরা দেখেছি, অসংযমীদের মৃত্যুর হার বেশি হয়, আর অসচ্চরিত্র ব্যক্তিরা খুব বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। দরিদ্রতম শ্রেণীর লোকেরা শহরে এসে জড়ো হয়, এবং স্কটল্যান্ডের দশ বছরের পরিসংখ্যান থেকে ডঃ স্টার্ক প্রমাণ দেখিয়েছেন যে যে-কোন বয়সেই গ্রামের থেকে শহরে মৃত্যুর হার অনেক বেশি, 'এবং জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুর হার গ্রামের তুলনায় শহরে প্রায় দ্বিগুণ।' ধনী ও দরিদ্র, উভয়ের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। ফলে, নিজেদের লোকসংখ্যার হার বজায় রাখার জন্য শহরের অতি দরিদ্র বাসিন্দাদের গ্রামের অতি দরিদ্র বাসিন্দাদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি সন্তানের জন্ম দিতে হবে। মেয়েদের খুব কম বয়সে বিবাহ হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্যাপার। ফ্রান্সে দেখা গেছে যে, "এক বছরে যতজন অবিবাহিতা নারী মারা গেছে, তার থেকে দ্বিগুণ সংখ্যক বিবাহিতা রমণীর মৃত্যু হয়েছে।" কুড়ি বছরের কম বয়সী বিবাহিত পুরুষদের মৃত্যুর হারও "অত্যন্ত

বেশি।"[২] তবে এর ঠিক কারণ কী, তা বলা মুস্কিল। শেষত, যে-সব পুরুষ স্বচ্ছন্দে নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ করার অবস্থায় না-আসা পর্যন্ত সুচিন্তিতভাবেই বিবাহ করে না, তারা যদি পূর্ণ যৌবনবতী মেয়েদের বিবাহ করত (যা তারা প্রায়শ করেও থাকে), তাহলে উন্নততর শ্রেণীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যদের চেয়ে খুব একটা কম হত না।

১৮৫৩ সালে সংগৃহীত প্রচুর পরিমাণ তথ্য থেকে দেখা যায়, সারা ফ্রান্সে কুড়ি থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত লোকদের মৃত্যুর হার বিবাহিত লোকদের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। যেমন, কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জন অবিবাহিতর মধ্যে এক বছরে মারা গিয়েছিল ১১.৩ জন আর ঐ বয়সী বিবাহিতদের মধ্যে মারা গিয়েছিল মাত্র ৬.৫ জন।[৩] ১৮৬৩ এবং ১৮৬৪ সালে স্কটল্যাণ্ডের কুড়ি বছরের বেশি বয়সী সমস্ত লোকেদের মধ্যেও এই একই নিয়ম চোখে পড়েছিল। যেমন, কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সী প্রতি ১০০০ জন অবিবাহিতর মধ্যে এক বছরে মারা গিয়েছিল ১৪·৯৭ জন, আর ঐ বয়সী বিবাহিতদের মধ্যে মারা গিয়েছিল মাত্র ৭.২৪ জন, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম।[৪] ডঃ স্টার্ক এ-ব্যাপারে বলেছেন, "কোন অস্বাস্থ্যকর কাজে নিযুক্ত থাকা, অথবা নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যেখানে কোনদিন কোনরকম চেষ্টা করা হয় নি, এমন কোন অস্বাস্থ্যকর বাড়ি বা অঞ্চলে বসবাস করার চেয়েও অবিবাহিত থাকা জীবনের পক্ষে অনেক ক্ষতিকর।" তাঁর মতে, মৃত্যুর হার কমে যাওয়াটা হচ্ছে "বিবাহের এবং তার ফলস্বরূপ গড়ে ওঠা বিভিন্ন নিয়মিত অভ্যাসেরই" প্রত্যক্ষ ফলাফল। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে অসংযমী, অসচ্চরিত্র ও অপরাধী শ্রেণীর লোকেদের আয়ুষ্কাল কম হয় এবং তারা সাধারণত বিবাহ করে না; এইসঙ্গেই আমরা মেনে নিতে পারি যে ক্ষীণজীবী, অসুস্থ কিম্বা দেহ বা মনের কোন দারুণ দুর্বলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই বিবাহে গররাজি অথবা প্রত্যাখ্যাত হয়। ডঃ স্টার্ক সম্ভবত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন

২। হ্যাকেল্‌ও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। দ্রষ্টব্য, ভারচৌ-এর "Sammlung, gemein. wissen. vortage", ১৮৬৮, পৃঃ ৬১ তে "ueber die Entstehung des Menschengeschlechts". এছাড়াও দ্রষ্টব্য তাঁর "Naturliche Schöpfungs-geschichte", ১৮৬৮, যেখানে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩। ডঃ ফার, পূর্বোল্লিখিত রচনা। উদ্ধৃত কথাগুলি ঐ চমৎকার রচনাটি থেকেই নেওয়া হয়েছে।

৪। এখানে আমি "দ্য টেন্‌থ্‌ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ বার্থস, ডেথস্ এট্‌সেট্রা ইন স্কটল্যাণ্ড" রচনায় প্রদত্ত পঞ্চবার্ষিক গড় হিসাব থেকেই এই হিসাবটি গ্রহণ করেছি।

যে, বিবাহ হচ্ছে দীর্ঘ জীবনলাভের একটি প্রধান কারণ, কারণ তিনি দেখেছিলেন অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতরা বেশিদিন বাঁচে। কিন্তু আমরা সকলেই এমন অনেক মানুষের কথা জানি, যারা তাদের দুর্বল স্বাস্থ্যের দরুণ যৌবন-কালে বিবাহ না করেও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকেছে। অবশ্য সারা জীবন তারা হয়ত দুর্বলই থেকেছে, ফলে বেঁচে থাকার বা বিবাহ করার সম্ভাবনাও তাদের সবসময় কমই থেকেছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও আপাতভাবে ডঃ স্টার্কের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। ঘটনাটি হল—ফ্রান্সে বিবাহিতদের চেয়ে বিধবা ও বিপত্নীকদের মৃত্যুর হার অনেক বেশী। কিন্তু ডঃ ফার-এর মতে এই ঘটনার কারণটা এ-রকম ঃ স্বামী বা স্ত্রী-র মৃত্যুতে পরিবারে ভাঙন ধরে, দেখা দেয় দারিদ্র্য, নানান কু-অভ্যাস, ঘনিয়ে আসে বিষাদ; ফলে, বিধবা নারী বা বিপত্নীক ব্যক্তিটির মৃত্যুও এগিয়ে আসে কয়েক কদম। মোটের ওপর, ডঃ ফার-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের মৃত্যুর হার কম হওয়া, যাকে এক সাধারণ নিয়ম বলেই মনে হয়, "তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, ত্রুটিপূর্ণ মানুষরা পৃথিবী থেকে প্রতিনিয়তই বাতিল হয়ে যায়, আর প্রতিটি প্রজন্মের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে সবথেকে ভালোভাবে টিকে থাকে;" এই নির্বাচন শুধু বিবাহিত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত, আর তা সমস্ত রকম দৈহিক, মননগত ও নৈতিক গুণাবলীকেও প্রভাবিত করে।[৫] কাজেই, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি—যে-সব সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মানুষ তাদের দূরদর্শিতার কারণে বেশ কিছুদিন অবিবাহিত থাকে, তাদের মৃত্যুর হার মোটেই খুব বেশি নয়।

শেষ দুটি অনুচ্ছেদে যে-সব প্রতিবন্ধকের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলি, এবং সম্ভবত আরও কিছু আজও-অজানা প্রতিবন্ধক যদি সমাজের উৎকৃষ্টতর মানুষদের তুলনায় বেপরোয়া, দুশ্চরিত্র ও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিদের দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধিকে প্রতিহত না করত, তাহলে যে-কোন জাতির অধঃপতন ঘটত—পৃথিবীর ইতিহাসে যা প্রায়শই ঘটেছে। মনে রাখা দরকার, প্রগতি কোন অপরিবর্তনীয় নিয়ম হয়। কোন একটি সভ্য জাতি কেন অপর একটি জাতির তুলনায় বেশি উন্নত হয়, বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে বা অনেক বড় অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, কিম্বা কোন একটা সময়ে কিভাবেই বা তারা অন্য একটি জাতির

৫। এ ব্যাপারে ডঃ ডান্‌কান বলেছেন (দ্রষ্টব্য, "ফেকানডিটি, ফার্টিলিটি" ইত্যাদি, পৃঃ ৩৩৪), "সমস্ত যুগেই স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর মানুষরা বিবাহিতদের দলে নাম লেখায়, আর দুর্বল ও দুর্ভাগারা পড়ে থাকে অবিবাহিতের সারিতে।"

থেকে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে ওঠে—তা বলা খুবই কঠিন। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, এই গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে তাদের প্রকৃত জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর, উঁচু মানের মননগত ও নৈতিক গুণসমৃদ্ধ মানুষদের সংখ্যার ওপর, এবং তাদের উৎকর্ষতার ওপর। শারীরিক শক্তি মানুষের মানসিক শক্তির ওপর যেটুকু প্রভাব ফেলে, সেটুকু ছাড়া শারীরিক কাঠামোর আর কোন ভূমিকা এক্ষেত্রে থাকে না।

বেশ কিছু লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, যদি সত্যিই কোন ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে প্রাচীনকালের গ্রীকদের পক্ষে আরও উন্নত হওয়া, সংখ্যায় আরও বেড়ে ওঠা এবং গোটা ইওরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ পৃথিবীর যে-কোন জাতির তুলনায় মননশীলতার দিক থেকে গ্রীকরা ছিল অনেক উন্নত। দৈহিক গঠনের ব্যাপারে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, মন আর শরীরের মধ্যে নাকি অবিরাম বিকশিত হয়ে চলার একটা প্রবণতা থাকে। পূর্বোক্ত লেখকদের বক্তব্যে এই অনুমানেরই অব্যক্ত ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু যে-কোন ধরণের বিকাশই আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন অনুকূল অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নির্বাচন কেবলমাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য করে তাতে। কোন কোন ব্যক্তি বা জাতি কিছু কিছু বিরাট সুবিধা অর্জন করা সত্ত্বেও অন্যান্য গুণ অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। গ্রীকদের পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণই থাকতে পারে, যেমন, বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের অভাব, গোটা দেশটার আয়তন খুব ছোট হওয়া, দাসপ্রথার কুফল, কিম্বা অত্যধিক যৌনলালসা। কেননা, "একেবারে শক্তিহীন ও মজ্জায় মজ্জায় কলুষিত" না হওয়া পর্যন্ত তাদের পতন ঘটেনি। আজকের ইওরোপের পশ্চিমী জাতিগুলি, যারা তাদের বন্য পূর্বপুরুষদের থেকে বহুগুণ উন্নত হয়ে সভ্যতার শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা তাদের এই উৎকৃষ্টতার জন্য প্রাচীন গ্রীকদের উত্তরাধিকারের কাছে আদৌ ঋণী নয় (বা সে ঋণের পরিমান খুবই সামান্য)। অবশ্য গ্রীকদের লিখিত সাহিত্যের কাছে তাদের ঋণ অপরিসীম।

যে স্পেনীয় জাতি একদা অত শক্তিশালী ছিল, তারা কেন সময়ের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ল—তা কি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন ? অন্ধকার যুগের বুক চিরে ইওরোপিও জাতিগুলির অভ্যুদয়ও এক জটিল সমস্যা। মিঃ গ্যাল্টন বলেছেন, সেই যুগে যে-সব শান্ত-ভদ্র মানুষ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা বা মানসিক চর্চা করত, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই চার্চের শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না, আর প্রত্যেক চার্চই তার শরণাগতদের কাছে চিরকৌমার্য দাবী

করত।[৬] প্রতিটি পরম্পরাগত প্রজন্মের ওপর এ ঘটনা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। ঐ সময়েই 'পবিত্র ইন্‌কুইজিশন' (ধর্মীয় বিচার) সবথেকে স্বাধীনচেতা ও সাহসী মানুষদের খুঁজে বার করে তাদেরকে পুড়িয়ে মারত বা কারারুদ্ধ করত। শুধুমাত্র স্পেনেই তিনশো বছরের মধ্যে প্রতি বছর হাজার জন করে শ্রেষ্ঠ মানুষকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, যারা বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত, প্রশ্ন তুলত, আর সন্দেহই মানুষকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। এইভাবে ক্যাথলিক চার্চ সভ্যতার অপরিমেয় ক্ষতি করেছিল, যদিও সে ক্ষতি নিশ্চয়ই কোন-না-কোন উপায়ে অনেকটাই পূরণও হয়ে গিয়েছিল। এই ক্ষতি সত্ত্বেও কিন্তু ইওরোপ এক তুলনাহীন প্রগতির পথ বেয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে।

ইওরোপের অন্যান্য জাতিগুলির তুলনায় উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে ইংরেজদের বিপুল সাফল্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের "নির্ভীক ও অবিচল কর্মশক্তি"-কে। ইংল্যান্ডের কানাডিয়নদের এবং ফরাসীদের অগ্রগতির তুলনা করলে এ-কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে ইংরেজরা তাদের এই কর্মশক্তি অর্জন করেছিল, তা কি কেউ বলতে পারে? বরং এ-কথাটার আপাত সত্যতা অনেক বেশি যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর অগ্রগতি আর সেখানকার লোকেদের চরিত্রগত উৎকর্ষতা হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই ফল। কেননা ইওরোপের সমস্ত দেশ থেকে বিগত দশ-বারো প্রজন্মের উদ্দীপনাময় কর্মচঞ্চল ও সাহসী লোকেরা আমেরিকায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে, আর নানা কাজে দারুণ সফল হয়েছে। সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপারে রেভারেন্ড মিঃ জিঙ্কে-র কথাটা মোটেই কোন অতিশয়োক্তি নয়। তিনি বলেছিলেন: "পশ্চিমের দিকে প্রচুর পরিমাণ অ্যাংলো-স্যাক্সনের দেশান্তরী হওয়ার সঙ্গে····সম্পর্কিত করে অথবা তার সহায়ক হিসাবে অন্য সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করলে—যেমন গ্রীসে চিন্তা-ভাবনার চর্চায় বা রোমে যা ঘটেছিল—সেগুলিকে শুধুমাত্র কিছু উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের সমষ্টি বলেই মনে হয়।" সভ্যতা কিভাবে অগ্রসর হয়েছে, তা আমাদের কাছে আজও অস্পষ্ট। কিন্তু

৬। "হেরিডিটারি জিনিয়াস", পৃঃ ৩৫৭-৩৫৯। বিপরীত যুক্তি দিয়েছেন রেভারেণ্ড এফ. ডব্লিউ ফারার (দ্রষ্টব্য, "ফ্রেজার'স্ ম্যাগ.", ১৮৭০, পৃঃ ২৫৭)। স্যার সি. লায়েল একটি চিত্তাকর্ষক রচনায় (দ্রষ্টব্য, "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অফ জিওলজি", খণ্ড ২, পৃঃ ৪৮৯) 'পবিত্র ইন্‌কুইজিশন'-এর কুফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, ঐ ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ বেয়ে ইওরোপে বুদ্ধিমত্তার সাধারণ মানকে অনেক নিচু করে দিয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

এটুকু অন্তত বোঝা যায়, বেশ দীর্ঘ একটা সময়ের মধ্যে যে জাতি সবথেকে বেশি সংখ্যক উন্নত মননসম্পন্ন, কর্মচঞ্চল, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও পরোপকারী মানুষের জন্ম দিতে পেরেছে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এ-সব ব্যাপারে তাদের থেকে নিকৃষ্ট জাতিগুলির থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে।

টিকে থাকার জন্য যে সংগ্রাম, তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। আবার, এই টিকে থাকার সংগ্রাম সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলার ফল হিসাবেই। মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলে, তা অনেক দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য বর্বর গোষ্ঠীগুলি তাদের সদ্যোজাত শিশুদের হত্যা করা ও আরও কিছু ক্ষতিকর কাজ করে থাকে, আধা সুসভ্য জাতিগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেখা দেয় চরম দারিদ্র, আজীবন কৌমার্য, এবং সংযমী লোকেদের বিলম্বে বিবাহ। কিন্তু নিম্নতর প্রাণীদের মত একই শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি মানুষের মধ্যেও কাজ করে, তাই টিকে থাকার সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত ক্ষয়ক্ষতি তাকেও আক্রমণ করবে না—এমন আশা সে করতে পারে না। প্রাচীন যুগে মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি ক্রিয়া না করত, তাহলে সে কখনই আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছতে পারত না। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এমন প্রচুর উর্বর জমি আছে যা স্বচ্ছন্দে বহু পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু এ-রকম অনেক জায়গাতেই কিছু ভ্রাম্যমান বন্য জাতি ছাড়া আর কেউ বসবাস করে না। এ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, টিকে থাকার সংগ্রাম মানুষকে তার সর্বোচ্চ মানে উঠে আসতে বাধ্য করার মত তীব্র কখনই ছিল না। মানুষ এবং নিম্নতর প্রাণীদের সম্বন্ধে আমরা যে-টুকু জানতে পেরেছি, তা থেকে বলা যায়—প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সুদৃঢ় ভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের মননগত ও নৈতিক ক্ষমতায় সর্বদাই নানান পরিবর্তন ঘটে চলত। এ রকম অগ্রগতির জন্য যে বেশ কিছু অনুকূল আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি দরকার হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে না চললে এবং তার ফল স্বরূপ টিকে থাকার সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র হয়ে না উঠলে, সবথেকে অনুকূল পরিস্থিতিও অগ্রগতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে কিনা—সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। ধরা যাক, দক্ষিণ আমেরিকার কোন্ কোন্ জায়গায় বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে যাদেরকে সুসভ্য বলা যায় (যেমন—স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা), তাদের সম্বন্ধে আমরা যা জানি, তা থেকে এমনকি এ-ও মনে হতে পারে যে, জীবনযাপনের অবস্থা খুব সহজ হয়ে গেলে তারা পরিশ্রম

বিমুখ হয়ে যায় আর পিছিয়ে পড়ে। অত্যন্ত সুসভ্য জাতিগুলির অবিরাম অগ্রগতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর খুব একটা নির্ভর করে না, কারণ বন্য গোষ্ঠীগুলির মত এই সব জাতিরা একে অপরকে উচ্ছেদ ও ধ্বংস করে না। তা সত্ত্বেও কোন জাতির অধিকতর বুদ্ধিমান সদস্যারা তুলনায় নিকৃষ্টদের চেয়ে জীবনে বেশি সফল হয়, অনেক বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যায়, আর এটা আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই একটা রূপ। প্রগতির সবথেকে কার্যকরী কারণগুলি হল অল্প বয়স থেকে (যখন মানুষের মস্তিষ্কে যে-কোন জিনিষ সবথেকে বেশি ছাপ ফেলে) শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আর উচ্চমানের চিন্তাভাবনা। এই শিক্ষার উদ্গাতা হন সমাজের সবথেকে সক্ষম ও শ্রেষ্ঠ মানুষরা, তা মূর্ত হয়ে ওঠে জাতির আইন, প্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যে, এবং জনমত তাকে বাস্তবে রূপ দেয়। তবে, মনে রাখা দরকার, এই জনমতের ব্যাপারটা নির্ভর করে অন্যদের অনুমোদন ও অননুমোদনকে আমরা কতখানি উপলব্ধি করতে পারি, তার উপরেই। এই উপলব্ধি আবার গড়ে ওঠে আমাদের সহানুভূতিবোধের উপর ভিত্তি করে, আর আমাদের এই সহানুভূতিবোধ যে আদতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক প্রবৃত্তির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গড়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্ত সুসভ্য জাতিই যে এক সময় বর্বর অবস্থায় ছিল, তার প্রমাণ প্রসঙ্গে : এই বিষয়টি নিয়ে স্যার জে. লুবক, মিঃ টাইলর, মিঃ ম্যাক্লেনান ও অন্যান্যরা যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ এবং চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাই এখানে আমি শুধু তাঁদের গবেষণার একটা ছোট্ট সারসংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিককালে ডিউক অফ আর্জিল এবং এর আগে আর্কবিশপ হোয়েট্লি বলেছেন—মানুষ সুসভ্য হয়েই পৃথিবীতে এসেছে, আর আজ যারা বন্য অবস্থায় রয়েছে, তারা আসলে নানান অধঃপতনের ফলেই ঐ দশায় গিয়ে পেঁছেছে। এই অনুমানের বিপরীত কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের তুলনায় এঁদের যুক্তিকে বেশ দুর্বল বলেই মনে হয়েছে আমার। এটা সত্যি যে অনেক জাতি তাদের সভ্য অবস্থা বজায় রাখতে পারেনি, এমনকি কোন কোন সভ্য জাতি হয়ত চূড়ান্ত বর্বরতার অন্ধকারেও তলিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, যদিও এই শেষোক্ত ঘটনাটির কোন প্রমাণ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। কিছু বিজয়ী গোষ্ঠীর চাপে পড়েই সম্ভবত ফুজিয়ানরা এক কঠিন, দুর্গম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তারা যে ব্রাজিলের সব থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাসকারী বোটোকিউডোদের চেয়েও নিচে নেমে গিয়ে-

ছিল, তা প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়।

সমস্ত সুসভ্য জাতি যে বর্বরদেরই উত্তরপুরুষ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দু'রকম-ভাবে। একদিকে, সভ্য জাতিগুলির মধ্যে আজও চালু থাকা বিভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস, ভাষা ইত্যাদির মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলি সাক্ষ্য দেয় যে কোন এক সময় তারা নিম্ন অবস্থাতেই ছিল; অন্যদিকে, বন্যরা যে নিজেদেরকে সভ্যতার পথে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবং নিয়ে গেছেও— তারও নানান প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রমাণগুলি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক, তবে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের গণনা-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। কোন কোন জায়গায় আজও ব্যবহার করা হয় এমন কিছু শব্দের উল্লেখ করে মিঃ টাইলর স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, এই পদ্ধতিটা প্রথমে শুরু হয়েছিল আঙুল গোনা দিয়ে। প্রথমে গোনা হত এক হাতের আঙুল, তারপর অপর হাতের, আর সবশেষে পায়ের আঙুল। আমাদের দশমিক পদ্ধতির মধ্যে এবং রোমানদের সংখ্যা লেখার পদ্ধতিতে আজও এর ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। রোমান সংখ্যামালার V (অর্থাৎ ৫) চিহ্নটিকে মানুষের হাতের একটা সংক্ষিপ্ত বা সাঙ্কেতিক চিত্র বলেই মনে করা হয়। এই V-এর পর আসে VI (অর্থাৎ ৬) ইত্যাদি, যেখানে নিঃসন্দেহেই একটা হাতের পর অপর হাতটাকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আবার, "তিন-কুড়ি দশ বলার সময় আমরা ভাইজেসিম্যাল (vigesimal) পদ্ধতিই অনুসরণ করি, যেখানে এক-কুড়ি বলতে ২০ বোঝানো হয়। কোন মেক্সিকান বা ক্যারিবিয়ান হলে এটাকে 'একজন মানুষ' বলেই উল্লেখ করত।"[৭] বেশ কিছু ভাষাতত্ত্ববিদ বলেছেন, প্রতিটা ভাষার মধ্যেই তার ধীর ও ক্রমান্বয় বিবর্তনের নিদর্শন থেকে যায়। লিখনশৈলীর ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য, কেননা এক সময় ছবির সাহায্যে যে-কোন জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করত মানুষ, আর তারই পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে এক একটা অক্ষর। মিঃ ম্যাকলেনানের রচনা[৮] পড়ার পর আর কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না যে গায়ের জোরে স্ত্রী সংগ্রহ করার মত নানান আদিম অভ্যাসের ছাপ আজও প্রায় প্রতিটি সভ্য জাতির মধ্যে রয়ে

৭। রয়্যাল ইনস্টিটিউশন অফ গ্রেট ব্রিটেন", ১৫ মার্চ, ১৮৬৭. এছাড়াও দ্রষ্টব্য, "রিসার্চেস ইনটু দ্য আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যান্‌কাইণ্ড", ১৮৬৫।

৮। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ।" দ্রষ্টব্য, "হোমারের রচনায় এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রাপ্ত নরবলি সংক্রান্ত সাক্ষ্য" প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যাফহউসেন্‌-এর মন্তব্য ("অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল রিভিয়ু", অক্টোবর ১৮৬৯, পৃঃ ৩৭৩)।

গেছে। ম্যাক্‌লেনান প্রশ্ন তুলেছেন—প্রাচীনকালে এমন কোন জাতি ছিল কি, যাদের মধ্যে আদতে এক-বিবাহ প্রথা চালু ছিল? যুদ্ধের নিয়ম ও অন্যান্য প্রথা, যার নিদর্শন আজও চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায় ন্যায় সংক্রান্ত আদিম ধারণাও অত্যন্ত অমার্জিত ধরণের ছিল। আজকের দিনের অনেক কুসংস্কার আসলে অতীতের ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসেরই অবশেষ মাত্র। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন আর ন্যায়পরায়নতাকে ভালোবাসেন—এই চমৎকার ভাবনাটা, ধর্মের এই সর্বোচ্চ রূপটা আদিম যুগে চালু ছিল না।

এবার অন্য ধরণের প্রমাণের দিকে তাকানো যাক। স্যার জে. লুবক দেখিয়েছেন, কোন কোন বন্য গোষ্ঠীর কিছু কিছু সাদামাটা কলা-কৌশল সাম্প্রতিককালে খানিকটা উন্নত হয়েছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যদের মধ্যে চালু থাকা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশলের যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা থেকে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, সম্ভবত একমাত্র আগুন জ্বালানোর কৌশলটা বাদে এ-রকম আর সব জিনিস প্রতিটা বন্য গোষ্ঠী আলাদা আলাদা ভাবেই আবিষ্কার করেছিল। এ-রকম স্বাধীন আবিষ্কারের একটা চমৎকার নমুনা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুমেরাং। বাইরের লোকেরা যখন প্রথম তাহিতিতে যায়, তখন অন্যান্য পলিনেশিয় দ্বীপের অধিবাসীদের চেয়ে তাহিতির লোকেরা বহু ব্যাপারেই অনেক এগিয়ে ছিল। পেরু বা মেক্সিকোর অ-সভ্য অধিবাসীদের উন্নত কৃষ্টি বিদেশ থেকে আমদানী করা, এমনটা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ঐ-সব জায়গায় অনেক দেশজ গাছপালার চাষ করা হত, এবং কয়েক ধরণের স্থানীয় জীবজন্তুকে পোষ মানাতেও শিখেছিল তারা। অধিকাংশ ধর্ম-প্রচারকের অত্যল্প প্রভাবের ব্যাপারটা বিবেচনা করে আমাদের মনে রাখা দরকার, কোন অর্ধ-সভ্য দেশের একদল ভ্রাম্যমান লোক আমেরিকার উপকূলে গিয়ে পেঁছিলেও সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে না। একমাত্র তখনই এ-রকম প্রভাব ফেলা সম্ভব, যদি তারা আগে থাকতেই কিছুটা উন্নত অবস্থায় থেকে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন পথরেখায় চোখ রাখলে আমরা দুটি যুগের ছবি দেখি: প্রত্নপ্রস্তর যুগ আর নব্যপ্রস্তর যুগ (স্যার জে. লুবকের পরিভাষা অনুযায়ী)। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে যন্ত্রপাতিকে ঘষে ঘষে মসৃণ করার কৌশলটা কোন জাতি অপর কোন জাতির কাছ থেকে শিখেছিল, এ-রকম দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। ইওরোপের সর্বত্র, সেই সুদূর পূর্বে গ্রীস পর্যন্ত, ওদিকে পালেস্তাইন, ভারতবর্ষ, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ঈজিপ্ট সহ সারা আফ্রিকায়—সর্বত্রই প্রচুর

পরিমাণ পাথুরে যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ-সব জায়গার আজকের দিনের বাসিন্দারা আর ও-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। চীনারা এবং প্রাচীনকালের ইহুদীরাও যে একসময় ঐ-সব জিনিস ব্যবহার করত, তারও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে; ঐ-সব দেশের অধিবাসীরা, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র সভ্য দুনিয়াই, একসময় বর্বর অবস্থায় ছিল। একেবারে প্রথম থেকেই মানুষ সুসভ্য ছিল আর তারপর এতসব জায়গায় তার চূড়ান্ত অধঃপতন ঘটেছিল—এ ধরণের মনোভাব মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক মাত্র। বরং এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই অনেক বেশি সত্য, বেশি উৎসাহব্যঞ্জক যে, মানব-ইতিহাসে প্রগতিই হচ্ছে সার্বজনীন চিত্র, অধোগতি নয়। খুবই হীন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে, কঠিন পথে পা ফেলে ফেলে, মানুষ আজ উঠে এসেছে জ্ঞান, নীতিবোধ ধর্মের সর্বোচ্চ শিখরে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষের সাদৃশ্য এবং বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে

জীবজগতের ধারাবাহিকতায় মানুষের স্থান—বংশবৃত্তান্তের প্রাকৃতিক নিয়ম—কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অভিযোজনমূলক চরিত্র—মানুষ ও চতুষ্পদী প্রাণীদের মধ্যেকার বিভিন্ন ছোটখাট সাদৃশ্য—প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় মানুষের স্থান—মানুষের উদ্ভবের স্থান ও মানুষের প্রাচীনত্ব—জীবাশ্মগত সংযোগসূত্রের অনুপস্থিতি—মানুষের বংশবৃত্তান্তের নিম্নতর স্তর, যা জানা যায় প্রথমত অন্যদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থেকে এবং দ্বিতীয়ত তার দৈহিক গঠন থেকে—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আদি উভয়লিঙ্গ অবস্থা—উপসংহার।

কিছু কিছু প্রাণীবিজ্ঞানী বলেন, মানুষ আর তার সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য-যুক্ত প্রাণীদের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। এই কথাটা যদি আমরা মেনেও নিই, আর সেইসঙ্গেই যদি মেনে নিই যে মানুষ এবং ঐ-সব প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, তাহলেও, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলির আলোচনার ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায়—কোন নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকেই মানুষ উদ্ভূত হয়েছে, যদিও তার সংযোগ-সূত্রগুলি আজও পর্যন্ত অনা বিষ্কৃত থেকে গেছে।

মানুষের মধ্যে অসংখ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ধরণের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যে-সব সাধারণ কারণসমূহের দরুণ এইসব পরিবর্তন ঘটে থাকে, যে-সব সাধারণ নিয়মের দ্বারা এগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তার নিয়ম-পদ্ধতি মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে একই। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে উঠেছে বলে তাদের জীবনে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক নির্বাচন খুব কঠোর চেহারা নিয়েছে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বহু জাতি। এ-রকম কিছু কিছু জাতির পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্য এত বিপুল যে প্রাণীবিজ্ঞানীরা অনেক সময় এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসাবেও চিহ্নিত করে থাকেন। মানুষের শারীরিক গঠন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতোই সমতাবিশিষ্ট। তার ভ্রূণগত বিকাশও একইরকম দশার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তার শরীরের মধ্যে এমন অনেক লুপ্তপ্রায় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে, যেগুলি একসময় নিশ্চয়ই কার্যকরী ছিল্। মানুষের মধ্যে অনেক সময় এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে; যে-সব বৈশিষ্ট্য তার আদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে

ছিল বলে মেনে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। মানুষের উদ্ভবের ইতিহাস অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর উদ্ভবের ইতিহাসের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলে, এইসব ঘটনাকে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু মানুষের উদ্ভবের ইতিহাসকে অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর উদ্ভবের ইতিহাসের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। অন্যদিকে, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মানুষও যদি কোন অজানা ও নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে—তাহলে এইসব ঘটনাকে অনেকটাই উপলব্ধি করা যায়।

মানুষের মানসিক ও আত্মিক শক্তির কথা বিবেচনা করে কোন কোন প্রাণীবিজ্ঞানী সমগ্র সজীব জগৎকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন : মানব জগৎ, জীবজগৎ আর উদ্ভিদজগৎ। অর্থাৎ, মানুষকে তাঁরা একটা স্বতন্ত্র জায়গা দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রাণীর আত্মিক শক্তির মধ্যে তুলনা করা বা সেগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করাটা প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাজ নয়। বরং তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করতে পারেন (আমি যেমন করেছি) যে, মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপুল মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও, আদতে সেই ক্ষমতার একই ধরণ। মাত্রাগত পার্থক্য যত বেশিই হোক না কেন, তা মানুষকে একটা স্বতন্ত্র বর্গ হিসাবে চিহ্নিত করাটাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে পারে না। এই ব্যাপারটা সবথেকে ভালোভাবে বোঝা যায় দুটি পোকার, যেমন জাব পোকা (Scale-inscet homopterous tanily coecus) এবং একটি পিঁপড়ের, মানসিক ক্ষমতার মধ্যে তুলনা করলে। এদের মানসিক ক্ষমতা নিঃসন্দেহে একই জাতের। মানুষ আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে যতটা পার্থক্য থাকে, তার থেকে অনেক বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে ঐ-সব জাব পোকা আর পিঁপড়েদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে—অবশ্য এই পার্থক্যটা কিছুটা অন্য ধরণের। স্ত্রী-পোকা তার তরুণাবস্থায় নিজের হুল বা শুঁড়ের সাহায্যে কোন উদ্ভিদের গায়ে আঁকড়ে ধরে এবং রস শোষণ করে, একদম নড়া-চড়া না করে গর্ভবতী হয়ে ডিম পাড়ে ; ব্যস, এই হচ্ছে তাদের সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত। অন্যদিকে, পিয়ের হুবার দেখিয়েছেন, শ্রমিক-পিঁপড়েদের অভ্যাস আর মানসিক ক্ষমতা বর্ণনা করার জন্য একটা বিরাট বই লেখা দরকার, তবে আমি শুধু কয়েকটি বিষয়কে সংক্ষেপে তুলে চাই। খুব জোর দিয়েই বলা চলে যে পিঁপড়েরা নিজেদের মধ্যে খবরা-খবর আদান-প্রদান করে, এবং কোন একটা কাজ করার জন্য কিম্বা খেলা করার জন্য অনেক পিঁপড়ে একজোট হয়। বেশ কয়েক মাস পরে দেখা হলেও তারা তাদের পরিচিত পিঁপড়েদের ঠিকই চিনতে পারে, আর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিও

বোধ করে। তারা বড় বড় বাসস্থান বানায়, সেগুলিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে দেয়, এবং প্রহরী মোতায়েন করে। তারা রাস্তা তৈরী করে নদীর নিচে সুড়ঙ্গ কাটে, এমনকি পরস্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নদীর ওপর অস্থায়ী সাঁকোও তৈরী করে। নিজেদের দলের জন্য তারা খাদ্য সংগ্রহ করে। বাসার দরজার থেকে অনেক বড় কোন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা হলে তারা দরজাটা তখনকার মতো বড় নেয়, পরে তা মেরামত করে নেয় আবার। নানাধরণের শস্যের বীজ সংগ্রহ করে পিঁপড়েরা, তা থেকে অঙ্কুর বেরোতে দেয় না, আর ঐ-সব বীজ স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেলে মাটির ওপরে তুলে এনে শুকোতে দেয়। কয়েক জাতের পোকাকে (Aphides & other insects) পিঁপড়েরা ধরে রাখে, দুধেল-গাই হিসাবে ব্যবহার করে। সুশৃঙ্খলভাবে দল বেঁধে তারা যুদ্ধ করতে যায়, সকলকার মঙ্গলের জন্য অক্লেশে উৎসর্গ করে নিজেদের জীবন। আগে থেকে পরিকল্পনা করে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়। যুদ্ধের সময় তারা বিপক্ষের পিঁপড়েদের বন্দী করে রাখে দাস হিসাবে। নিজেদের পোষা-পোকাদের ডিমগুলিকে এবং নিজেদের ডিম ও লার্ভাগুলিকে তারা বাসার গরম দিকটায় সরিয়ে দেয়, যাতে করে সেগুলি তাড়াতাড়ি ফুটে যেতে পারে। এ-রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত সাজিয়ে দেওয়া যায়। মোদ্দা কথাটা হল, পিঁপড়ে আর জাব পোকাদের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, কিন্তু তাই বলে কেউ কখনও এইসব পোকাদের পৃথক পৃথক শ্রেণী বা ভাগ হিসাবে চিহ্নিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। এই পার্থক্যটা পূরণ করে দেয় অন্যান্য পোকারা। মানুষ আর উন্নততর বাঁদরদের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু এ-কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে মানুষ আর উন্নততর বাঁদরদের মাঝামাঝি অবস্থার বেশ কিছু জৈবিক রূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলেই এই ধারাবাহিক শৃঙ্খলার ছেদগুলি দেখা দিয়েছে।

মূলত মস্তিষ্কের কাঠামোর ভিত্তিতে অধ্যাপক ওয়েন সমগ্র স্তন্যপায়ী প্রাণী-বর্গকে চারটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে একটি উপ-শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন মানুষকে ; আর একটিতে রেখেছেন থলি-বাহিত ক্যাঙ্গারু জাতীয় প্রাণী এবং অণ্ডজ লিপ্তপদ স্তন্যপায়ীদের ; এবং মানুষকে তিনি অন্য সমস্ত স্তন্যপায়ীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের জীব হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে শেষ ভাগ দুটি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। স্বাধীনভাবে বিচার করতে সক্ষম কোন প্রাণীবিজ্ঞানী এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মেনে নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই, তাই এ প্রসঙ্গে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

প্রাণীদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য, বা কোন অঙ্গ (এমনকি মস্তিষ্কের মতো দারুণ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও), কিম্বা মানসিক ক্ষমতার বিপুল উন্নতির ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হলেও তা প্রায় কখনোই নিশ্চিত ভাবে সন্তোষজনক হয়ে ওঠে না। মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে জাতীয় পতঙ্গের ক্ষেত্রে এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অভ্যাস বা সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে করা এ-ধরণের বিভাজন একান্তই কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাণীদের আকার, গায়ের রঙ, কিম্বা তাদের স্বভাব প্রভৃতির মতো যে-কোন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই অনুভব করে আসছেন যে এই বিন্যাসের একটা কিছু প্রাকৃতিক প্রণালী আছেই। আজ প্রায় প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছেন যে এই প্রণালী অনুযায়ী বিন্যাসটা যতদূর সম্ভব বংশবৃত্তান্ত মাফিক করা দরকার। অর্থাৎ, একই জৈবিক গঠন থেকে উদ্ভূত যাবতীয় প্রাণীদের একই ভাগের মধ্যে রাখতে হবে, অন্য কোন জৈবিক গঠন থেকে উদ্ভূত প্রাণীদের সঙ্গে তাদেরকে মিশিয়ে ফেলা চলবে না। কিন্তু এইসব প্রাণীদের সেই আদি গঠনগুলি যদি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বংশধরদের মধ্যেও একটা সম্পর্ক থাকবে, এবং দুটি ভাগ মিলে একটা বৃহত্তর দল গড়ে উঠবে। বিভিন্ন দলের মধ্যেকার পার্থক্যের মাত্রাকে, অর্থাৎ প্রতিটি দলের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মাত্রাকে প্রকাশ করা হয় বর্গ, কুল, বিন্যাস আর শ্রেণী প্রভৃতি অভিধার সাহায্যে। আমাদের হাতে বংশধারার কোন নির্দিষ্ট বিবরণ নেই। কাজেই, প্রাণীদের বংশতালিকা আবিষ্কার করার একমাত্র উপায় হল—যে-সব প্রাণীকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে, তাদের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে তা লক্ষ্য করা। এই কাজ করার জন্য, কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অসংখ্য বিষয়ের সাদৃশ্যকে লক্ষ্য করা এবং দুটি ভাষার বহু শব্দ ও বাক্যগঠনের মধ্যে যদি প্রচুর সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সকলেই স্বীকার করবে যে ঐ ভাষা দুটির উদ্ভব ঘটেছে একই ভাষা থেকে—এমনকি ঐ দুটি ভাষার কিছু শব্দ ও বাক্যগঠন প্রণালীর মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকলেও। কিন্তু সজীব প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের ব্যাপারটাকে একই ধরণের জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে খুঁজলে চলবে না। যেমন, জলে বসবাস করার দরুণ দুটি প্রাণীর সমগ্র দেহ-কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক প্রণালীতে তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য না-ও থাকতে পারে। এ-থেকে বোঝা যায় যে কেন নানান গুরুত্বহীন অঙ্গ, অকেজো ও লুপ্তপ্রায় অঙ্গ, বা

বর্তমানে নিষ্ক্রিয় কিম্বা একেবারেই ভ্রূণাকারে থাকা অঙ্গগুলির সাদৃশ্যই শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারে সবথেকে দরকারী। কেননা এইসব অঙ্গ মোটেই পরবর্তীকালের অভিযোজনের ফলে গড়ে ওঠে না, আর তাই এগুলি থেকে বংশধারার বা প্রকৃত সাদৃশ্যের প্রাচীন রূপরেখাটিকে চিনে নেওয়া যায়।

তাছাড়া, কোন একটি বৈশিষ্ট্যের প্রচুর পরিবর্তনের ভিত্তিতে দুটি প্রাণীকে সম্পূর্ণ পৃথক বর্গের প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়, কোন প্রাণীর যে অঙ্গটি একই ধরণের অন্যান্য প্রাণীদের ঐ অঙ্গের থেকে অনেকাংশে পৃথক, সেই অঙ্গটির প্রচুর পরিবর্তন ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। ফলস্বরূপ ঐ অঙ্গটির একই ধরণের আরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য (যতদিন ঐ প্রাণীটি একই ধরণের অবস্থায় থাকবে, ততদিনই ঘটে চলবে এই পরিবর্তন)। এইসব পরিবর্তন প্রাণীটির পক্ষে সহায়ক হলে সেগুলি টিকে থাকবে এবং ক্রমাগত উন্নত হয়ে উঠবে। অনেকসময় কোন অঙ্গ ক্রমাগত উন্নত হয়ে চললে—যেমন পাখিদের ঠোঁট কিম্বা কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর দাঁত—তা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে অথবা অন্য কোন কাজে সাহায্য করে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও মানসিক ক্ষমতার ক্রমাগত উন্নতির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, অর্থাৎ তার উন্নতির জন্য মানুষের কোন অসুবিধা হয় না। তাই, প্রাকৃতিক বা বংশবৃত্তান্তগত ব্যবস্থায় মানুষের স্থান নির্ধারণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, তার মস্তিষ্কের দারুণ উন্নতি যেন অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বা একেবারেই গুরুত্বহীন বিষয়গুলির অজস্র সাদৃশ্যকে চাপা দিয়ে না দেয়।

অধিকাংশ প্রাণীবিজ্ঞানী, যাঁরা মানসিক ক্ষমতা সহ মানুষের সমগ্র কাঠামোর কথা বিবেচনা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে ব্লুমেনবাখ ও কুভিয়েরের পথই অনুসরণ করেছেন এবং মানুষকে একটা আলাদা শ্রেণী হিসাবে দেখিয়েছেন, যে শ্রেণীটিকে নাম দিয়েছেন তাঁরা দ্বিপদী (Bimana)। আর এইভাবে তাঁরা চতুষ্পদী, মাংসাশী প্রভৃতি শ্রেণীগুলির সমান অবস্থানেই স্থান দিয়েছেন মানুষকে। যে মতটি বিচক্ষণতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ লিনিয়াস সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন, সেই মতটিকে সাম্প্রতিককালের বহু শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন, এবং মানুষকে বসিয়েছেন চতুষ্পদী প্রাণীদের সঙ্গে একই সারিতে। এই সারিটিকে তাঁরা উন্নত ধরণের স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গ (Primates) নামে চিহ্নিত করেছেন। এই সিদ্ধান্তটিকে ন্যায্য বলে মেনে নেওয়া যায়। কেননা প্রথমত মনে রাখা দরকার, শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্কের বিপুল

উন্নতিটা খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু নয়, এবং মানুষ ও চতুষ্পদী প্রাণীদের করোটির সুস্পষ্ট পার্থক্যটা (যে বিষয়টার ওপর বিশপ, এবি ও অন্যান্যরা সম্প্রতিকালে গুরুত্ব দিয়েছেন) তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত মস্তিষ্কের দরুণই উদ্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মনে রাখা দরকার যে মানুষ আর চতুষ্পদীদের মধ্যেকার অন্য প্রায় যাবতীয় ও আরও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি স্পষ্টতই অভিযোজনশীল, এবং সেগুলি মূলত মানুষের ঋজু কাঠামোর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত; যেমন তার হাত, পা আর শ্রোণীর গঠন, তার মেরুদণ্ডের বক্রতা, এবং তার মাথার অবস্থান। শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে অভিযোজনশীল বিষয়গুলির গুরুত্ব যে যথেষ্ট কম, তা ভালোভাবে বোঝা যায় সীল মাছদের দিকে তাকালে। এই প্রাণীটির শারীরিক গঠন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামো অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের থেকে যথেষ্টই আলাদা, উন্নততর জাতের বাঁদর এবং মানুষের মধ্যেও এতটা পার্থক্য দেখা যায় না। তাসত্ত্বেও, কুভিয়ের থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতিকালে মিঃ ফাওয়ার পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেই সীল মাছদের মাংসাশী শ্রেণীর প্রাণীদের একটা বর্গ হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। শ্রেণীবিন্যাসের কাজটা মানুষই করে থাকে, তা নাহলে নিজেকে একটা আলাদাশ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

উন্নত শ্রেণীর অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের যে কত অসংখ্য মিল আছে, তা উল্লেখ করার মত সাধ্য বা জ্ঞান আমার নেই। প্রখ্যাত শারীরসংস্থানবিদ্ ও দার্শনিক অধ্যাপক হাক্সলি এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এবং বলেছেন—নিম্নতর জাতের বাঁদরদের সঙ্গে উচ্চতর জাতের বাঁদরদের দৈহিক গঠনের যতটা পার্থক্য থাকে, উচ্চতর জাতের বাঁদরদের সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠনের কোন অংশেরই ততটা পার্থক্য থাকে না। ফলস্বরূপ, "মানুষকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।"

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে আমি বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখিয়েছি উন্নততর জাতের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠন যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ, এবং তার মূল কারণ হল ছোটখাট অজস্র কাঠামোগত ও জৈবিক গঠনের সাদৃশ্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি তুলে ধরেছিলাম একই ব্যাধিতে এবং একই ধরণের জীবাণু দ্বারা আমাদের আক্রান্ত হওয়ার কথা। তাছাড়াও দেখিয়েছিলাম যে, একই ধরণের মাদক বা ওষুধ প্রয়োগ করলে উন্নততর জাতের স্তন্যপায়ী জীব ও মানুষের মধ্যে একই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ইত্যাদি।

মানুষ ও চতুষ্পদী প্রাণীদের মধ্যেকার ছোট-খাট সাদৃশ্য নিয়ে যেহেতু প্রায় কোন প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হয়নি, এবং যেহেতু এই ধরণের অজস্র সাদৃশ্য চতুষ্পদীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ হাজির করে, তাই এখানে আমি এ-রকম অল্প কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। যেমন ধরা যাক মুখাবয়বের কথা। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে এবং মাংসপেশী ও ত্বকের প্রায় একইরকম স্পন্দনে নানা আবেগচিহ্ন প্রকাশ পায়, বিশেষ করে ভ্রু-র উপরে ও মুখের চারপাশে। কয়েকটি ভঙ্গী তো হুবহু একরকম। কিছু কিছু বাঁদর কাঁদবার সময় এবং কয়েক প্রকার বাঁদর আনন্দে চেঁচামেচি করার সময় দেখা যায়, তাদের ঠোঁটের দু'কোণ পিছনের দিকে সরে গেছে আর চোখের নীচের পাতা কুঁচকে গেছে। বহিঃকর্ণের গঠনের মধ্যেও আশ্চর্যরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য অধিকাংশ বাঁদরের তুলনায় মানুষের নাক অনেক খাড়া প্রকৃতির। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, হুলক্ গিবন (Hoolock Gibbon) জাতীয় বাঁদরদের নাক ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো। আর সেম্নোপিথেকাস্ ন্যাসিকা (Semnopithecus nasica) নামক বাঁদরদের নাক অসম্ভবরকম বাঁকা।

অনেক বাঁদরেরই মুখমণ্ডলে গোঁফ, দাড়ি বা জুলপি দেখা যায়। সেম্নোপিথেকাস প্রজাতির কিছু বাঁদরের মাথায় বেশ বড়ো বড়ো চুল থাকে। বনেট জাতীয় বাঁদরদের (Macacusradiatus) মাথার চাঁদির একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চারপাশে চুল ছড়িয়ে পড়ে, আর ঝুলতে থাকে মাঝখানের সিঁথির দুপাশে। মানুষের কপাল দেখেই নাকি তাকে সম্ভ্রান্ত আর বুদ্ধিমান বলে চেনা যায়, কিন্তু বনেট জাতীয় বাঁদররাই বা কম কিসে? তাদের মাথার উপরিভাগের ঘন চুল একসময় যেন আকস্মিকভাবে নীচের দিকে নেমে আসে এবং ক্রমশঃ ছোট হতে হতে এমন সুন্দরভাবে মিলে যায় যে, এক ভ্রূ ছাড়া ভ্রূর উপরিস্থ অংশে (কপালে) কোন রোম থাকে না। আবার অনেক সময়ই বলা হয় যে, কোন বাঁদরেরই ভ্রূ থাকে না—এ-কথা সবসময় সত্যি নয়। এই মাত্র এখানে যে প্রজাতির বাঁদরদের কথা বললাম (বনেট জাতীয় বাঁদর), তাদের কপালের রোমশূন্যতা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। এশ্‌রিখ্‌ট্ বলেছেন, মানব শিশুদের চুলে ভরা মাথা আর রোমশূন্য কপালের মধ্যে অনেক সময়ই কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। এটাকে আমরা পুনরাবর্তনের একটি মামুলী ঘটনা বলেই চিহ্নিত করতে পারি, কেননা মানুষের পূর্বপুরুষের কপাল কখনোই সম্পূর্ণ রোমশূন্য ছিল না।

সকলেরই জানা আছে যে আমাদের হাতের উপরাংশের ও নিম্নাংশের রোম ক্রমশ কনুই অভিমুখী। অদ্ভুত এই বিন্যাস অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং, হাইলোবেটস্ জাতীয় কোন কোন বাঁদর, এমনকি কয়েকপ্রকার আমেরিকান বাঁদরের মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু হাইলোবেটস্ এজিলিস্দের সম্মুখ-বাহুর (কনুই ও কব্জির মধ্যবর্তী অংশ) রোম সাধারণতঃ নিম্নাভিমুখী বা কব্জি-অভিমুখী হয় আর হাইলোবেটস্ লারদের হাতের রোম প্রায় খাড়া অবস্থায় থাকে এবং শুধু সামনের দিকে সামান্য বেঁকে থাকে। অর্থাৎ এই শেষোক্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে রোমরাজি একটা রূপান্তরকালীন অবস্থায় রয়েছে। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পিঠের লোম ঘন ও নিম্নাভিমুখী হওয়ার কারণ যে শরীর থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলা, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোনোর সময় কুকুরের সামনের দুই পায়ের রোম তির্যকভাবে থাকার কারণও একই বলে মনে হয়। মিঃ ওয়ালেস্ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ওরাং-ওটাংদের আচরণবিধি লক্ষ্য করার পর মন্তব্য করেছেন, এদের হাতের রোম কনুই-অভিমুখী হওয়ার কারণ সম্ভবত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া, কারণ এইসব প্রাণীদে বর্ষাকালে মাথার উপর কোন গাছের ডাল মুঠো করে ধরে, কানের দুপাশে কনুই ভেঙে বসে থাকতে দেখা যায়। লিভিংস্টোনের মতে, গরিলারাও "মুষলধারে বৃষ্টির সময় হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে বসে থাকে।" উপরের এই কথাগুলি যদি ঠিক হয়, এবং যা হওয়াই সম্ভব, তাহলে আমাদের হাতের উপরিস্থ রোমের অভিমুখকে আমাদের পূর্ব অবস্থারই স্মারক বলে মেনে নেওয়া যায়। কারণ এখন তো আর বৃষ্টির জল আটকাতে হাতের রোম আমাদের কাজে লাগে না বা আমাদের শরীরের বর্তমান ঋজু কাঠামোয় রোমের এই অভিমুখ বৃষ্টির জল আটকানোর পক্ষে উপযুক্তও নয়।

তবে, মানুষ বা তার আদি পূর্বপুরুষের শরীরের রোমের অভিমুখ সম্বন্ধে অভিযোজন বা উপযোগবাদের নীতিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটা খুব সঙ্গত নয়। কারণ এশ্‌রিষ্‌ট্ মনুষ্য-ভ্রূণের শরীরে রোমবিন্যাসের যে চিত্র উপস্থিত করেছেন (পূর্ণবয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রেও এই বিন্যাস একইরকম), তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়, এবং এ-ব্যাপারে অন্যান্য অনেক জটিলতর কারণও যে বাদ সাধে, তাঁর এই কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই। ভ্রূণের শরীরে রোমগুলির একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হওয়াটা সম্ভবত ভ্রূণের সেইসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যেগুলি তার বিকাশের সময় সবথেকে শেষে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া,

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর রোমবিন্যাসের সঙ্গে মেডুলারি ধমনীর কার্যধারারও কিছু সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়।

আমরা দেখলাম যে রোমশূন্য কপাল, মাথায় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ প্রভৃতি অনেক বিষয়েই মানুষের সঙ্গে কয়েকপ্রকার বাঁদরের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এরকম প্রত্যেকটি সাদৃশ্যকে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত অব্যাহত বংশগতির বা উত্তরকালীন প্রত্যাবর্তনের ফল হিসাবে ভাবলে ভুল হবে। এই সমস্ত সাদৃশ্যের অনেকগুলিই খুব সম্ভবত একইরকম রূপান্তরের ফল, এবং আমি অন্যত্র দেখাতে চেষ্টা করেছি যে এই রূপান্তর একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট প্রাণীদের একইরকম শারীরিক গঠন ও একই কার্যকারণ থেকে সৃষ্টি হয়। মানুষ ও কিছু জাতের বাঁদরদের সম্মুখ-বাহুতে রোমের একইরকম অভিমুখ খুব সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ অ্যানথ্রপমরফাস জাতের বাঁদরদের মধ্যে এটি একটি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু অত্যন্ত স্বতন্ত্র জাতের কিছু আমেরিকান বাঁদর কিভাবে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলো, তা ঠিক বোধগম্য নয়।

আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম, তার থেকে বলা যায় যে মানুষ তার নিজের জন্য ভিন্ন কোন শ্রেণী দাবি করতে পারে না। বড়জোর তাকে একটি উপ-শ্রেণী বা বর্গ বলা যায়। অধ্যাপক হাক্সলি তাঁর শেষ বইটিতে সমস্ত উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীকে তিনটি উপ-শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: মানুষ—অ্যানথ্রোপিডে (Anthropidae) উপ-শ্রেণী ; সমস্ত ধরণের বাঁদর—সিমিয়্যাডে (Simiadae) উপ-শ্রেণী, এবং নানারকম লেমুর—লেমুরাইডে (Lemuridae) উপ-শ্রেণী। তাছাড়া, অঙ্গসংস্থানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানুষের গঠন অত্যন্ত স্বতন্ত্র বলে সে অতি অবশ্যই ভিন্ন একটি উপ-শ্রেণীর পদাধিকার দাবী করতে পারে। কিন্তু তার মানসিক ক্ষমতার কথা বিচার করলে বোঝা যায়, এই পদাধিকার অত্যন্ত নিম্নমানের। তা সত্ত্বেও, বংশবৃত্তান্তের বিচারে এই পদাধিকার বেশ উঁচু, আর তাই মানুষকে একটা বর্গ বা উপ-বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদি আমরা একই মূল বংশ থেকে উদ্ভূত তিনটি বংশধারার কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাব তাদের মধ্যে দুটি বংশধারা অনেক বছর পরেও এত স্বল্প পরিবর্তিত হয়েছে যে মূল প্রজাতির সঙ্গে তাদের খুব একটা তফাৎ নেই। কিন্তু তৃতীয় বংশধারাটিতে এত বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে যে অনায়াসেই তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র উপ-বর্গ, বর্গ, এমনকি স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীও বলা যায়। তবে, এই তৃতীয় ধারাটির মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে এমন বহু ছোটখাট বিষয় থাকে,

যেগুলি অন্য দুটি ধারার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। ফলে, এখানে আমরা একটি অমীমাংসিত প্রশ্নের সম্মুখীন হই—শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্যের উপর আমরা কতখানি গুরুত্ব দেব ? অর্থাৎ, কতটা গুরুত্ব দেব ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের পরিমানের উপর, এবং কতটাই বা গুরুত্ব দেব অসংখ্য গুরুত্বহীন বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের উপর, যেগুলি বংশধারা বা বংশবৃত্তান্তের ইঙ্গিত দেয়। সংখ্যায় অল্প অথচ জোরদার পার্থক্যগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়াটাই বেশি নজর কাড়ে আর নিঃসন্দেহে তাতে ঝুঁকিও কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যিকারের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাজন করতে হলে অসংখ্য ছোটখাটো সাদৃশ্যের উপর জোর দেওয়াটাই বেশি দরকারী।

এ-বিষয়ে মানুষ সম্পর্কে কোন রায় দেওয়ার আগে আমরা বরং একবার বাঁদরদের উপ-শ্রেণী, সিমিয়্যাডেদের দিকে চোখ ফেরাই। প্রায় সমস্ত প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ই এই উপ-শ্রেণীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগে আছে ক্যাটারহাইন (Catarhine group) বা পূর্বগোলার্ধের বাঁদররা (Old world monkeys) ; এই জাতীয় বাঁদরদের বৈশিষ্ট্য হল (নাম থেকেই বোঝা যায়) অদ্ভুত গঠন-আকৃতি বিশিষ্ট নাসারন্ধ্র এবং প্রতি চোয়ালে চারটি করে প্রিমোলার বা উপ-পেষণ দাঁত। অন্য ভাগে আছে প্ল্যাটিরহাইন (Platyrhine group) বা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদররা (New world monkeys ; দুটি সুনির্দিষ্ট উপ-বিভাগ সমেত) ; এই জাতীয় বাঁদরদের নাসারন্ধ্র পূর্বগোলার্ধের বাঁদরদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত এবং এদের উভয় চোয়ালে চারটির জায়গায় ছটি করে প্রিমোলার বা উপ-পেষণ দাঁত থাকে। এছাড়া দুটি ভাগের মধ্যে আরো কিছু ছোটখাটো পার্থক্যও দেখা যায়। মানুষের দাঁত এবং নাসারন্ধ্রের গঠন-প্রকৃতি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, তারা ক্যাটারহাইন গ্রুপ বা পূর্বগোলার্ধের বাঁদরদের বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি প্রায় গুরুত্বহীন এবং আপাতভাবে অভিযোজন-শীল প্রকৃতির কিছু বিষয়ে প্ল্যাটিরহাইন বিভাগের বাঁদরদের সঙ্গে মানুষের মিল থাকলেও, বাকি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সাদৃশ্য প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই, প্রাচীনকালে ঐ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদরদের রূপান্তরের ফলেই মানব-সদৃশ কোন জীবের উদ্ভব ঘটেছিল, ঐ বাঁদররা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, আর মানব-সদৃশ সেই জীবের মধ্যে ফুটে উঠেছিল পূর্ব গোলার্ধের বাঁদরদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য—এটা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং, মানুষ যে পূর্ব গোলার্ধের

সিমিয়্যান উপ-শ্রেণীরই একটি প্রশাখা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর তাই, বংশবৃত্তান্তের প্রশ্নে আমরা তাকে নির্দ্বিধায় ক্যাটারহাইন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।[১]

অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্ববিদ গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং হাইলোবেটস্ প্রভৃতি অ্যানথ্রপমরফাস জাতের বাঁদরদের পূর্বগোলার্ধের অন্যান্য বাঁদরদের থেকে স্বতন্ত্র একটি উপ-গোষ্ঠীতে ভাগ করেন। কিন্তু, তাদের মস্তিষ্কের আকারের কথা বিচার করে, এই উপ-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকার করতে গ্র্যাটিওলেট্ রাজী নন। নিঃসন্দেহে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মিঃ সেন্ট. জি. মিভার্ট বলেছেন, ওরাংরা হচ্ছে "ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র ও বিচ্যুত গঠনাকৃতি।" আবার কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ পূর্ব গোলার্ধের অ্যানথ্রপমরফাস শ্রেণী বহির্ভূত বাঁদরকুলকে দু'তিনটি ছোট ছোট উপগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। অদ্ভুত থলি-আকৃতির পাকস্থলীবিশিষ্ট সেমনোপিথেকাস্ জাতের বাঁদররা এরকম একটি উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত। কিন্তু এম. গড্রি এথেন্স সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে গিয়ে একটি আশ্চর্য জিনিসের সন্ধান পান। তিনি জানতে পারেন যে মিওসেন যুগে, অর্থাৎ প্রায় সত্তর লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীতে সেমনো-পিথেকাস ও ম্যাকাকাস জাতের বাঁদরদের মধ্যে সংযোগকারী অন্য এক জাতের বাঁদরের অস্তিত্ব ছিল। একসময় বোধহয় এভাবেই অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে টিকে ছিল পৃথিবীতে।

যদি অ্যানথ্রপমরফাস জাতের বাঁদরদের একটি সাধারণ উপগোষ্ঠী হিসাবে মেনে নেওয়া হয়, আর মানুষের সঙ্গে যেহেতু তাদের অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে—শুধু ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে তার যে-সব বিষয়ে মিল রয়েছে সেগুলিই নয়, তা ছাড়াও বিচিত্র সব বৈশিষ্ট্য, যেমন লেজের অনুপস্থিতি, ত্বকে কড়া না পড়া, এবং চেহারাগত সাদৃশ্য—এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে তাহলে নিশ্চয়ই অ্যানথ্রপমরফাস উপ-গোষ্ঠীর কোন প্রাচীন প্রজাতি থেকেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল। নিম্নশ্রেণীর আরো যে-সব উপ-গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের

১। এই রকম শ্রেণী-বিভাজনের সঙ্গে মিঃ সেন্ট. জর্জ মিভার্ট-এর বক্তব্যের প্রায় হুবহু মিল রয়েছে (দ্রঃ, "ট্রানসাকট. ফিলোসফ. সোস্.", ১৮৬৭, পৃঃ ৩০০)। তিনি উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে লেমুরজাতীয় প্রাণীদের (Lemuridae) আলাদা করে বাদবাকিদের হোমিনাইডেওসিমিয়াডে (ক্যাটারহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত) এবং সেবিডে ও হাপালাইডে (প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত) উপ-পর্বে ভাগ করেন। এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল।

কারুর পক্ষেই 'সাদৃশ্যযুক্ত জাতিগত পরিবর্তনের' নিয়ম অনুসারে মানব-সদৃশ কোন জীবের জন্ম দেওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা মানুষের সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে উন্নত শ্রেণীর অ্যানথ্রপমরফাস বাঁদরদের। আবার, তার নিকট সাদৃশ্যযুক্ত বাঁদরদের (উন্নত শ্রেণীর বাঁদরদের) অধিকাংশের তুলনায় মানুষের মধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন ঘটে গেছে, যা মূলত তার মস্তিষ্কের দারুণ উন্নতি ও সোজা হয়ে দাঁড়ানোরই ফল। তাসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে মানুষ হচ্ছে "উন্নত শ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে কার অত্যন্ত একটি ব্যতিক্রমী প্রাণী মাত্র।"

বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী যে-কোন প্রাণীতত্ত্ববিদই মনে করেন যে সিমিয়্যাড উপশ্রেণীর দুই মূলগোষ্ঠী, ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন বাঁদররা আর তাদের সমস্ত উপ-গোষ্ঠী, সকলে একই সুপ্রাচীন কোন আদি পূর্বপুরুষের বংশধর। এই পূর্বপুরুষের একেবারে প্রথমদিক্কার বংশধরেরা পরস্পরের থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ততদিনে কোন কোন প্রজাতি বা সদ্যসৃষ্ট বর্গের নানামুখী চরিত্রের মধ্যে ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীদ্বয়ের ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যগুলি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু অবিভক্ত এই প্রাচীন বাঁদরদলের মধ্যে দাঁতের বা নাসারন্ধ্রের গঠনাকৃতি এমন ছিল না ঠিক যে-রকম এখন ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী বা প্ল্যাটিরহাইন গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বরং এ-ব্যাপারে তাদের সঙ্গে লেমুরাইড উপ-শ্রেণীর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যাদের নিজেদের মধ্যে চোখ-মুখের গঠন-সাদৃশ্য খুবই কম আর দাঁতের গঠনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে বহুল পরিমাণে।

ক্যাটারহাইন আর প্ল্যাটিরহাইন বাঁদরদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য উভয়েই যে প্রশ্নাতীত ভাবে একই শ্রেণীভুক্ত—এটাই প্রকাশ করে। যে-সব বৈশিষ্ট্য এদের উভয়ের মধ্যেই রয়েছে, সেগুলো সংখ্যায় এত বেশী যে পৃথক পৃথক প্রজাতি নিজে থেকে সেটা অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ, এই বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার সূত্রেই অর্জিত। কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদরা এদেরকে চিহ্নিত করবেন বনমানুষ বা বাঁদর হিসাবে, এক পুরনো প্রজাতির প্রাণী হিসাবে, যাদের অনেক লক্ষণ ঠিক ক্যাটারহাইন ও প্ল্যাটিরহাইন বাঁদরদের মত, কিছু লক্ষণ অন্তর্বর্তী স্তরের, এবং সম্ভবত কিছু লক্ষণ এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে যে-সব লক্ষণ দেখা যায়—তার থেকে আলাদা। আর যেহেতু বংশবৃত্তান্তের বিচারে মানুষ হচ্ছে ক্যাটারহাইন বা পূর্ব গোলার্ধের বাঁদরগোষ্ঠীর

অন্তর্গত, তাই, আমাদের আত্মগরিমা ক্ষুন্ন করেও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের আদি পূর্বপুরুষদেরও ঐ নামেই চিহ্নিত হওয়া উচিত।[২] কিন্তু তাই বলে মানুষ সহ সমগ্র সিমিয়্যান গোষ্ঠীর আদি পূর্বপুরুষরা এখনকার কোন বনমানুষ বা বাঁদরদের মতোই ছিল কিম্বা এইসব বনমানুষ বা বাঁদরদের সঙ্গে তাদের দারুণ সাদৃশ্য ছিল—এমনটা ভাবলে ভুল হবে।

মানুষের উদ্ভবস্থল এবং মানুষের প্রাচীনত্ব: স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম কোন্ অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মানুষের উদ্ভব ঘটে। মানুষ যেহেতু একদা এই গোষ্ঠীর (ক্যাটারহাইন) অন্তর্ভুক্ত ছিল, ফলে তাকে পূর্ব গোলার্ধের (Old world) বাসিন্দা বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে, ভৌগোলিক বিন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়, অষ্ট্রেলিয়ায় বা মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে তারা বসবাস করত না। দেখা গেছে, পৃথিবীর যে-কোন বৃহৎ অঞ্চলেই বর্তমানে টিকে থাকা স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ঐ অঞ্চলের অধুনালুপ্ত প্রায় কোন-না-কোন প্রজাতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। তাই মনে হয়, গরিলা ও শিম্পাঞ্জির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত লুপ্তপ্রায় বাঁদররা প্রথমে আফ্রিকাতেই বসবাস করত। আর যেহেতু এই দুই বাঁদর প্রজাতিই হচ্ছে সাদৃশ্যের দিক দিয়ে মানুষের সবথেকে কাছাকাছি, তাই আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের পক্ষে আফ্রিকা মহাদেশের বাসিন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অন্য যে-কোন অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা অর্থহীন। কারণ, মিওসেন যুগে (প্রায় সত্তর লক্ষ বছর আগে) দু'তিন প্রকার অ্যানথ্রোপমরফাস বাঁদর, দৈর্ঘ্যে প্রায় মানুষের সমতুল্য ও গঠন-প্রকৃতিতে হাইলোবেটস্ বাঁদরদের খুব কাছাকাছি একপ্রকার ড্রায়োপিথেকাস বাঁদর (Dryopithecus of Lartet) ইয়োরোপে বাস করতে বলে জানা গেছে। তাছাড়া, সেই সুপ্রাচীনকালের পর থেকে পৃথিবীতে ঘটে গেছে অজস্র বড় বড় পরিবর্তন, এবং এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক জায়গার বাসিন্দারাই অন্য জায়গায় চলে গেছে দলে দলে।

কিন্তু, যেখানে আর যে সময়েই মানুষের শরীর থেকে বড় বড় রোমরাজি নিশ্চিহ্ন

২। হেকেলও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দ্রঃ, "ueber die Entstehung des Menschengeschlechts", in Virchow's, "Sammlung. gemein. wissen. Vorlage", ১৮৬৮, পৃঃ ৬১। এছাড়াও দ্রষ্টব্য তাঁর অপর একটি রচনা "Naturliche schopfungs geschichte", ১৮৬৮।—এখানে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হতে শুরু করুক না কেন, একথা নিশ্চিত যে সেই সময় তারা কোন উষ্ণ জল-বায়ুর দেশে বসবাস করত। কেননা কাঁচা ফলমূল, মাংস ইত্যাদি খেয়ে হজম করার পক্ষে ঐ-রকম জলবায়ুই ছিল আদর্শ। অবশ্য আমাদের জানা নেই ঠিক কতদিন আগে মানুষ ক্যাটারহাইন গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র এক সত্তার দিকে পা বাড়িয়েছিল। তবে খুব সম্ভবত ইওসেন বা প্রাক্-প্রত্নপ্রস্তর যুগের মতো সুদূর অতীতেই এ-ব্যাপারটি ঘটেছিল। কারণ মিওসেন যুগের প্রথম দিকে ড্রায়োপিথেকাস জাতের বাঁদরদের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়, এ সময়েই অনুন্নত শ্রেণীর বনমানুষদের (ape) থেকে আলাদা (diverged) হয়ে একদল উন্নত শ্রেণীর বনমানুষের উদ্ভব হয়েছিল। আবার এ-ও আমাদের অজানা যে, একই ধারার উন্নত বা অনুন্নত শ্রেণীর প্রাণীরা অনুকূল পরিস্থিতি পেলে কত দ্রুত উন্নত হতে পারে। তবে, আমরা জানি যে কোন কোন প্রাণী দীর্ঘকাল ধরে একইরকম আছে, তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি তাদের। গৃহপালিত জীবজন্তুদের লক্ষ্য করে দেখা গেছে, নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন বংশধরদের কেউ কেউ আদৌ পরিবর্তিত হয় না, কেউ হয়তো নামমাত্র পরিবর্তিত হয়, আবার কারুর হয়ত বিপুল পরিবর্তন ঘটে যায়। মানুষের মধ্যেও হয়ত এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, উন্নত শ্রেণীর বনমানুষদের (ape) তুলনায় তাদের বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে দারুণ পরিবর্তন ঘটেছিল।

মানুষ ও তার নিকট-সদৃশ জীবদের জৈবিক পরম্পরার (organic chain) মধ্যে যে বিশাল ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, তা কোন বিদ্যমান বা বিলুপ্ত প্রাণীর দ্বারা পূরণ করা যাচ্ছে না। আর এই ব্যাপারটা কোন নিম্নশ্রেণীর জৈবিক রূপ থেকে মানুষের উদ্ভূত হওয়ার ধারণার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যাঁরা সাধারণ চিন্তা-ভাবনা থেকে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে এই আপত্তি কখনোই তেমন গুরুত্ব পায় না। জৈবিক পরম্পরার প্রায় সর্বত্রই এই ফাঁক বা আকস্মিক ছেদ রয়েছে। কোথাও কোথাও তা অত্যন্ত ব্যাপক—দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট, আবার কোথাও বা বিভিন্ন মাত্রায় কম। যেমন, ওরাং-ওটাং ও তার নিকট-সদৃশ উন্নতশ্রেণীর বনমানুষদের মধ্যেকার শূন্যস্থান, টার্সিয়াস (পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একপ্রকার বাঁদর) ও লেমুর জাতীয় বাঁদরদের মধ্যেকার শূন্যস্থান, হাতিদের মধ্যেকার শূন্যস্থান, এবং অরনিথর-হাইনচাস (অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত একপ্রকার হংসচঞ্চু) বা এচিড্‌না (নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার অত্যন্ত প্রাচীন একপ্রকার হংসচঞ্চু) এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেকার শূন্যস্থান। অবশ্য এই শূন্যস্থান তখনই সৃষ্টি

হয়, যখন একটি প্রাণীর অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত অন্যপ্রাণীরা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে, হয়ত কয়েকশ বছরের মধ্যেই, মানুষের সভ্য-জাতিগুলি অসভ্য জাতিগুলিকে ধ্বংস করে সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করবে। একই সঙ্গে, অধ্যাপক স্ট্যাফোসেনের মন্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, অ্যানথ্রোপমরফাস্ জাতির বাঁদরের দলও (গরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি) নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে মানুষ আর তার নিকটসদৃশ প্রাণীদের মধ্যেকার ফাঁকা আরও বেড়ে যাবে, কারণ তখন মনেহয় এই পরম্পরার একপ্রান্তে থাকবে ককেশিয়ানদের চেয়েও উন্নত শ্রেণীর মানুষ আর অন্যপ্রান্তে থাকবে বেবুন জাতির নিকৃষ্ট বাঁদরকুল মধ্যে। এখন নিগ্রোজাতি বা অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে গরিলাদের যেমন ফারাক রয়েছে।

উপযুক্ত জীবাস্মের অভাবে মানুষের সঙ্গে তার বাঁদর-সদৃশ পূর্বপুরুষের সম্পর্কের মূলসূত্রটি এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অবশ্য যিনি স্যার সি· লাইয়েলের আলোচনাটি মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁর কাছে এ-বিষয়টা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি দেখিয়েছেন যে সমস্ত মেরুদন্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রেই জীবাস্ম আবিষ্কারের ব্যাপারটা এক মন্থর প্রক্রিয়া এবং আকস্মিকভাবেই জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যে-সব জায়গা মানুষের সঙ্গে কোন বাঁদর সদৃশ বিলুপ্ত জীবের সম্পর্ক প্রমাণ করার উপযোগী জীবাশ্ম পাওয়ার পক্ষে আদর্শ, এমন অনেক জায়গাই এখনো পর্যন্ত ভূতত্ত্ববিদ্‌দের অনুসন্ধানী চোখের বাইরে থেকে গেছে।

মানুষের বংশ বৃত্তান্তের নিম্নতর স্তরসমূহ : আমরা দেখতে পেলাম যে সিমিয়াড উপশ্রেণীর অন্তর্গত ক্যাটারহাইন বা পূর্ব গোলার্ধের বাঁদরদের জাতিরা (Old word division) উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদরদের জাতিদের (New world division) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরই তাদের (old world division) থেকে আবার আলাদা হয়ে মানুষ জাতীয় শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এবার আমরা মানুষের বংশ বৃত্তান্তের সুদূর অতীতের চিহ্নগুলি খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। আর তা করার জন্য আমরা মূলত নির্ভর করব পারস্পরিক শ্রেণী ও বর্গের সাদৃশ্যের উপর, এবং আমাদের জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে তাদের পরস্পরাক্রমিক আবির্ভাবের প্রশ্নটাকে একটু ছুঁয়ে যাব। প্রথমেই ধরা যাক উন্নত শ্রেণীর বাঁদরদের একটি অংশ লেমুরাইডদের কথা। বিন্যাস অনুযায়ী তাদের অবস্থান সিমিয়াডদের নীচে এবং এদের সম্পর্কও বেশ কাছাকাছি। উন্নত শ্রেণীর বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র একটি বর্গ, বা হ্যাকেল্ ও

অন্যান্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের কথা অনুযায়ী স্বতন্ত্র একটি বিন্যাস। এই গোষ্ঠীটির শাখা-প্রশাখা অসম্ভব রকম বেশি। ফলে তাদের থেকে উদ্ভূত প্রাণীর সংখ্যাও অনেক। আর এইসব কারণেই সম্ভবত তাদের অবলুপ্তিও ঘটেছে বেশী রকম। টিকে থাকা অধিকাংশেরই আশ্রয়স্থল হলো বিভিন্ন দ্বীপ যেমন ম্যাডাগাস্কার ও মালয় উপদ্বীপ সমূহ। এইসব জায়গায় তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য নানান জীবজন্তুতে ঠাসা মহাদেশসমূহের মতো কোন কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। আবার এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি, হাক্সলির কথায়, "সর্বোচ্চ স্তরের জীব থেকে শুরু করে এমন নিম্নস্তরের জীব পর্যন্ত প্রসারিত, যার থেকে মাত্র এক ধাপ নিচেই আছে নিম্নতম, ক্ষুদ্রতম ও সবথেকে কম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্ল্যাসেণ্টাল (placental) স্তন্যপায়ী প্রাণীরা।" এ-সব কিছু বিচার করে দেখলে মনে হয় যে, বর্তমানের লেমুরাইড উপশ্রেণীর পূর্বপুরুষদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল সিমিয়্যাড উপ-শ্রেণীটি, আর লেমুরাইডদের উদ্ভব ঘটেছিল স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গের একেবারে নিচের স্তরের কোন রূপের মধ্য থেকে।

অনেকগুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের দিক দিয়ে মারসুপিয়্যালদের (ক্যাঙ্গারুজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী) অবস্থান প্ল্যাসেণ্টাল স্তন্যপায়ীদের (placental mammals) চেয়ে নীচে। এদের আবির্ভাব ঘটেছিল বহু প্রাচীন কোন ভূতাত্ত্বিক যুগে। আর তারা যে প্রাচীনকালে আজকের তুলনায় অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই মনে করা হয়-যে প্ল্যাসেণ্টাল প্রাণীর দল ইমপ্লাসেণ্টাল প্রাণী বা মারসুপিয়্যালদের থেকেই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখনকার মারসুপিয়্যালদের সদৃশ আকারবিশিষ্ট প্রাণীদের থেকে নয়, তাদের আদি পূর্বপুরুষদের থেকে। আবার ক্যাঙারু জাতীয়প্রাণীদের (Marsupials) সঙ্গে হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের (Monotremata) সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং এদেরকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুবিশাল স্তন্যপায়ী শ্রেণীর একটা তৃতীয় ও নিম্নতর বিভাগ। বর্তমানে অরনিথরহ্যারকাস ও এচিড্‌নারই হচ্ছে এই বিভাগের একমাত্র প্রতিনিধি। এই দু'ধরণের প্রাণীকে একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর শেষ নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দেই, যে গোষ্ঠীর কিছু প্রাণী নানান অনুকূল পরিস্থিতি পাওয়ার ফলে টিকে যেতে পেরেছিল অষ্ট্রেলিয়ায়। তাছাড়া, প্রাণী হিসেবে হংসচঞ্চুজাতীয় প্রাণী কিন্তু দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ তাদের শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশই সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মতো। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এবং সেই সূত্রে মানুষের বংশবৃত্তান্তের একেবারে নিচের

দিকে কোন্ কোন্ প্রাণী আছে, তা খুঁজে বের করতে গিয়ে আমরা বারবার অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলি। অবশ্য মিঃ পার্কারের মতো একজন সুযোগ্যব্যক্তির কথায় আমরা আস্থা রাখতে পারি। তিনি বলেছেন, কোন পাখি বা সরীসৃপ স্তন্যপায়ীদের মূল বংশতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কেউ উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও জ্ঞানের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে অবহিত হতে চান, তাহলে তিনি অধ্যাপক হেকেলের রচনাগুলি পড়ে দেখতে পারেন।[৩] আমি শুধু কয়েকটি সাধারণ কথা বলতে চাই। বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি বিভাগ, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী ও মাছ, সকলেই একই কোন আদি জৈবিক আকার থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ব্যাপারেই এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, বিশেষ করে ভ্রূণাবস্থায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। মৎস্যকুলের অবস্থান একেবারে নিচে থাকায় এবং সকলের চেয়ে আগে তাদের উদ্ভব হওয়ায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মেরুদণ্ডীশ্রেণীর সমস্ত জীবই মৎস্য-সদৃশ কোন প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁদের কাছে বাঁদর, হাতি, হামিং-বার্ড, সাপ, ব্যাঙ বা মাছের মতো একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীদের একই উৎস থেকে সৃষ্টি হওয়ার ধারণাটা একেবারেই কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হবে। এই ধারণা থেকে আমরা জানতে পারি যে এইসব প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে এক সময় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল, যে যোগসূত্রের কথা আজ আর চিন্তাই করা যায় না।

তাসত্ত্বেও এটা ঠিক যে এমন সব প্রাণীদের গোষ্ঠী পূর্বেও ছিল বা এখনো আছে, যারা বেশ কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর যোগসূত্রকে কম বেশী চিনে নিতে সাহায্য করে। আমরা দেখেছি অরনিথরহাইন্‌াস্‌রা ক্রমশ পরিবর্তনের মাধ্যমে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মতো আকার পেয়েছে। তাছাড়া, অধ্যাপক হাক্সলি প্রথমে জানিয়েছিলেন এবং পরে মিঃ কোপ ও অন্যান্যরা আরো নিশ্চিত করে বলেছেন যে, ডাইনোসরিয়ানরা (Dinosaurians) অনেক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণের দিক থেকে কিছু কিছু সরীসৃপ ও কিছু কিছু পক্ষীকুলের মধ্যবর্তী প্রাণী। কিছু

৩। জেকেলের "জেনারেল মরফোলজি" (B. ii. s. cl iii. and পৃঃ, ৪২৫) বইটিতে বিস্তৃত সারণী দেওয়া হয়েছে আর মানুষ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে তাঁর "Naturliche schiopfungs geschichte" রচনায়। অধ্যাপক হাক্সলি এই শেষোক্ত রচনাটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, অধ্যাপক হেকেল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বা উৎপত্তি সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন; অবশ্য কয়েকটি ব্যাপারে হেকেলের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য আছে। তবে তিনি সমগ্র রচনাটির রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দারুণ প্রশংসা করেছেন।

পক্ষীকুল বলতে মুখ্যত অস্থিচগোষ্ঠী (যারা নিজেরাই একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন অবশেষ মাত্র) এবং তাছাড়া আর্কিওপটেরিক্স (Acheopteryx) নামে এক অদ্ভুত ধরণের গিরগিটি সদৃশ লম্বা লেজওয়ালা পাখির (প্রায় ১৪ থেকে ১৭ কোটি বছর আগেকার প্রাণী ; বর্তমানে পাখির জীবাশ্ম) কথাই বলা হয়েছে। আবার, অধ্যাপক ওয়েনের মতে, ইস্থিওসরিয়ান (Ichthyosaurians)—অর্থাৎ, সাঁতরানোর উপযুক্ত ডানা বিশিষ্ট বৃহদাকার সামুদ্রিক গিরগিটির সঙ্গে মাছেদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক হাক্সলির মতে এদের সঙ্গে উভচর (amphibians) প্রাণীরও প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। উভচর প্রাণী বলতে তিনি বুঝিয়েছেন গ্যানয়েড শ্রেণীর মাছেদের (যেমন Acipenser, polypterus প্রভৃতি মাছ) সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের, যাদের সর্বোচ্চভাগে রয়েছে জলের ব্যাঙ (Frog) ও ডাঙার ব্যাঙ (Toad) জীবেরা। গ্যানয়েড-শ্রেণীর মাছেদের দেখা মেলে ভূতাত্ত্বিক যুগের সূচনা পর্বে। তাদের গঠন-আকৃতি ছিল সাধারণ ধরণের, অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদের নানারকম সাদৃশ্য ছিল। লেপিডোসিরেনদের (দক্ষিণ আমেরিকার একধরণের মাছ) সঙ্গে উভচর প্রাণী আর মাছেদের এত নিকট-সাদৃশ্য আছে যে প্রাণিতত্ত্ববিদ্রা বুঝে উঠতে পারেন না এই দুয়ের মধ্যে কোন শ্রেণীতে তাদেরকে (লেপিডোসিরেন) ফেলবেন। লেপিডোসিরেন ও কিছু গ্যানয়েড জাতের মাছ একেবারে বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে নদীতে বসবাস শুরু করার দরুণ। এই নদীগুলিই হয়ে উঠেছিল তাদের আশ্রয়স্থল, এবং মূল মহাদেশের সঙ্গে দ্বীপগুলি যেভাবে যুক্ত থাকে, ঠিক সেইভাবেই এই নদীগুলি যুক্ত ছিল সমুদ্রের সঙ্গে।

শেষত, অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বিশাল মৎস্যকুলের আর এক সদস্য হলো ল্যান্সলেট্ বা অ্যাম্ফিওক্সাস (দৈর্ঘ্য মাত্র দুই ইঞ্চি ; অগভীর সমুদ্রের মাছ ; পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়)। এরা আর সব মাছেদের থেকে এত স্বতন্ত্র যে, হেকেলের মতে, এরা নিজেরাই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ দাবী করতে পারে। এইসব মাছেরা তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের জন্য উল্লেখ-যোগ্য। এদের দেহে মস্তিষ্ক, শিরদাঁড়া বা হৃদ্যন্ত্র থাকে না বললেই চলে। তাই আগেকার প্রাণিতত্ত্ববিদরা এদেরকে পোকা-মাকড়ের শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। অনেকদিন আগেই অধ্যাপক গুড্স্যার ল্যান্সলেট মাছেদের সঙ্গে অ্যাসিডিয়ান বা সিন্ধুঘোটক জাতীয় প্রাণীদের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এই অ্যাসিডিয়ানরা হচ্ছে একরকম অমেরুদণ্ডী ও উভলিঙ্গবিশিষ্ট সামুদ্রিক জীব, কোন কিছুতে ভর না দিয়ে এরা চলাফেরা পারে না। এদেরকে প্রাণী বলাও

মুশকিল, কারণ শরীর বলতে সাদা-সিধে শক্ত একটা চামড়ার থলে আর তার মধ্যে দুটি ছোট ছোট ফুটো। হাক্সলির মতে এরা মোলাস্কোয়্যাডা শ্রেণীভুক্ত। মোলাস্-কোয়্যাডা হল শম্বুকজাতীয় প্রাণীদের (Mollusca) নিচে দিকের একটি বিভাগ। কিন্তু অধুনা কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ এদেরকে কৃমিজাতীয় কীট বা পোকা-মাকড়ের দলে রাখতে চেয়েছেন। এদের শূককীটের (larvae) আকার অনেকটা ব্যাঙাচির মতো।[৪] এরা অবাধে জলে ঘুরে বেড়াতেও পারে। এম. কোভালেভ্স্কি সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে অ্যাসিডিয়ানের শূককীট মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ শূককীট অবস্থায় এদের বেড়ে ওঠার ধারা, স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থান এবং দৈহিক আকৃতি অনেকটাই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কর্ডা ডরসালি বা ভ্রূণাবস্থার মতো। অধ্যাপক কুফার-ও এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। এম. কোভালেভ্স্কি নেপ্‌ল্স্ থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে তিনি এখন এ-ব্যাপারে আরো পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন, এবং সমস্ত বিষয়টা ভালোভাবে প্রমাণিত হলে তা এক অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার হিসাবে পরিগণিত হবে। কাজেই, আমরা যদি শ্রেণীবিভাজনের পক্ষে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক ভ্রূণতত্ত্বের উপর আস্থা রাখি, তাহলে অবশেষে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উদ্ভব সম্পর্কে একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি বলে ধরে নেওয়া যায়।[৫] আর তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সুদূর

৪। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ যে কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের থেকে কয়েক বছর পূর্বেই ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপে আমি নিজের চোখে একটি মিশ্রজাতের গমনশীল অ্যাসিডিয়ানের শুককীট (larvae) দেখেছিলাম, যেটি আকারে-প্রকারে অনেকটাই সিনোয়্যাকামের (synoicum) মতো, অথচ জাত বা শ্রেণী বিচারে একদম আলাদা। শুককীটটির আয়তাকার মাথার থেকে লেজটা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচগুণ বড়। খুব সূক্ষ্ম একটি তন্তুতে গিয়ে শেষ হয়েছে লেজটা। সাধারণ একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি যেমন দেখেছি, তাতে মনে হয় এই তন্তুটি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত কিছু অস্পষ্ট রেখা দ্বারা বিভক্ত, আর তা খুব সম্ভবত কোভালেভ্স্কি বর্ণি বৃহৎ কোষেরই অনুরূপ। বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় শুককীটের লেজটি তার মাথার চারপাশে গোল হয়ে গুটিয়ে ছিল।

৫। ·এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে অত্যন্ত গুণীজনেরাও কেউ কেউ এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এরকম একজন হলেন বিশিষ্ট প্রাণীতত্ত্ববিদ্ মিঃ জার্ড (দ্রঃ, "অ্যারখাভ দ্য জুওলজি এক্সপেরিমেঁত্যাল", এর ১৮৭২ সালের কিছু ধারাবাহিক প্রবন্ধ)। তা সত্ত্বেও, তিনি মন্তব্য করেছেন, "কোন তত্ত্ব বা ধারণার দরকার নেই, স্রেফ অ্যাসিডিয়ান শূককীটকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কিভাবে প্রকৃতি শুধুমাত্র অভিযোজনের সজীব অবস্থার সাহায্যে অমেরুদণ্ডী জীবের-মধ্যেও মেরুদণ্ডী জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য (ডর্স্যাল কর্ডের উপস্থিতি) সৃষ্টি করে এবং এক ধরণের জীবের সঙ্গে আর এক ধরণের জীবের যোগাযোগের এই সম্ভাবনা দু'য়ের মধ্যেকার ব্যাপক ফারাককে ঘুচিয়ে দেয়। তবে, ঠিক কোথায় এই যোগাযোগ বাস্তবে সম্পন্ন হয়েছিল, তা আমাদের জানা না ও থাকতে পারে।"

অতীতে পৃথিবীতে এমন এক প্রকার জীবের অস্তিত্ব ছিল, যাদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য আছে এখনকার অ্যাসিডিয়ান শূককীটের (larvae)। পরে তারা দুটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়—একটি শাখা বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে এবং অ্যাসিডিয়্যানদের বর্তমান শ্রেণীটির জন্ম দেয়, অন্যটি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জন্ম দিয়ে প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

এতক্ষণ ধরে আমরা মোটামুটি পারস্পরিক সাদৃশ্যের সাহায্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বংশবৃত্তান্ত উদ্ধার করার চেষ্টা করলাম। এবার আমরা মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব। আমার মনে হয় একটু চেষ্টা করলে আমরা আমাদের আদি পূর্বপুরুষের গঠন-আকৃতি সম্বন্ধে কালানুক্রমিক না হলেও এক এক যুগে তা কেমন ছিল, তার একটা আংশিক খসড়া অন্তত তৈরী করতে পারি। আর তা সম্ভব হতে পারে মানুষের দেহে এখনও টিকে-থাকা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সাহায্যে, পুনরাবর্তনের মাধ্যমে অতীতের যে-সব বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে আবার প্রকাশ পায় সেগুলির সাহায্যে, এবং অঙ্গসংস্থান তত্ত্ব ও ভ্রূণতত্ত্বের সাহায্যে। এখানে যে-সব তথ্যের কথা আসবে, সেগুলি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ-গুলিতে আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

মানুষের আদি পূর্বপুরুষের সর্বাঙ্গ একসময় নিশ্চয়ই রোমাবৃত ছিল। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের মুখেই দাড়ি ছিল। তাদের কানের গঠন ছিল সম্ভবত ছুঁচালো বা খাড়াকৃতি (pointed); ইচ্ছে করলে তারা কান নাড়াতেও পারত। একটা লেজ থাকত তাদের দেহে আর তা ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পেশীও থাকত। তাদের শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বেশ কিছু পেশীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেগুলি এখন মানবদেহে প্রায় দেখাই যায় না, কিন্তু চতুষ্পদ প্রাণী বা বাঁদর জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আকছার দেখা যায়। যে সময়ের কথা বলছি তখন বা তারও আগে হাতের উর্ধ্বাংশের হাড় হিউমেরাসে প্রধান ধমনী ও স্নায়ুতন্ত্রের প্রবেশ পথ ছিল সুপ্রা-কণ্ডিলয়েড ফোরামেন নামক ছিদ্রটি দিয়ে। তখন মানুষের অন্ত্রে ডাইভার্টিকুলামের দৈর্ঘ্য (ইলিয়াম যেখানে শেষ সেখান থেকে মাত্র এক সেমি দূরে অবস্থিত) বা সিকামের ব্যাস আরো বড় ছিল। ভ্রূণাবস্থায় পায়ের বুড়ো আঙুল যেমন থাকে, তাদের বুড়ো আঙুলও অনেকটা সেরকম ভাবেই পায়ের অন্যান্য আঙুলের সঙ্গে জুড়ে থাকত। আমাদের পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ যে বৃক্ষবাসীদের মতো ছিল এবং সাধারণত তারা যে উষ্ণ জল-বায়ু বিশিষ্ট, ঘন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুরুষদের বড় বড় কেনাইন দাঁত থাকত, আর তা মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত

হত। তার থেকে আরও আগের যুগে মেয়েদের শরীরে দুটি করে জরায়ু থাকত। দেহের বর্জ্যপদার্থ (মলমূত্র) ক্লোয়েকা (cloaca) নামক ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে যেত। চোখের রক্ষক হিসেবে তৃতীয় একটি পর্দা বা নিক্‌টিটেটিং ঝিল্লী থাকত। অনেক অনেক আগে মানুষের পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ সম্ভবত জলচর প্রাণীদের মতো ছিল। কারণ অঙ্গসংস্থানতত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে মানুষের ফুসফুস হচ্ছে আসলে একটি রূপান্তরিত হাওয়া-ব্লাডার (হাওয়া পেলে প্রসারিত হয় এবং হাওয়া ছাড়লে সংকুচিত হয়), যা একসময় তাকে জলের উপর ভেসে থাকতে সাহায্য করত। মানব-ভ্রূণের ঘাড়ে চেরা দাগ থেকে অনুমান করা যায়, নিশ্চয়ই একসময় ঐখানে ফুলকার (branchiae) অস্তিত্ব ছিল। আবার, আমাদের শারীরিক কিছু কাজ চন্দ্রপক্ষ অনুযায়ী বা প্রতি সপ্তাহান্তে সংঘটিত হয়। এটা সম্ভবত মানুষের সমুদ্র উপকূলবর্তী আদি বাসস্থানেরই নিদর্শন। তাছাড়া সেই সময়েই মানবদেহে প্রকৃত কিডনির বদলে করপোরা উল্‌ফিয়ানা (corpora wolffiana) দেখা দেয়। হৃদ্‌যন্ত্র ছিল একটা সামান্য ধুক্‌ধুকানি যন্ত্র মাত্র। অন্যদিকে, কর্ডা ডরস্যালিস (chorda dorsalis), যা দেখতে অনেকটা পাকানো দড়ির মতো, তা শিরদাঁড়ার স্থান দখল করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের এইসব আদি পূর্বপুরুষের গঠনাকৃতি তখন বেশ সাদামাটাই ছিল। এমনকি ল্যান্সলেট্‌ বা অ্যাম্‌ফিওক্সাস মাছেদের থেকেও সাদামাটা ছিল তাদের গঠনাকৃতি।

আর একটি বিষয়ের প্রতিও আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। দীর্ঘদিন ধরেই জানা আছে যে, মেরুদণ্ডী-প্রাণীদের কোন এক লিঙ্গের (স্ত্রী বা পুরুষ) মধ্যে জনন সংশ্লিষ্ট যেসব অপরিহার্য অঙ্গ প্রাথমিক (অবিকাশপ্রাপ্ত) অবস্থায় থাকে, বিপরীত লিঙ্গতে সেগুলিই খুব উন্নত অবস্থায় বিরাজ করে। তাছাড়া, সমস্ত ভ্রূণেরই প্রাথমিক অবস্থায় যে স্ত্রী ও পুং, উভয় গ্রন্থিরই অস্তিত্ব থাকে —তা-ও এখন নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। অর্থাৎ, সমগ্র মেরুদণ্ডী জীবজগতের কোন আদি পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই জননের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বৈশিষ্ট্যই ধারণ করত বা উভলিঙ্গ ছিল।[৬] কিন্তু এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট অসুবিধা দেখা

৬। এ হলো তুলনামূলক শারীর-সংস্থানবিগ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক জিগেন্‌বরের সিদ্ধান্ত (দ্রঃ, "Grundzügc der vergleich Anat.", ১৮৭০ পৃঃ ৮৭৬)। মূলতঃ উভচর প্রাণীদের লক্ষ্য করেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু মিঃ ওয়ালডেয়ারের গবেষণা থেকে মনে হয় (দ্রঃ, "জার্ণাল অফ অ্যানাটমি অ্যাণ্ড ফিজিওলজি", ১৮৬৯, পৃঃ ১৬১), প্রাণীদের জনন অঙ্গ, এমনকি "উচ্চশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জনন অঙ্গও, প্রাথমিক অবস্থায় উভলিঙ্গতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।" বিভিন্ন গবেষক দীর্ঘদিন ধরেই এই ধারণা পোষণ করে আসছেন কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই ধারণার কোন দৃঢ় বনিয়াদ ছিল না।

দেয়। কারণ, স্তন্যপায়ী পুরুষ-প্রাণীদের মূত্রগ্রন্থিতে (vesiculaa prostaticae) সন্নিহিত পথবিশিষ্ট অবিকাশপ্রাপ্ত জরায়ু দেখা যায়, যেমন দেখা যায় তাদের স্তন-গ্রন্থি। তাছাড়া ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণীদের (marsupials) অনেক পুরুষের মধ্যেও অঙ্কদেশে বাচ্চা-বহনকারীথলির সন্ধান মেলে।[৭] এরকম আরো অনেক ঘটনার কথাই হয়তো উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। কিন্তু তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, কিছু প্রাচীনস্তন্যপায়ী প্রাণী একটা আলাদা শ্রেণী হিসেবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করবার পর এবং সেহেতু নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও উভলিঙ্গই থেকে গিয়েছিল? ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়, কেননা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচের তলার প্রাণী মাছেদের মধ্যেও এখন উভলিঙ্গতার কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।[৮] একটি লিঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক আনুষঙ্গিক অংশই তার বিপরীত লিঙ্গতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে। এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রথমে কোন একটি লিঙ্গ (স্ত্রী বা পুরুষ) এই অংশগুলি ক্রমান্বয়ে অর্জন করেছিল এবং পরে তা বংশগতির মাধ্যমে কম-বেশী অসম্পূর্ণ অবস্থায় অন্যলিঙ্গেও সঞ্চারিত হয়ে ছিল। এ-রকম সঞ্চরণের ভূরিভূরি নজির আছে। যেমন, পুরুষ পাখিরা আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে বা তাদের সৌন্দর্যকে মোহময় করে তোলার জন্য যে কাঁটা (পায়ে), পালক ও উজ্জ্বল বর্ণ অর্জন করে থাকে, দেখা যায় সেগুলিই একদিন বংশগতির সাহায্যে মেয়েরাও পেয়ে গেছে। তবে মেয়েদের মধ্যে সেগুলি মোটেই যথাযথ বা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

৭। পুরুষ আইলাসিনাস্ এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্রঃ, "অ্যানাটমি অফ ভার্টিব্রেট্স্", খণ্ড ৩, পৃঃ ৭৭১।

৮। বিভিন্ন প্রজাতির সেরানাসদের (Serranus) মধ্যে এবং অন্যান্য কিছু মাছের মধ্যেও উভলিঙ্গতা দেখা গেছে। এদের মধ্যে এই উভলিঙ্গতা হয় স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথবা অস্বাভাবিক ও শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডঃ জুতেভীন্ এ-বিষয়ে আমাকে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য জানিয়েছেন, আর বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক হালবার্ট-স্মার একটি গবেষণাপত্রের দিকে (দ্রঃ, "ট্রান্জাক্শন্স অফ দ্য ডাচ্ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস", খণ্ড ১৬)। ডঃ গুন্থার এ-ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, এত বেশি সংখ্যক সুদক্ষ পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে এর স্বীকৃতি মিলেছে যে এখন আর এ সম্বন্ধে কোনরকম বিতর্ক করা চলে না। ডঃ এম. লেসোনা আমাকে লিখেছেন যে সেরানাসদের সম্বন্ধে ক্যাভোলিউই-র পরীক্ষাটি তিনি যাচাই করে দেখেছেন। অধ্যাপক এরকোলানি সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে বানমাছেরা উভলিঙ্গ (দ্রঃ, "Acad. delle Scienze", Bologna, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৭১)।

পুরুষ স্তন্যপায়ীদের দেহে নিষ্ক্রিয় ধরণের স্তন-সদৃশ অঙ্গের উপস্থিতি কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের (Monotremata) দেহে যথার্থ দুগ্ধ-উৎপাদক গ্রন্থি দেখা যায়। তাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু কোন বোঁটা থাকে না। আর এই জাতীয় প্রাণীরা যেহেতু স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অত্যন্ত তলার সারির জীব, তাই মনে হয় তাদের পূর্বপুরুষেরাও বোঁটাবিহীন স্তন-গ্রন্থির অধিকারী ছিল। তাদের বিকাশধারা থেকে বোঁটাবিহীন স্তনের ব্যাপারটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কলিকার ও লেঙ্গারের মতামত সম্পর্কে অধ্যাপক টার্নার আমাকে জানিয়েছেন যে, ভ্রূণের মধ্যে স্তন-বৃন্ত স্পষ্ট হওয়ার আগেই দুগ্ধগ্রন্থিকে স্পষ্টভাবে চেনা যায় এবং প্রাণীর পরম্পরাক্রমিক অংশগুলির বিকাশ সাধারণত তার বংশধারার পরম্পরাক্রমিক প্রাণীদের বিকাশের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণীদের স্তনে বোঁটা থাকায় স্পষ্টতঃই তারা হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের থেকে পৃথক গোত্রের প্রাণী। সম্ভবত এ-রকম দৈহিক অঙ্গ (বোঁটাযুক্ত স্তন) ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীরা হংসচঞ্চুদের থেকে বিচ্যুত হয়ে ও তাদের থেকে আরো এগিয়ে যাবার পরই প্রথম লাভ করেছিল, আর পরে তা বংশগতির নিয়মে বাচ্চা প্রসবকারী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।[৯] অথচ কেউই বলতে পারবেন না যে ক্যাঙারু সম্প্রদায় তাদের বর্তমান গঠন-আকৃতি লাভ করার পরও উভলিঙ্গই রয়ে গেছে। তাহলে পুরুষ স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কেন দুগ্ধগ্রন্থির দেখা মিলছে? সম্ভবত এই গ্রন্থি প্রথমে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিকশিত হয়ে পরে পুরুষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের আলোচনা অনুযায়ী এই ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি মতবাদের কথা বলা যাক। এই মতবাদ অনুযায়ী মনে করা হয় যে, সমগ্র স্তন্যপায়ীশ্রেণীর পূর্বপুরুষদের উভলিঙ্গতার জীবন শেষ হওয়ার দীর্ঘদিন পরেও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই দুগ্ধ উৎপাদন করত আর তা দিয়ে বাচ্চাদের প্রতিপালন করত। আর ক্যাঙারু-সদৃশ প্রাণীরা, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই, তাদের অঙ্কদেশের থলিতে বাচ্চা বহন করত। এই মতটা একেবারে

৯। অধ্যাপক জিগেন্‌বর দেখিয়েছেন যে সমগ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে দু'রকম স্তনবৃন্তের সন্ধান মেলে (দ্রঃ, "Jenaische Zeitschaift", Bd. vii, পৃঃ ২১২)। আর, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই দু'প্রকার স্তনবৃন্ত ক্যাঙারুজাতীয় প্রাণীদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল, আর ক্যাঙারু-জাতীয় প্রাণীরা নিশ্চয়ই তা অর্জন করেছিল হংসচঞ্চুজাতীয় প্রাণীদের থেকে। এই বিষয়ে আরো জানা যায় স্তনগ্রন্থি সম্বন্ধে ডঃ ম্যাক্স হাস্‌-এর স্মৃতিকথা থেকে (দ্রঃ, ঐ, B. viii, পৃঃ ১৭৬)।

অসম্ভব নয়, কেননা একরকম পুরুষ মাছ (syngnathous fishes) সত্যি সত্যিই তাদের পেটের নীচেকার থলিতে স্ত্রী-মাছের ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায় ; এমনকি কেউ কেউ মনে করেন যে, পরবর্তীসময়ে তারা ডিম-ফোটা-বাচ্চাদের লালন-পালন পর্যন্ত করে থাকে।[১০] কোন কোন জাতের পুরুষ মাছ আবার মুখের মধ্যে বা কানকোর মধ্যে ডিম রেখে বাচ্চা ফোটায়। কয়েকপ্রকার পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী-ব্যাঙের কাছ থেকে মালাকৃতি ডিমগুচ্ছ নিয়ে নেয়, তারপর সেগুলি তাদের উরুতে জড়িয়ে রাখে, যতদিন না ডিমফুটে ব্যাঙাচির জন্ম হয়। কিছু কিছু পুরুষ পাখি তো ডিমে তা দেবার সমস্ত দায়িত্ব একাই পালন করে থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী পায়রারা দানা খুঁটে খুঁটে তাদের বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। উপরোক্ত ধারণাটা আমার মাথায় প্রথম এসেছিল এই থেকে যে, পুরুষ স্তন্যপায়ীদের শরীরে জনন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক অংশের তুলনায় দুগ্ধগ্রন্থি অনেক বেশি বিকশিত হয়ে থাকে। যে দুগ্ধগ্রন্থি মূলতই নারী-শরীরের নিজস্ব ব্যাপার। পুরুষ স্তন্যপায়ীদের শরীরে দুগ্ধগ্রন্থি ও স্তনের বোঁটা যে অবস্থায় থাকে, তাতে তাকে আদৌ প্রাথমিক স্তরের লক্ষণ বলা যায় না। বড়জোর বলা যায় যে তা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি এবং কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থেকে গেছে। মেয়েদের মতো পুরুষদেরও এই অঙ্গগুলি (দুগ্ধগ্রন্থি ও স্তনের বোঁটা) বেশ কিছু রোগের শিকার হয়। অনেক সময় জন্মলগ্নে বা বয়ঃসন্ধিকালে তাদের স্তনে কয়েক ফোঁটা দুধ আসতেও দেখা যায় ; এই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারটি দেখা গিয়েছিল পূর্বোল্লিখিত সেই যুবকটির মধ্যে, যার শরীরে দু'জোড়া স্তনগ্রন্থি ছিল। কখনো কখনো মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুরুষদের মধ্যে এই অঙ্গগুলি বয়ঃপ্রাপ্তির সময়ে এত চমৎকার বিকাশ লাভ করে যে তা থেকে নিয়মিত দুগ্ধ নিঃসৃত হতে শুরু করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বহুদিন আগে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষ স্তন্যপায়ীরাও নবজাতককে প্রতিপালনের দায়িত্ব ভাগ করে

১০। মিঃ লক্‌উড্‌ হিপ্পোক্যাম্পাসদের বিকাশধারা লক্ষ্য করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (দ্রঃ, "কোয়ার্টার্লি জার্নাল অফ সায়েন্স, এপ্রিল, ১৮৬৮, পৃঃ ২৬৯) যে, তাদের পুরুষদের পেটের নিচেকার থলির (abdominal pauch) গা (walls) কয়েকদিক থেকে ভ্রূণ প্রতিপালনের উপযুক্ত। পুরুষ মাছেদের মুখে ডিম রেখে তা দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে অধ্যাপক ভাইম্যান্‌ তাঁর গবেষণা পত্রে (দ্রঃ, "প্রসিডিংস অফ বোস্টন সোসাইটি অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি", ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাছাড়া অধ্যাপক টার্ণার (দ্রঃ, "জার্ণাল অফ অ্যানাটমি অ্যাণ্ড ফিজিওলজি", ১ নভেম্বর, ১৮৬৬, পৃঃ ৭৮) ও ডঃ গুন্থার এ-বিষয়টি নিয়ে বিশদ্‌ আলোচনা করেছেন।

নিয়েছিল,[১১] এবং পরে কোন কারণে (হয়তো বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়) পুরুষরা এই কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল ; ফলে, ঐ-সব অঙ্গের অব্যবহার বয়ঃসন্ধিকালে সেগুলিকে একসময় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। আর বংশগতির দুটি সুবিদিত নিয়ম অনুসারে এই নিষ্ক্রিয়তা পরবর্তী সমস্ত প্রজন্মের পুরুষদের বয়ঃসন্ধির সময়ে ঐ অঙ্গগুলিকে নিষ্ক্রিয় করেই রেখেছে। কিন্তু ঐ বয়সের আগে পর্যন্ত এই অঙ্গগুলির উপর কোন প্রভাব না পড়ায় মেয়ে বা ছেলে যে-কোন বাচ্চার ক্ষেত্রেই এগুলি সমান বিকশিত অবস্থায় দেখা যায়।

উপসংহার ঃ ফনবার শরীরের বিভিন্ন অংশের বৈসাদৃশ্য ও বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে জীবের অগ্রগতি বা উন্নতির—এই সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই, জীবটি যখন পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে, তখনকার সম্বন্ধে—যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা অন্য যে-কোন ব্যাখ্যার থেকে অনেক বেশি নির্ভুল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে প্রাণীরা যেহেতু জীবনের নানান ধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়, সেহেতু তাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিভিন্ন কাজের জন্য আরও বেশি বেশি করে পৃথকীকৃত ও বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে। আর দৈহিক শ্রম-বিভাজন থেকে প্রাপ্ত সুবিধার দরুণই এটা ঘটে থাকে। সাধারণতঃ প্রথমে যে অঙ্গটি একটি মাত্র কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়, সেটিই বহুদিন পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি কাজের জন্য আবার পরিবর্তিত হয়। এইভাবে শরীরের সমস্ত অংশ বার বার পরিবর্তিত হতে হতে একসময় অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে কিন্তু প্রতিটি জীবের সঙ্গে তার আদি পূর্বপুরুষের গঠন-আকৃতির একটা সাদৃশ্য থেকেই যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন মেলে ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে। দেখা গেছে যে পৃথিবীতে সমস্ত জীবই ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে কতকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। সুবিশাল মেরুদণ্ডী জগতে এইভাবে এগোনোর সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে মানুষ। তবে এমন ভাবনা অর্থহীন যে, জীবগোষ্ঠীগুলি সর্বদাই অন্য কোন গোষ্ঠীকে হঠিয়ে নিজের জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্য এক প্রকার উন্নততর জীবের জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাই লোপাট হয়ে গেছে। বরং অনেক সময় দেখা যায় নতুন জীবেরা তাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে উন্নত হয়ে উঠলেও প্রকৃতির সঙ্গে সব জায়গায় ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। কিছু সেকেলে জীব (জন্ম সময় হিসেবে পৃথিবীতে যারা তালিকাভুক্ত) তাদের বসবাসের পক্ষে অনুকূল সংরক্ষিত অঞ্চলে টিকে

১১। মামোয়াজেল সি. রোয়ের-ও তাঁর "অরিজাইন ছ লোম্", ১৮৭০, গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন।

থেকেছে, যেখানে তাদের তীব্র জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়নি। সেইসঙ্গে এই প্রাণীরা আমাদের (মানুষের) বংশবৃত্তান্ত রচনার কাজে সাহায্য করে, কেননা এদের কাছ থেকেই তো আমরা ধারণা করতে পারি আগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ জীবের অস্তিত্ব ছিল এবং এখন কোন্ কোন্ প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বর্তমানে জীবিত কোন অনুন্নত শ্রেণীর জীবকে দেখে ধরে নেব না যে এরাই তাদের আদি পূর্বপুরুষদের হুবহু প্রতিচ্ছবি। এরকম ভাবটা নেহাতই ভুল হবে।

মেরুদণ্ডী জীবজগতের একেবারে আদি পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্টতা এখনও কাটেনি। খুব সম্ভবত তারা ছিল বর্তমানের অ্যাসিডিয়ান-শূককীটের (larvae) সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত একপ্রকার সামুদ্রিক জীব।[১২] এদের থেকেই সম্ভবত ল্যান্সলেট জাতীয় কিছু অনুন্নত মাছের সৃষ্টি হয়েছিল; পরে আবার ল্যান্সলেট জাতীয় মাছদের থেকে সৃষ্টি হয়েছে গ্যানেয়েড ও লেপিডসিরেন (দক্ষিণ আমেরিকার একরকম মাছ) জাতীয় অন্যান্য মাছ।

১২। সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবেরা জোয়ার-ভাঁটার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। যে-সব জীব উপরের ঘোলা জলে থাকে কিম্বা যে-সব জীব তলার ঘোলা জলে থাকে, তারা উভয়েই এক পক্ষ কালের মধ্যে পূর্ণ একটি জোয়ার-ভাঁটা-গত পরিবর্তনের আবর্তন শেষ করে। ফলে, প্রতি সপ্তাহেই তাদের খাদ্যের তালিকাও দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বহু প্রজন্ম অতিবাহিত করে আসার জন্যে এই ধরণের জীবদের সাপ্তাহিক প্রধান প্রধান কার্যকলাপের কোন ব্যতিক্রমই প্রায় হয় না। তবে এটা খুব রহস্যময় ব্যাপার যে বর্তমানে স্থলচর উন্নতশ্রেণীর মেরুদণ্ডপ্রাণী এবং অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে অনেক স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া এক বা একাধিক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। মেরুদণ্ডী জীবেরা যদি সামুদ্রিক অ্যাসি-ডিয়ানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, একমাত্র তাহলেই এই ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এরকম পর্যাবৃত্ত প্রক্রিয়ার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, স্তন্যপায়ীদের গর্ভধারণকাল, জ্বরের সময়সীমা ইত্যাদি। ডিমোতা দেওয়ার ব্যাপারটাও একটা চমৎকার উদাহরণ, কেননা মিঃ বার্লেট-এর মতে (দ্রঃ, "ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াটার", ৭ জানুয়ারী, ১৮৭১), পায়রার ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে দু'সপ্তাহ সময় লাগে, মুরগীর ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ, পাতিহাঁসের ক্ষেত্রে চার সপ্তাহ, রাজহংসীর ক্ষেত্রে পাঁচ সপ্তাহ এবং অষ্ট্রিচ্ পাখির ক্ষেত্রে সাত সপ্তাহ সময় লাগে। বিচার-বিবেচনা করে আমরা যতটা বুঝতে পারি, তাতে মনে হয় একদা অর্জিত কোন পুনরাবর্তনমূলক পর্যাবৃত্ত যদি মোটামুটিভাবে কোন প্রক্রিয়া বা ক্রিয়ার সঠিক সময় অনুযায়ী ফিরে ফিরে আসে, তবে তা বড়ো একটা পাল্টায় না। ফলে তা পরবর্তী প্রায় সমস্ত প্রজন্মের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে পারে। কিন্তু যদি ক্রিয়াটি পরিবর্তিত হয়, তাহলে নির্দিষ্ট সময়সীমারও পরিবর্তন ঘটে, আর তা এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেকটা হঠাৎই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্তটি যদি সঠিক হয়, তাহলে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ চেহারা নেয়। কারণ, প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর গর্ভধারণকাল, প্রতিটি পাখির ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটানো এবং এরকম আরও অনেক অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া এইসব প্রাণীদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে আমাদের প্রায়শই ধন্দে ফেলে দেয়।

হয়তো এরকমই এই ধরণের মাছেরা কিছুটা উন্নত হওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে উভচর প্রাণীর। পাখিদের সঙ্গে সরীসৃপদের যে একসময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। তারপর সরীসৃপদের সঙ্গে স্তন্যপায়ীদের মোটামুটি একটা সংযোগ ঘটিয়েছে হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীরা (monet remata)। কিন্তু বর্তমানে কারোর পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী ও সরীসৃপরা নিম্নশ্রেণীর দুই মেরুদণ্ডী, অর্থাৎ উভচর প্রাণী ও মৎস্য থেকে ঠিক কোন বংশধারা অনুযায়ী জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য স্তন্যপায়ী শ্রেণীর বিকাশের স্তরগুলি একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। যেমন, অতি প্রাচীনকালে হংসচঞ্চু জাতীয় প্রাণীদের (monotaemata) থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ক্যাঙারু সদৃশ প্রাণী (Marsupials), আর ক্যাঙারু-সদৃশ প্রাণীদের থেকে বাচ্চা-প্রসবকারী স্তন্যপায়ীদের (placental mammals) আদি পূর্বপুরুষের উদ্ভব হয়েছিল। এখান থেকে অগ্রগতি ঘটেছে লেমুরাইড শ্রেণীতে। আবার লেমুরাইড থেকে সিমিয়্যাড-এ পেঁছোতে খুব বেশি দেরি হয় নি। তারপর এই সিমিয়্যাডরা দুটি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদর গোষ্ঠী এবং পূর্ব গোলার্ধের বাঁদর গোষ্ঠী। অবশেষে, কোন এক সুদূর অতীতে, পূর্ব গোলার্ধের বাঁদর-কুল থেকে জন্ম নেয় জগতের বিস্ময় ও গৌরব—মানুষ!

আমরা এখানে মানুষের বংশ-বিবরণের একটি দীর্ঘ তালিকা পেলাম। তবে এই বংশবিবরণ হয়ত খুব রাজসিক নয়। অনেকে বলেন যে পৃথিবী যেন মানুষের আবির্ভাবের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছিল। কথাটা একদিক থেকে দারুণ সত্যি। কারণ মানুষের উদ্ভবের পিছনে রয়েছে বহু ধরণের পূর্বপুরুষের অবদান। এই জৈবিক শৃঙ্খলের মধ্যে কোন একটিমাত্র সূত্রও যদি গরহাজির থাকত, তাহলে মানুষ ঠিক আজকের চেহারায় এসে বোধহয় পেঁছোতে পারত না। ইচ্ছে করে চোখ বুজে না থাকলে, বর্তমান জ্ঞানের নিরিখেই সম্ভবত আমরা চিনে নিতে পারব কারা আমাদের আদি পিতৃ পুরুষ। আর আর তার জন্য আমাদের লজ্জিত হওয়ারও কিছু নেই। অত্যন্ত নিকৃষ্ট জীবেরাও আমাদের পায়ের তলাকার নিষ্প্রাণ ধূলিকণার থেকে অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী। পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি প্রাণীর সম্বন্ধে—তা সে প্রাণীটি যতই নিকৃষ্টমানের হোক না কেন—অনুসন্ধান করতে বসে তার চমৎকার গঠনকাঠামো আর বিশেষ গুণ দেখে উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে উঠবেনই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানুষের বিভিন্ন জাতি প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ও গুরুত্ব—

মানুষের বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়—মানুষের তথাকথিত জাতিগুলিকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে ভাগ করবার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—উপপ্রজাতি—একপ্রজাতির প্রবক্তা ও বহুপ্রজাতির প্রবক্তা—বৈশিষ্ট্যের সমধর্মিতা—একেবারে পৃথক পৃথক মানবজাতিগুলির মধ্যেও অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য—পৃথিবীতে প্রথম ছড়িয়ে পড়বার সময় মানুষের অবস্থা—প্রত্যেকটি জাতি একটি মাত্র জোড় থেকে সৃষ্টি হয় নি—বিভিন্ন জাতির বিলুপ্তি—বিভিন্ন জাতির গঠন—বিভিন্ন জাতির সদস্যদের মধ্যে যৌনমিলনের ফল—জীবনের বিভিন্ন অবস্থা—গত প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সামান্য প্রভাব—প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব খুবই সামান্য বা একেবারেই নেই—যৌন নির্বাচন।

তথাকথিত বিভিন্ন মানবজাতিকে নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো, শ্রেণী বিভাজনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে এদের মধ্যেকার তারতম্যের গুরুত্ব কতখানি আর কিভাবেই বা এই তারতম্যের সৃষ্টি হলো, তা অনুসন্ধান করে দেখা। দুই বা ততোধিক সমগোত্রীয় জীবকে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে, না ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে, প্রাণিতত্ত্ববিদরা তা নির্ধারণ করেন কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে। এগুলি হল—তাদের মধ্যে তারতম্যের পরিমান কতটা, এই তারতম্যগুলি শারীরিক কাঠামোর অল্প কয়েকটি অংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় নাকি বহু অংশেই দেখা যায়, এগুলির কোন শারীর বৃত্তিয় গুরুত্ব আছে কিনা, আর সবচেয়ে বড় কথা এগুলি অপরিবর্তনীয় কিনা। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অপরিবর্তনীয়তাকে প্রাণিতত্ত্ববিদরা অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করেন আর সেটাই তাঁরা খোঁজার চেষ্টা করেন। যখনই দেখানো যায় বা এমন সম্ভাবনা থাকে যে কোন জীব দীর্ঘসময় ধরে একইরকম রয়ে গেছে, তখন প্রজাতি হিসেবে তাকে প্রমাণ করতে অনেক সুবিধে হয়। আবার যে-কোন দু'রকম জীব যদি প্রথম মিলনের পর প্রজনন ক্ষমতা এতটুকুও হারিয়ে ফেলে বা তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতার অভাব দেখা দেয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে সেটা আসলে তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যেরই নিশ্চিত প্রকাশ। তাছাড়া, একই অঞ্চলে নিয়মিত বসবাস করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরণের জীব অবিমিশ্রিত থাকলে তা তাদের কিছুটা পরিমাণ পারস্পরিক প্রজনন

ক্ষমতার অভাব কিম্বা জন্তুদের ক্ষেত্রে পরস্পর জোড় বাঁধার ব্যাপারে বিমুখতার প্রমাণ হিসাবেই গণ্য হয়।

দুটি প্রজাতির মধ্যে যৌন মিলনের ফলে মিশ্রণের ব্যাপারটা ছাড়া, কোন একটা অঞ্চলে ভালোভাবে অনুসন্ধান করে যদি দেখা যায় যে দুটি নিকট সাদৃশ্যযুক্ত জীবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন ধরণের জীবের অস্তিত্ব সেখানে আদৌ নেই—তাহলে সেটা সম্ভবত তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসাবে প্রতিভাত হয়। আর এটা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অপরিবর্তনীয়তার থেকেও স্বতন্ত্র একটি বিবেচনার বিষয়, কারণ দুটি জীব অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হলেও তাদের উভয়ের মধ্যবর্তী কোন জীব তারা না-ও সৃষ্টি করতে পারে। আবার, ভৌগোলিক সীমা বিভাজনের কাজটি সবসময় যে সচেতন ভাবে করা হয় তা নয়, বরং বেশীরভাগ সময়ই অসচেতন ভাবে তা করা হয়ে থাকে। ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অঞ্চলে বসবাসকারী জীবদের—যেখানকার অন্য সব বাসিন্দাদের অধিকাংশই নিজস্ব স্বাতন্ত্র মণ্ডিত—দেখা হয় আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসাবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা তথাকথিত উন্নত বা প্রকৃত প্রজাতিদের থেকে ভৌগোলিক অঞ্চলগত জাতিগুলিকে পৃথক করার ব্যাপারে কোন সাহায্যই করে না।

সাধারণভাবে স্বীকৃত এই নীতিগুলিকে এবার মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক। একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন প্রাণীকে দেখে থাকেন, আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই মানুষকে দেখবো। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ফারাক কতটা, তা বোঝার জন্য আমরা নিজেদের পর্যবেক্ষণ করার দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার যে চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করেছি, তার উপর কিছুটা ভরসা রাখতেই হবে। এল্‌ফিন্‌স্টোন বলেছেন, ভারতবর্ষে গিয়ে প্রথম দর্শনেই কোন ইউরোপীয়ানের পক্ষে সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলিকে আলাদা করে চেনা সম্ভব না হলেও, কিছুদিন পর থেকেই তিনি বুঝতে পারেন যে তাদের মধ্যে দারুণ বৈসাদৃশ্য আছে।[১] একইভাবে কোন হিন্দুর (ভারতীয়র) পক্ষেও ইউরোপীয়ান জাতিগুলির মধ্যেকার বৈষম্য প্রথম দর্শনেই বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এমনকি অত্যন্ত স্বতন্ত্র মানবজাতিগুলির চেহারার মধ্যেও আশাতিরিক্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। ডঃ রল্‌ফ্‌স্‌ আমাকে লিখে লিখে জানিয়েছেন, তাছাড়া আমি নিজেও দেখেছি যে নিগ্রোদের কয়েকটি

১। "হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া", খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৩. চৈনিকদের সম্বন্ধে ফাদার রিপা-ও একই কথা বলেছেন।

গোষ্ঠীবাদে বাকি প্রায় সব গোষ্ঠীর লোকদের দেখতে অনেকটা ককেশিয়ানদের মতো। পারি-র নৃতত্ত্ববিষয়ক যাদুঘরে (Anthropolgique du Museum de Paris) সংরক্ষিত বিভিন্ন জাতির মানুষদের ছবি দেখে সহজেই এই সাদৃশ্য নির্ণয় করা যায়। এই ছবিগুলির অধিকাংশকেই ইউরোপীয়ানদের ছবি বলে মনে হয়। ছবিগুলি আমি যতজনকে দেখিয়েছি, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ জন তাই-ই বলেছেন। কিন্তু ছবির ঐ-সব মানুষকে চোখের সামনে দেখলে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্যই চোখে পড়বে। অর্থাৎ, চামড়া ও চুলের রঙ, মুখাবয়বের সামান্য পার্থক্য এবং অভিব্যক্তি—এইসব বিষয় আমাদের বিচারকে অনেকটাই প্রভাবিত করে থাকে।

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিভিন্ন জাতিগুলিকে খুটিয়ে বিচার বা তুলনা করলে তাদের একের সঙ্গে অপরের প্রচুর প্রভেদ চোখে পড়ে। যেমন, কেশ-বিন্যাসের ধরণ, শরীরের সমস্ত অংশের আপেক্ষিক অনুপাতের ক্ষেত্রে[২], ফুসফুসের ক্ষমতার ব্যাপারে, করোটির আকার ও আয়তনের ব্যাপারে, এমনকি মস্তিষ্কের ভাঁজের ক্ষেত্রেও।[৩] কিন্তু এইসব অসংখ্য পার্থক্যকে চিহ্নিত করা এক দুঃসাধ্য কাজ। তাছাড়া এই জাতিগুলি প্রত্যেকেই শারীরিক ক্ষমতা, নতুন জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নির্দিষ্ট কিছু রোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারেও পরস্পরের থেকে পৃথক। একইভাবে, তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলির পৃথক। এই মানসিক তারতম্য মুখ্যত তাদের আবেগমূলক কাজের ক্ষেত্রেই দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের একের সঙ্গে অপরের বুদ্ধিমত্তারও কিছুটা পার্থক্য থাকে। যদি কারোর পক্ষে তুলনা করে দেখার সুযোগ ঘটে তাহলে তিনি দেখতে পাবেন দক্ষিণ আমেরিকার স্বল্পভাষী, বিষণ্ণ প্রকৃতির আদিবাসীদের সঙ্গে স্ফূর্তিবাজ, বাক্‌পটু নিগ্রোদের পার্থক্য কী বিপুল! ঠিক একইরকম পার্থক্য রয়েছে মালয়দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পাপুয়ানদের, কিন্তু উভয়েই একই প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে আর তাদের বাসস্থানের মধ্যে ব্যবধান শুধু একফালি সমুদ্র।

প্রথমে আমরা সেইসব যুক্তিকে পরখ করে দেখবো, যেগুলি বিভিন্ন মানবজাতিকে

২। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ও ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন, "ইন্‌ভেষ্টিগেশনস্ ইন্ দ্য মিলিটারি অ্যাণ্ড অ্যান্‌থ্রপলজিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ অফ্ আমেরিকান সোল্‌জারস", লেখক—বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ২৯৮-৩৫৮ ; এবং "অন্ দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য লাংস", পৃঃ ৪৭১।

৩। উদাহরণস্বরূপ, মিঃ মার্শাল বর্ণিত জনৈক বুশ্‌ম্যান স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের বিবরণ (দ্রষ্টব্য "ফিল. ট্রান্সাক্ট.", ১৮৬৪, পৃঃ ৫১৯)।

পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসাবে ভাগ করার পক্ষে। তারপর বিচার করা যাবে বিপরীত যুক্তিগুলিকে। যদি কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কখনো কোন নিগ্রো, হটেনটট্, অস্ট্রেলিয় বা মঙ্গোলিয়ানকে না দেখে থাকেন এবং সেই না-দেখা অবস্থাতেই তাদের তুলনা করতে বসেন, তাহলে তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারবেন যে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটি হয়ত সামান্য, আবার অনেকগুলি যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান করলে তিনি জানতে পারবেন যে তারা প্রত্যেকে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত, এবং দৈহিক গঠন ও মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারেও তারা একে অপরের থেকে আলাদা। এরপর যদি তাঁর সামনে ঐ-সব দেশ থেকে নমুনা হিসেবে কয়েকটা লোককে হাজির করা হয়, তাহলে তিনি নির্দ্বিধায় বলে দেবেন যে এরা হচ্ছে অন্য অনেক প্রজাতির মতোই এক একটি প্রজাতি, আর নিজের অভ্যাসমতো তাদের এক একটা নামকরণও করে ফেলবেন, যখন তিনি শুনবেন এইসব লোকজন বেশ কয়েক'শ বছর ধরে একইরকম বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে, তখন তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হয়ে উঠবে। ৪000 বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে।[৪] ডঃ লুন্ড-এর মতো চমৎকার একজন গবেষকের কাছ থেকে তিনি আরো জানতে পারবেন যে ব্রাজিলের পার্বত্যগুহায় অনেক বিলুপ্ত স্তন্যপায়ী-প্রাণীর করোটির সঙ্গে মানুষের যে করোটি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আজকের দিনের গোটা আমেরিকা মহাদেশের মানুষদের করোটির অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। এবার হয়তো আমাদের এই প্রাণিতত্ত্ববিদটি বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় মানুষের

৪। আবো-সিম্বেলের বিখ্যাত মিশরীয় গুহাগুলি থেকে প্রাপ্ত মনুষ্যআকৃতি (figures) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ম'সিয়ে পাউসেট বলেছেন যে, অনেকেই দাবী করেন যে তারা এখানে বারো কি তারও বেশী মানব জাতির অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি (পাউসেট) তেমন কিছুই পাননি (দ্রঃ "দ্য প্লুর‍্যালিটি অফ্ দ্য হিউম্যান রেসেস্", ইংরাজী অনুবাদ ১৮৬৪, পৃঃ ৫০)। এমনকি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন কোন জাতিকেও ততটা নিঃসন্দেহে সনাক্ত করা যায় না, যতখানি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে ভেবে নেওয়া হয়। মিঃ নট্ ও মিঃ গ্রিডন জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বা দ্য গ্রেট র‍্যামেসিস্-এর চেহারা ছিল অনেকটাই ইউরোপীয়দের মতো। (দ্রঃ, "টাইপ্‌স্ অফ্ ম্যান্‌কাইণ্ড", পৃঃ ১৪৮)। অন্যদিকে, মানুষের বিভিন্ন জাতির পৃথক পৃথক নিজস্ব বৈশিষ্টের আরেকজন প্রবক্তা মিঃ নক্সও তরুণ মেম্‌নন্ (মিঃ বার্চ-এর কাছ থেকে যতদূর শোনা, তাতে মনে হয় ইনিই পরে দ্বিতীয় র‍্যামেসিস্ হয়েছিলেন) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক অ্যানতোর্পের ইহুদীদের মতো। আবার আমি নিজে যখন তৃতীয় অ্যামুনক্-এর মূর্তিটি পরিদর্শন করি, তখন সেখানকার যথেষ্ট অভিজ্ঞ দু'জন কর্মকর্তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম যে তৃতীয় অ্যামুনকের চেহারা অনেকটাই নিগ্রোদের মতো। কিন্তু মিঃ নট্ ও মিঃ গ্লিডন তাঁকে একজন বর্ণসংকর বলে মনে করলেও তাঁর মধ্যে "নিগ্রোরক্ত" ছিল বলে মনে করেন না।

ছড়িয়ে পড়ার দিকে মনোযোগ দেবেন, আর সম্ভবত বলে উঠবেন যে ঐ-সব মানুষেরা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির লোক, তাদের চেহারা আলাদা আলাদা রকম, এবং তারা প্রত্যেকেই গরম, স্যাঁতস্যাঁতে বা শুষ্ক অঞ্চলে ও উত্তরমেরুতে বাস করতে সক্ষম। তিনি হয়ত এ-কথাও বলতে পারেন যে মানুষের ঠিক পরের ধাপের প্রাণী, অর্থাৎ বনমানুষরা, যেমন শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি চতুষ্পদীরা কম উষ্ণতা বা জল-হাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না, আর মানুষের সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীরা কখনোই খুব বয়স্ক হয়ে ওঠে না, অর্থাৎ বেশিদিন বাঁচে না, এমনকি ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতেও নয়। আগাসিজের জানানো তথ্য থেকে তিনি হয়তো দারুণ প্রভাবিতও হতে পারেন। আগাসিজ্ লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন মানবজাতি পৃথিবীতে প্রাণীদের বসত উপযোগী সেইসব অঞ্চলেই (zoological provinces) ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যেগুলি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রজাতি ও বর্গের বাসস্থান। মানব জাতিগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান, মঙ্গোলিয়ান ও নিগ্রোজাতিকে দেখলে এই ধারণা স্পষ্ট হয়। হটেন্‌টট্‌দের মধ্যেও এর কিছুটা ছাপ দেখা যায়। কিন্তু পাপুয়ান আর মালয়দেশের অধিবাসীদের বেলায় ঘটনাটা সহজেই চোখে পড়ে। মিঃ ওয়ালেস দেখিয়েছেন যে এরা প্রায় সেভাবেই বিভক্ত, যেভাবে বিভক্ত মালয় আর অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্তুর বসত উপযোগী অঞ্চল। কিন্তু আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা (রেড ইণ্ডিয়ান) সারা মহাদেশ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা আমাদের উপরোক্ত প্রতিপাদ্যের বিরোধী। কেননা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে ফারাক অনেকটাই। তথাপি, আমেরিকার বৃক্ষবাসী ওপস্যামদের (opossum) মতো কিছু জীব এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় অবাধে, অতীতে যেমনভাবে ঘুরে বেড়াত বিশালাকৃতি কিছু দন্তহীন স্তন্যপায়ী প্রাণী। উত্তর মেরুর অন্যান্য প্রাণীদের মতো এস্কিমোরাও সারা মেরুপ্রদেশ জুড়ে তাদের বসতি স্থাপন করেছে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, প্রাণীদের বসত উপযোগী বিভিন্ন অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেকার পার্থক্যের পরিমাণ এস্কিমোদের বীভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার মাত্রার অনুরূপ নয়। কাজেই, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যতটা পার্থক্য, মানুষের অন্যান্য জাতিগুলির থেকে নিগ্রোদের পার্থক্য যে তার চেয়ে বেশি এবং আমেরিকানদের পার্থক্য যে অনেক কম—এটা মোটেই কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। এর সঙ্গে আরও বলা যায় যে মানুষ তার আদিম অবস্থায় কোন সামুদ্রিক দ্বীপে

বসতি গড়ে তোলেনি এবং এ-ব্যাপারে তার শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য নেই।

একই প্রকার গৃহপালিত জীবজন্তুদের যে বিভিন্ন রূপের কথা ভাবা হয়, সেগুলিকে সেইভাবেই শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে, নাকি পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কোন স্বতন্ত্র বন্য প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রত্যেক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ই এইসব প্রাণীদের শরীরে পৃথক পৃথক ধরণের বহিঃস্থ-পরজীবি আছে কিনা, তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। এই ব্যাপারটার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কেননা এটা প্রচণ্ড জরুরী বিষয়। মিঃ ডেনি আমাকে জানিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন ধরণের কুকুর, মুরগী ও পায়রারা একই প্রজাতির পরজীবি কীট (pediculi) বা উকুনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মিঃ এ. মুরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতের মানুষের শরীর থেকে সংগৃহীত পরজীবি কীট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তারা শুধু বর্ণের দিক দিয়েই আলাদা আলাদা নয়, তাদের বহিরাবরণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। নানা ধরণের পরজীবিদের নিয়ে বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে সবক্ষেত্রেই তাদের পার্থক্য একইরকম। প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি মাছ ধরার একটি জাহাজের শল্য-চিকিৎসক আমাকে জানিয়েছিলেন, একবার স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপের কিছু অধিবাসী জাহাজে উঠলে তাদের শরীরের পরজীবি কীটেরা ইংরেজ নাবিকদের শরীরেও ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবং তিন-চার দিনের মধ্যেই তাদের মৃত্যু ঘটেছিল। এই পরজীবি কীটেরা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং দক্ষিণ আমেরিকার চিলির অধিবাসীদের শরীরে যে-সব পরজীবি কীট দেখা যায়, তাদের থেকে এদের চেহারা আলাদা রকমের ছিল। এই চিলির পরজীবি কীটের কিছু নমুনা আমাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে এরা ইউরোপের উকুনদের থেকে আয়তনে অনেক বড় আর এদের দেহ অনেক নরম। মিঃ মুরে আফ্রিকা থেকে চার রকমের পরজীবি কীট (বা উকুন) সংগ্রহ করেছেন ; এদের মধ্যে দু'রকম উকুন পাওয়া গেছে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের নিগ্রোদের শরীর থেকে, আর বাকি দু'রকম পাওয়া গেছে হটেন্টট্ ও কাফ্রি জাতির মানুষদের শরীর থেকে। তাছাড়া তিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের শরীর থেকে দু'রকম, উত্তর আমেরিকা থেকে দু'রকম এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে থেকে দু'রকম পরজীবি কীটও সংগ্রহ করেছেন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে ধরে নেওয়া যায় পরজীবি কীটের দল বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকেই জন্ম নিয়েছে। পোকামাকড়দের ক্ষেত্রে

সামান্য আকৃতিগত তারতম্য যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পরজীবি কীটের দ্বারা মানবজাতিগুলির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থেকে এই যুক্তি দাঁড় করানো যায় যে মানব জাতিগুলি আসলে এক একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি।

আমাদের কল্পিত প্রাণিতত্ত্ববিদ মহাশয় নিশ্চয়ই এই অবধি অনুসন্ধান করার পর খুঁজতে শুরু করবেন যে মানুষের বিভিন্ন জাতির একের সঙ্গে অপরের যৌনমিলনের পর তারা কিছুটা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে কিনা। তিনি সম্ভবত অধ্যাপক ব্রকা-র মতো একজন সুবিবেচক ও দার্শনিকের রচনাপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন, আর তাহলে জানতে পারবেন যে, কিছু কিছু মানবজাতি অন্য মানব-জাতিদের সঙেগ যৌনমিলনে অটুট প্রজনন ক্ষমতা অধিকারী হলেও, বাকিদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঠিক বিপরীত। জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়ার আদিবাসী স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয়ান পুরুষদের সঙ্গে মিলনে ক্বচিৎ সন্তান প্রসব করে। অবশ্য এ-বিষয়ের প্রমাণগুলি এখন প্রায় অর্থহীন বলেই প্রতিভাত হয়েছে। কারণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গরা মিশ্র-বর্ণের শিশুদের মেরে ফেলে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবরণ থেকে জানা গেছে, এগারোটি মিশ্রবর্ণের শিশুকে একই সঙ্গে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং পুলিশ তাদের মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছে।[৫] আবার অনেক সময় বলা হয় যে শ্বেতকায় ও নিগ্রোর সংসর্গজাত ব্যক্তিরা (mulattoes) অসবর্ণ বিবাহ করলে বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। অন্যদিকে, চার্লস্‌টনের ডঃ বাখ্‌ম্যান সুনিশ্চিত করে বলেছেন যে তিনি শ্বেতকায় ও নিগ্রোর সংসর্গজাত এমন কিছু পরিবারের কথা জানেন যারা কয়েক পুরুষ ধরে অসবর্ণ বিবাহ করে আসছে এবং বিশুদ্ধ সাদা (ইউরোপীয়ান) বা বিশুদ্ধ কালো মানুষদের (নিগ্রো) সমান হারেই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। এর আগে স্যার সি. লাইয়েলও এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে একই

৫। দ্রঃ, মিঃ টি. এ. মুর্‌য়ো-র চিঠি "অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিয়ু, এপ্রিল, ১৮৬৮ পৃঃ ৫৩। এই চিত্তাকর্ষক চিঠিটিতে কাউন্ট স্ট্রেজেলেকির বক্তব্যকে তিনি ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। কাউন্ট স্ট্রেজেলেকি বলেছিলেন যে, যে-সব অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রীলোক শ্বেতাঙ্গদের সন্তান ধারণ করত, তারা পরে স্বজাতের সঙ্গে মিলনের সময় তাদের প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। মঁসিয় এ. দ্য ক্যাত্রেফাজও প্রচুর তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের মিলনে কারোরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় না। (দ্রঃ, "রেভো দে কুর সাঁইতিফিক্", মার্চ, ১৮৫৯, পৃঃ ২৩৯)।

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং আমাকে তা জানিয়েছিলেন।[৬] ডঃ বাখ্‌ম্যানের মতে, ১৮৫৪ সালে আমেরিকাতে যে লোকগণনা হয়েছিল, তাতে শ্বেতকায় ও নিগ্রোর সংসর্গজাত ৪০৫৭৫১ জন ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত করা হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনার তুলনায় সংখ্যাটা নেহাতই কম। এর আংশিক কারণ হয়তো তাদের মর্যাদাহীন ও বিশৃঙ্খল অবস্থা, এবং আর একটা কারণ হয়তো স্ত্রীলোকদের অসৎ চরিত্র। নিগ্রোদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সংকর জাতদের (mulattoes) অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলে। ফলে তাদের সংখ্যা আপাতভাবে হ্রাস পায়। এই সংকর জাতদের প্রাণশক্তি অপেক্ষাকৃত কম হওয়াটাকে একটি নির্ভরযোগ্য রচনায় একটা সুবিদিত ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হয়েছে; এই ব্যাপারটা যদিও তাদের দুর্বল প্রজননশক্তির থেকে স্বতন্ত্র একটা ব্যাপার, তথাপি এটাকে তাদের বাবা-মায়ের জাতির বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের লক্ষন বলে মনে করা যায়।[৭] সংকর প্রাণী ও সংকর উদ্ভিদরা যখন একেবারে পৃথক পৃথক প্রজাতির মিলনের ফলে সৃষ্ট হয়, তখন সাধারণত তারা অকালমৃত্যুর শিকার হয়। কিন্তু এই সংকর জাত মুলাটোদের বাবা-মাকে একেবারে পৃথক পৃথক প্রজাতির সদস্য বলে মনে করা যায় না। সাধারণজাতের খচ্চররা দীর্ঘ জীবন ও অটুট প্রাণশক্তির জন্য বিখ্যাত, অথচ তাদের জনন-ক্ষমতা খুবই কম। এ থেকে বোঝা যায় যে সংকর জাত প্রাণীদের দুর্বল প্রজনন ক্ষমতা ও জীবনীশক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। এরকম অনেক ঘটনাই দৃষ্টান্তস্বরূপ হাজির করা যায়।

এমনকি যদি পরে প্রমাণ করা যায় যে সমস্ত মানব জাতিগুলিরই যথেষ্ট প্রজনন ক্ষমতা ছিল, তাহলে অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে যিনি তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে চিহ্নিত করতে চান, তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন যে প্রজনন ক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্ব মোটেই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের উপযুক্ত মাপকাঠি নয়। আমরা জানি যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি জীবনের পরিবর্তিত অবস্থার দ্বারা বা ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে মিলনের ফলে সন্তান উৎপাদনের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং এগুলির পিছনে কাজ করে অত্যন্ত জটিল কিছু নিয়মাবলী। যেমন, দেখা যায়

৬। ডঃ রল্‌ফ্‌স্ আমাকে জানিয়েছেন, তিনি সাহারাতে যে-সব সংকরজাতি দেখেছিলেন, তারা আরব, বার্বার ও তিনটি গোষ্ঠীর নিগ্রো জাতির মিলনে উৎপন্ন; অথচ প্রতিটি জাতিই অসম্ভবরকম প্রজননক্ষমতা সম্পন্ন। অন্যদিকে, মিঃ উইন্‌হুড রিয়াদ আমাকে জানিয়েছেন, গোল্ড কোস্টের নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ ও সংকরজাত লোকদের পছন্দ করলেও, প্রবাদবাক্যের মতো মেনে চলে যে সংকরজাত লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করা উচিত নয়, তাহলে ছেলেমেয়ে কম হবে আর তারা দুর্বল হবে। মিঃ রিয়াদের মতে, নিগ্রোদের এই বিশ্বাস একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, কারণ শ্বেতাঙ্গরা গোল্ড কোস্ট-এ দীর্ঘ চারশ ধরে বসবাস করেছে, ফলে নিগ্রোরা তাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট সময়ই পেয়েছে।

৭। দ্রঃ, "মিলিটারি অ্যাণ্ড অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্ট্যাটিসটিক্স্ অফ আমেরিকান সোল্‌জারস", বি. এ. গোল্ড, ১৮৬৯, পৃঃ ৩১৯।

একই ধরণের দুটি প্রজাতির দুটি বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীরা যখন পরস্পরের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উভয় প্রজাতির প্রজননক্ষমতা সর্বদা সমান হয় না। প্রাণীদের মধ্যে যাদেরকে নিঃসন্দেহে প্রজাতি বলা যায় তাদের মধ্যে এক প্রজাতির সঙ্গে অপর প্রজাতির মিলনে উদ্ভূত প্রাণীদের মধ্যে একেবারে বন্ধ্যা থেকে শুরু করে দারুণ প্রজনন শক্তি সম্পন্ন সব ধরণই দেখা যায়। তবে, বন্ধ্যাত্বের মাত্রা বাবা-মায়ের বাহ্য-আকৃতি বা আচার-আচরণের মধ্যেকার তারতম্যের মাত্রার উপর নির্ভর করে না। অনেক ব্যাপারেই মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে গৃহপালিত জীবজন্তুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং প্যালাসিয়ান্ মতবাদের[৮] স্বপক্ষে একরাশ প্রমাণ হাজির করা যায়। এই মতবাদে বলা হয়,

৮। দ্রঃ, "দ্য ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যাল্‌স্ অ্যাণ্ড প্ল্যান্টস্ আণ্ডার ডোমেস্টিকেশন", খণ্ড ২, পৃঃ ১০৯। পাঠককে একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে অন্যদের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রজনন-বন্ধ্যাত্ব কোন বিশেষভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়। এটা অনেকটা কিছু উদ্ভিদের পরস্পরের সঙ্গে কলম বাঁধতে না পারার অক্ষমতার মতোই একটা ঘটনা, অর্থাৎ অন্যান্য কতকগুলি অর্জিত পার্থক্যের সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই। এই পার্থক্যগুলির প্রকৃতি কী ঠিক জানা যায় না, তবে এগুলি শারীরিক বা মানসিক গঠনের পার্থক্যগুলির ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না, যতটা দেখা যায় জননব্যবস্থার ক্ষেত্রে। সংকর প্রজাতিগুলির প্রজনন-অক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এই যে এরা উভয়েই বা এদের মধ্যে কোন একটি প্রজাতি দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থার মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত। কারণ আমাদের জানা আছে যে পরিবর্তিত অবস্থা জননক্রিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে, এবং যথেষ্ট সঙ্গতভাবেই আগে যেমন বলা হয়েছে আমরা ধরে নিতে পারি যে গৃহপালিত জীবনের নানান ওঠা-নামা সেই বন্ধ্যাত্বদশা দূর করে দেয়, যা বনে-জঙ্গলে থাকার সময় বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলনের ক্ষেত্রে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। অন্যত্র আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি ঐ একই গ্রন্থের ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫ এবং "অরিজিন অফ স্পিসীস", ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩১৭), সংকর প্রজাতিগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এই বন্ধ্যাত্ব অর্জন করে না। যখন দুটি প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা আগে থেকেই খুব কম থাকে, তখন তাদের এই অক্ষমতা যে আরো বেশি বন্ধ্যাত্বযুক্ত প্রাণীদের, অর্থাৎ তাদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ক্রমাগত বেড়েই চলবে—তা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব যত বেড়ে চলে, তাদের সন্তানের সংখ্যাও ততই কমে আসে, এবং অবশেষে দীর্ঘ সময় অন্তর ক্বচিৎ একটি-দুটি বাচ্চা হয়। কখনো-কখনো অবশ্য প্রজনন ক্ষমতা এর চেয়েও তীব্র সঙ্কটের মুখে পড়ে। মিঃ গার্টনার ও মিঃ কলরোটার উভয়েই দেখিয়েছেন যে অনেকগুলি প্রজাতিভুক্ত উদ্ভিদ বর্গের মধ্যে এমন একটা বিন্যাস দেখা যায়, যার মধ্যে অন্য প্রজাতির সঙ্গে মিলনের ফল হিসেবে অতি অল্প সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ থেকে শুরু করে একেবারে কোন বীজের জন্ম দেয় না অথচ অন্য প্রজাতিটির পরাগের দ্বারা প্রভাবিত হয় (যা পরিস্ফুট হয় বীজকোষের স্ফীতির মধ্যে)—এমন উদ্ভিদও আছে। এক্ষেত্রে, ইতিমধ্যেই বীজ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া কোন্ কোন্ উদ্ভিদ অধিকতর প্রজনন-অক্ষম, তা নির্ধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই, প্রজনন-অক্ষমতার চূড়ান্তস্তরটি, অর্থাৎ যখন শুধুমাত্র বীজকোষটিই প্রভাবিত হয়, তা প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ অর্জিত হতে পারে না। প্রজনন-অক্ষমতার এই চূড়ান্ত স্তরটি এবং এই অক্ষমতার অন্যান্য ধাপগুলিও হচ্ছে যৌনমিলনে লিপ্ত প্রজাতিগুলির জননব্যবস্থার গঠনের মধ্যেকার কিছু অজানা পার্থক্যেরই স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

প্রকৃতির মধ্যে খোলামেলা অবস্থায় বিভিন্ন প্রজাতির একের সঙ্গে অপরের মিলনের ফলস্বরূপ যে বন্ধ্যাত্ব দশা খুবই স্বাভাবিক, গৃহপালিত হওয়ার পর সেটা ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। সুতরাং এইসব বিচার-বিবেচনা করে সঙ্গতভাবেই বলা যায়—ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যৌন মিলনের ফলে সৃষ্ট মানবজাতিগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রজননক্ষমতা বজায় থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা তাদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারে না।

প্রজনন ক্ষমতার কথা ছাড়াও, সংকরজাতের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তা দিয়েই বিচার করা হয় তাদের বাবা-মাকে আলাদা আলাদা প্রজাতির সদস্য বলে ধরা হবে, নাকি একই প্রজাতির দুটি আলাদা বর্গের সদস্য বলে ধরা হবে। কিন্তু এ-বিষয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর আমার মনে হয়েছে যে এই ধরণের কোন সাধারণ নিয়ম থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংকর জাতের ছেলেমেয়েরা মিশ্র বা মাঝামাঝি প্রকৃতির হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা হয় বাবার মতো, নতুবা মার মতো দেখতে হয়। এই ব্যাপারটা সাধারণত তখনই দেখা যায়, যখন বাবা-মার বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই পার্থক্যগুলি গড়ে ওঠে কোন আকস্মিক রূপান্তর বা অস্বাভাবিকতা হিসেবেই। এখানে এ-কথা বলার কারণ হলো ডঃ রল্‌ফ্‌স্‌ আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি আফ্রিকার অনেক জায়গাতেই দেখেছেন নিগ্রো জাতির মানবদের সঙ্গে অন্যজাতির মিলনের ফলে জন্ম নেওয়া ছেলে-মেয়েরা হয় সম্পূর্ণ কালো, নতুবা সম্পূর্ণ সাদা, এবং ক্বচিৎ মিশ্রবর্ণের হয়। অন্যদিকে, আমেরিকাতে সাদা-কালো মানুষদের মিলনজাত ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই দুই বর্ণের মধ্যবর্তী কোন একটা বর্ণ ও চেহারাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন মানবজাতিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে মনে করতে পারেন। কারণ তিনি দেখেছেন তাদের আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পার্থক্য, আর এইসব পার্থক্যের মধ্যে কোন কোনটি যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই পার্থক্যগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। আবার, সমগ্র মানবজাতিকে একটিমাত্র প্রজাতি হিসেবে ধরে নিলে তার বিপুল বিস্তার দেখেও আমাদের প্রানিতত্ত্ববিদরা কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়বেন, কারণ স্তন্যপায়ীশ্রেণীর আর কোন প্রাণীই এত বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তথাকথিত বিভিন্ন জাতির ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়া দেখেও হয়তো তিনি বিস্ময়বোধ

করবেন। মানুষের এই ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা ঠিক স্তন্যপায়ীপ্রাণীদের অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রজাতিগুলির ছড়িয়ে পড়ার মতোই। আর অবশেষে তিনি হয়তো দাবী করবেন—পারস্পরিক মিলনে সমস্ত জাতিগুলির প্রজনন ক্ষমতার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি প্রমাণিত হয় নি আর সেটা প্রমাণ করা গেলেও সেটাকে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বলে ধরা যায় না।

অন্যদিকে, আমাদের এই প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মহাশয় যদি একটু খোঁজ-খবর করতেন যে একই দেশের মধ্যে নানা ধরণের মানুষ বিপুল সংখ্যায় মিলেমিশে যাওয়ার পরও মানুষের আকার সাধারণ কোন প্রজাতির মতো স্বতন্ত্রই থাকে কিনা, তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে তা আদৌ সম্ভব নয়। ব্রাজিলের দিকে চোখ রাখলে তিনি দেখতে পাবেন যে সেখানে নিগ্রো ও পর্তুগীজদের থেকে বিশাল এক সংকর-জনতা সৃষ্ঠি হয়েছে; চিলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের প্রায় সমস্ত মানুষই ইন্ডিয়ান ও স্প্যানিশদের সংসর্গজাত সংকর; অবশ্য মিশ্রণের পরিমাণে অনেক তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়।[৯] তাছাড়া ঐ মহাদেশের বহু অংশে তিনি এমন এক জটিল সংকর শ্রেণীর মানুষের দেখা পাবেন, যারা নিগ্রো, ইন্ডিয়ান ও ইউরোপীয়—এই তিন জাতির মিশ্রণজাত সংকর মানুষ। উদ্ভিদজগৎকে উদাহরণ হিসেবে ধরলে দেখা যাবে, এধরণের ত্রি-সংকরায়ণের মধ্যেই তাদের মূল রূপগুলির পারস্পরিক প্রজনন ক্ষমতার সবথেকে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে তিনি একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাবেন, যা সৃষ্টি হয়েছে পলিনেশিয়ান ও ইংরেজ রক্তের মিশ্রণের ফলে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে তিনি যে সংকর-জাতির দেখা পাবেন, তারা হচ্ছে পলিনেশিয়ান ও নিগ্রোদের মিশ্রণজাত। এরকম অনেক ঘটনার কথাই বলা যায়। যেমন, আফ্রিকা মহাদেশে এ-রকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানবজাতিগুলি পরস্পরের থেকে এতটা পৃথক নয় যাতে করে তারা একই অঞ্চলে বসবাস করেও পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত না হয়ে থাকতে পারে, আর মিশ্রণ না ঘটলে সেটা তাদের নির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবেই প্রতিভাত হয়।

সমস্ত জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুলি যে ভীষণরকম পরিবর্তনশীল এটা অনুভব করার পর আমাদের প্রাণিতত্ত্ববিদটি আবারও বিব্রত হয়ে পড়বেন। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ব্রাজিলের নিগ্রো দাসদের যিনি প্রথম

৯। ব্রাজিলের পলিস্তা জাতির সাফল্য ও কর্মোদ্দীপনার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন মসিয় দ্য কাত্রেফাজ (দ্রঃ "অ্যানথ্রপলজিক্যাল রিভিয়ু", জানুয়ারি ১৯৬৯, পৃঃ ২২)। এরা হচ্ছে পর্তুগীজ ও ইণ্ডিয়ানদের মিলনের ফলে সৃষ্ট বর্ণসংকর জাতি। সেইসঙ্গে অন্যান্য কিছু জাতির রক্তও এদের শরীরে বিদ্যমান।

দেখছেন, তাঁকে-ই এ-ব্যাপারটি নাড়া দিতে বাধ্য। এই একই কথা বলা চলে পলিনেশিয়ান এবং আরো অনেক জাতি সম্বন্ধে। এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, যা শুধু একটি জাতিরই একান্ত নিজস্ব এবং অপরিবর্তনীয়—তাতে সন্দেহ আছে। এমনকি একই গোষ্ঠীভুক্ত বন্য মানুষদের সকলের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না, অথচ অনেকেই জোরগলায় বলে থাকেন যে এদের সকলকার মধ্যে একইরকম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। হটেন্‌টট্‌ জাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে এমন কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেগুলি ঠিক সেইভাবে অন্যজাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের এই বৈশিষ্ট্যও কোন অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। অনেক আমেরিকান গোষ্ঠীর সদস্যদের গাত্র বর্ণ ও শরীরের রোমশতা পরস্পরের থেকে যথেষ্ট আলাদা আলাদা হয়। আবার আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে পরস্পরের থেকে গাত্রবর্ণের ক্ষেত্রে কিছুটা এবং মুখাবয়বের ক্ষেত্রে অনেকটাই পার্থক্য চোখে পড়ে। কোন কোন জাতির মধ্যে আবার করোটির গড়নে যথেষ্ট তফাৎ দেখা যায়।[১০] অন্যান্য নানান বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও এ-রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সব প্রাণিতত্ত্ববিদই এখন অনেক ঠেকে শিখেছেন যে পরিবর্তনশীল কিছু বৈশিষ্ট্যকে সম্বল করে বিভিন্ন প্রজাতিকে চিহ্নিত করাটা স্রেফ গোঁয়ার্তুমি। তবে, মানব জাতিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে মনে করার বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়, আর সেই মিশ্রনটা বহুক্ষেত্রেই তাদের পারস্পরিক যৌনমিলন ব্যতিরেকেই ঘটে থাকে। অন্য যে-কোন প্রাণীর থেকে মানুষকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা সত্ত্বেও, তাকে একটিমাত্র প্রজাতি বা জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হবে কিনা, তা নিয়ে সুযোগ্য বিচারকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন দুটি (ভিরে), কেউ বলেন তিনটি (জ্যাকিনো), কেউ বলেন চারটি (কান্ট), কেউ পাঁচ (ব্লুমেন্‌বাখ্‌), কেউ বা ছ'টি (মিঃ বাফন), সাতটি (হান্টার), আটটি (আগাসিজ্‌), এগারো (পিক্যারিং), কারো মতে পনেরোটি (বরিসেন্ট ভিন্‌সেন্ট), ষোলটি (ডেস্‌মোর্টলিন্‌স্‌), বাইশটি (মর্টন), ষাটটি (ক্রুফার্ড) এবং বার্কের মতে তেষট্টিটি। অবশ্য এই মত পার্থক্যের দরুণ জাতিগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়া আটকায় না, কিন্তু এ থেকে একটা কথা

১০। যেমন দেখা যায় আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে। অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন (দ্রঃ, "ট্রানজাকশনস অফ ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ প্রিহিস্টোরিক আর্কিওলজি" ১৮৬৮, পৃঃ ১০৫), দক্ষিণ জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের অনেক অধিবাসীর করোটি "ঠিক তাতারদের করোটির মতোই ছোট এবং চওড়া" ইত্যাদি।

স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়, এবং তাদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব।

নানা ধরণের জীবের বিশদ বিবরণ জানার চেষ্টা করেছেন যে-সব প্রাণিতত্ত্ববিদ্, তাঁদের প্রত্যেককেই মানুষের বিবরণের মত অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে (নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি), আর সতর্ক স্বভাবের প্রাণিতত্ত্ববিদরা পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়া সমস্ত জীবকে একটি মাত্র প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত না করে পারেন না। কারণ, যে-সব জীবকে তিনি সনাক্তই করতে পারছেন না, তাদের নামকরণ করার অধিকারই বা তিনি কোথায় পাবেন ? এ ধরণের ঘটনা চোখে পড়ে বাঁদরদের কিছু বর্গের ক্ষেত্রে, যার মধ্যে মানুষও পড়ে। আবার, সারকোপিথেকাস জাতীয় বর্গের বাঁদরদের অধিকাংশ প্রজাতিকে সুনিশ্চিতভাবেই চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে, আমেরিকার সেবুস্-বর্গের বাঁদরদের বিভিন্ন ধরণগুলিকে কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ চিহ্নিত করেছেন পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে, আবার অন্যদের মতে এরা বিভিন্ন ভৌগোলিক জাতিমাত্র, স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে থেকে যদি বেশ কিছু সেবুসজাতীয় বাঁদর, সংগ্রহ করে আনা যেত তাহলে দেখা যেত যে যত তারা একটু একটু করে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, আর তখন তাদের নিছক কিছু পরিবর্তিত ধরণ বা জাতি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। মানুষের বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গে অধিকাংশ প্রাণিতত্ত্ববিদ এই একই নীতি অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে যে অন্তত উদ্ভিদজগতে[১১] এমন কিছু নমুনা দেখা যায়, যাদের ভিন্ন প্রজাতি না বলে উপায় নেই। অবশ্য তারা (ঐ-সব উদ্ভিদ) পারস্পরিক মিলন ব্যতীতই একে অপরের সঙ্গে অসংখ্য ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সম্প্রতি কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে 'উপ-প্রজাতি' শব্দটি ব্যবহার করছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, এদের অনেক বৈশিষ্ট্যই প্রকৃত প্রজাতির মতো হলেও, এদেরকে পুরোপুরি প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া যায় না। এখন, মানুষের বিভিন্ন জাতিকে প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া, আর পাশাপাশি তাদেরকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার অনতিক্রম্য সমস্যার ব্যাপারে ওপরে যে-সব জোরালো যুক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি—তার আলোতে বিচার করে দেখলে মনে হয় এক্ষেত্রে এই 'উপ-প্রজাতি' শব্দটি খুবই লাগসই। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের

১১। অধ্যাপক নজেলি তাঁর "Botanische Mittheilungen" গ্রন্থের খণ্ড ২, পৃঃ ২৯৪-৩৬৯-এ এরকম বেশ কিছু ঘটনার কথা বিবৃত করেছেন। উত্তর আমেরিকার কিছু উদ্ভিদের অন্তর্বর্তী রূপ সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন আসা গ্রে।

দরুণ 'জাতি' শব্দটিকে সম্ভবত এত সহজে তুলে দেওয়া যাবে না। একই পরিমাণ পার্থক্যের জন্য সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব একই শব্দ ব্যবহার করাটাই কাম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা খুব কম সময়েই করা যায়। কারণ প্রাণীদের বড়ো মাপের বর্গ বা মহাজাতি সাধারণত নিকট সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণীদের নিয়েই গড়ে ওঠে, ফলে তাদের মধ্যে প্রভেদ করাও খুব কঠিন কাজ; অন্যদিকে, একই গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র বর্গের মধ্যে থাকে এমন সব জীব, যাদের মধ্যেকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই এদের সকলকেই প্রজাতির মর্যাদা দেওয়া উচিত। আবার, বৃহৎ কোন বর্গের অন্তর্গত প্রজাতিগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঠিক একইরকম সাদৃশ্য থাকে না। বরং বিপরীতে তাদের কোন কোন প্রজাতিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে অন্য প্রজাতিগুলির চারপাশে বিন্যস্ত করা যায়—ঠিক যেন গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ। মানবজাতি কি একটি মাত্র প্রজাতি নাকি অনেকগুলি প্রজাতির সমন্বয়—সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে নৃতত্ত্ববিদরা বিস্তর আলোচনা চালিয়েছেন। স্পষ্টতই তাঁরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন—এক-প্রজাতির সমর্থক ও বহুপ্রজাতির সমর্থক। বিবর্তনবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরা প্রজাতিগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্ট জীব বলে, কিম্বা কোন-না-কোন ভাবে স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলে মনে করেন। অন্যান্য জীবকে প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সাধারণত যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাঁদের স্থির করতে হবে কোন্ কোন্ ধরণের মানুষকে তাঁরা প্রজাতি বলবেন। কিন্তু যতক্ষণ না 'প্রজাতি' শব্দটির একটা সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ ধরণের প্রয়াস অর্থহীন। মানুষের জন্মের মতো কোন অনির্ণীত বিষয়কে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। দেখা যায়, নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা ছাড়াই আমরা স্থির করে ফেলতে চেষ্টা করি কিছু সংখ্যক বাড়ির সমষ্টিকে গ্রাম, শহর না নগর—কী বলা হবে। যে-সব নিকট সাদৃশ্যযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আর উদ্ভিদ যথাক্রমে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে দেখা যায়, তাদেরকে প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না ভৌগোলিক জাতি হিসেবে—এ এক চিরন্তন সমস্যা, আর এর মধ্যে আমাদের উপরোক্ত সমস্যারই একটা নজির খুঁজে পাওয়া যায়। কোন মহাদেশের সামান্য দূরে অবস্থিত বহু দ্বীপের উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

অন্যদিকে, যে-সব প্রাণিতত্ত্ববিদ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী (এখন এঁদের সংখ্যাই বেশি), তাঁরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে মানুষের সমস্ত জাতিগুলি একটি আদিম বংশ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে। এইসব জাতির

মধ্যেকার পার্থক্যের মাত্রা বোঝানোর জন্য তাদেরকে তাঁরা স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করবেন কিনা—সেটা আলাদা ব্যাপার। আমাদের গৃহপালিত বা পোষ-মানা বিভিন্ন জাতের জীবজন্তুরা একটিই প্রজাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে না একাধিক প্রজাতি থেকে—সে প্রশ্নটা একটু অন্যরকম। অবশ্য স্বীকার করে নেওয়াই যায় যে সমস্ত জাতিগুলি এবং একই বর্গের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতিগুলি একই আদিম বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তথাপি এ বিষয়টা নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার। যেমন, গৃহপালিত কুকুরদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখন যতটা পার্থক্য দেখা যায়, তা কি মানুষের হাতে প্রথম কোন একটি প্রজাতির কুকুরদের পোষমানার পর থেকে তারা অর্জন করেছে? অথবা, তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য কি স্বতন্ত্র কোন প্রজাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত, যে প্রজাতিটি তারা পোষমানার আগেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল? অবশ্য মানুষের বেলায় এরকম কোন প্রশ্ন ওঠেনা, কারণ সে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে গৃহবাসী হয়ে ওঠেনি।

প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যখন একটি মাত্র বংশ থেকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হতে শুরু করেছে, তখন জাতিগুলির মধ্যেকার পার্থক্য, আর সেই সঙ্গে তাদের সংখ্যাও নিশ্চয়ই কম ছিল। ফলে তাদের মধ্যে তখন পরস্পরের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য এখনকার জাতিগুলির থেকেও কম ছিল, আর তাই তাদেরকে আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করাটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু, 'প্রজাতি' শব্দটিকে আমরা বড় যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে থাকি। আদিম যুগের ঐ-সব জাতির মধ্যে যে-সব অত্যল্প পার্থক্য ছিল, সেগুলি যদি এখনকার তুলনায় আরও অপরিবর্তনীয় হত এবং ঐ-সব জাতি যদি পরস্পরের সঙ্গে মিশে না যেত —তাহলে কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদ হয়ত তাদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবেই চিহ্নিত করে দিতেন।

যদিও সম্ভাবনা দূর রহিত, তবু বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেবার নয় যে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ছিল, এবং এই অবস্থা ততদিন পর্যন্ত বজায় ছিল, যতদিন না বর্তমানের যে-কোন জাতির তুলনায় তাদের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সমধর্মী হয়ে ওঠে—বলেছেন ফগ্ট্। মানুষ যখন কোন বিশেষ কাজের জন্য দুই স্বতন্ত্র প্রজাতির দুটি বাচ্চাকে নির্বাচন করে, তখন সেই কাজের মধ্যে একসঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় তাদেরকে দেখতেও অনেকটা একরকম হয়ে যায়। ফন নাথুসায়াস দেখিয়েছেন, দুটি স্বতন্ত্র প্রজাতির মিলনজাত

উন্নত জাতের শূয়োরদের এটা খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। উন্নতজাতের গবাদি পশুদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা কিছুটা দেখা যায়। বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ গ্র্যাটিওলেট্ বলেছেন যে অ্যান্থ্রোপমরফাস জাতের বাঁদররা কোন আলাদা উপ-শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না ; কিন্তু ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জি এবং গরিলারা হচ্ছে যথাক্রমে গিবন্ বা সেম্নোপিথেকাস, ম্যাকাকাস এবং ম্যান্ড্রিল জাতের বাঁদরদের অত্যন্ত উন্নত সংস্করণ। প্রায় পুরোপুরি ভাবে মস্তিষ্কের গঠনভিত্তিক এই সিদ্ধান্তটিকে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা অন্তত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমধর্মীতার একটা প্রমাণ হাতে পাই। কারণ অ্যান্থ্রোপমরফাস জাতের বাঁদরদের সঙ্গে অন্যজাতের বাঁদরদের যতখানি সাদৃশ্য থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাদৃশ্য থাকে তাদের পরস্পরের মধ্যে। যাবতীয় তুলনামূলক সাদৃশ্যকে, যেমন তিমি মাছের সঙ্গে কোন সাধারণ মাছের সাদৃশ্যকে, এই সমধর্মীতারই প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য এই সমধর্মীতা শব্দটিকে কখনোই ভাসাভাসা বা অভিযোজনগত সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। তবে, একেবারে পৃথক পৃথক প্রজাতির পরিবর্তিত বংশধরদের আকৃতিগত নানান সাদৃশ্যকে সমধর্মীতা হিসাবে দেখাতে গেলে তা নেহাতই হঠকারিতা হয়ে দাঁড়ায় আমরা জানি স্ফটিকের আকৃতি নির্ধারিত হয় তার অণুগুলির শক্তির দ্বারা, আর অনেকসময় বিভিন্ন বিসদৃশ উপাদানও একই রকম আকার নিয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু জীবজগতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। প্রতিটি জীবের আকার কেমন হবে, তা নির্ভর করে অসংখ্য জটিল সম্পর্কের উপর, যেমন রূপান্তরের উপর, আর এইসব সম্পর্কের কারণগুলি খুঁজে বার করাও অত্যন্ত দুরূহ। এগুলি নির্ভর করে বজায় থাকা নানান রূপান্তরের উপর, এইসব রূপান্তরের বজায় থাকা আবার নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার উপর, এবং আরও বেশি করে নির্ভর করে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত চারপাশের জীবসমূহের উপর। আর শেষতঃ তা নির্ভর করে অসংখ্য পূর্বপুরুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের উপর (এই বৈশিষ্ট্য কোন অনড় ব্যাপার নয়, সারাক্ষণই তার মধ্যে নানান ওলোট-পালোট চলে)। ঐ-সব পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকের শারীরিক আকৃতিও একইরকম জটিল সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই নির্ধারিত হত। দুটি জীব যদি পরস্পরের থেকে বহুলাংশে পৃথক ধরণের হয়, তাহলে পরবর্তীকালে তাদের পরিবর্তিত আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট বংশধরদের সমস্ত ব্যাপারে প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠার ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। একটু আগে দুটি ভিন্ন জাতির শূকরদের সমধর্মী হয়ে ওঠার যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

সে ব্যাপারে ফন নাথুসায়াস জানিয়েছেন যে, এরা যে শূকরদের দুটির অতি প্রাচীন বংশ থেকে উদ্ভূত, তার প্রমাণ তাদের করোটির কয়েকটি হাড়ের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। অন্যদিকে, কিছু প্রাণিতত্ত্ববিদের কথামতো মানবজাতিগুলি যদি দুই বা ততোধিক প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে—যে প্রজাতিগুলির মধ্যে ওরাংদের সঙ্গে গরিলাদের যতটা পার্থক্য, ততটা বা প্রায় ততটা পার্থক্য ছিল—তাহলে নিশ্চয়ই বর্তমান সময়েও বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে কিছু হাড়ের গঠন-কাঠামোয় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত।

যদিও এখনকার এই মানবজাতিগুলির মধ্যে গাত্রবর্ণ, চুল, করোটির আকৃতি, দেহের অনুপাত ইত্যাদি নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তবুও তাদের সমগ্র গঠন-আকৃতিকে বিচার করে দেখলে অনেক ব্যাপারেই তাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের অনেকগুলিই একেবারে গুরুত্বহীন বা অনন্য প্রকৃতির হয়ে থাকে। ফলে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে আদিম যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বা জাতি কর্তৃক এগুলি পৃথক পৃথকভাবে অর্জিত হয়েছিল। এই একই কথা বলা চলে পরস্পরের থেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র মানবজাতিগুলির মধ্যে মানসিক বিষয়ের নানান সাদৃশ্য সম্বন্ধেও। আমেরিকার আদিবাসী, নিগ্রো বা ইউরোপীয়ানদের পরস্পরের মধ্যেকার মানসিক পার্থক্য যে-কোন তিনটি পৃথক জাতির মতোই। তাসত্ত্বেও, 'বিগ্‌ল্‌' জাহাজে কিছু ফুজিয়ানের সঙ্গে থাকার সময় তাদের দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ; তাদের অনেক ছোট ছোট মানসিক বৈশিষ্ট্য ঠিক আমাদেরই (ইউরোপীয়ানদের) মতো। এমনকি আমার পরিচিত এক নিগ্রো-যুবার সঙ্গেও আমাদের এরকম মিল আমার চোখে পড়েছে। মিঃ টাইলর এবং স্যার জে. লুবকের প্রবন্ধগুলি যিনি পড়বেন, তিনি নিশ্চয়ই রুচি, মেজাজ ও অভ্যাসের ব্যাপারে সমস্ত মানবজাতিগুলির মধ্যে আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। তাদের আনন্দের বিষয়গুলির মধ্যেও এই সাদৃশ্য বর্তমান ;—তারা সকলেই যেমন নাচতে ভালোবাসে, তেমনি ভালোবাসে হাল্কা গান শুনতে, অভিনয় করতে, ছবি আঁকতে, উল্কি পরতে এবং অঙ্গসজ্জার দ্বারা নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে। এমনকি পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের ভাষা হিসেবে তারা যে-সব আকার-ইঙ্গিত করেও সেখানেও দেখা যায় যে মুখের একই রকম ভঙ্গী প্রকাশ পাচ্ছে ; আনন্দ বা দুঃখের বাহ্যপ্রকাশও একইরকম। এই সাদৃশ্য, বা বলা ভালো এই অভিন্নতাকে বিভিন্ন রকম বাঁদরদের বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গী ও সুখ-দুঃখের চিৎকার ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে অবাক হতে হয়। তীর-ধনুকের প্রয়োগ-কৌশল যে একই আদি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে

মানুষের হাতে আসে নি, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাসত্ত্বেও দেখা যায়, ওয়েস্ট্রপ ও নিলসন যেমন বলেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উম্ধার করা বহু প্রাচীন যুগের পাথরের তীর-ফলাগুলি দেখতে প্রায় একইরকম। এই ঘটনা থেকে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন জাতির মানুষদের উদ্ভাবনী শক্তি বা মানসিক ক্ষমতা প্রায় একইরকম হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রাও প্রাচীনকালের কিছু অতি প্রচলিত অলংকার (যেমন, সর্পিলাকৃতি অলংকার) ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত নানান বিশ্বাস ও প্রথা সম্বন্ধে (যেমন, মৃতদেহ কবর দিয়ে তার উপর পাথরের চূড়া নির্মাণ ইত্যাদি) একই ধারণা পোষণ করেন। মনে আছে দক্ষিণ আমেরিকাতে আমি দেখেছিলাম, এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা যায়, স্মরণীয় কোন ঘটনার স্মৃতি হিসেবে বা মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার জন্য ঐ-সব জায়গার বাসিন্দারা সাধারণতঃ উঁচু পাহাড়-চূড়োয় পাথরের স্তম্ভ তৈরী করে রাখে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা যখন দুই বা ততোধিক জাতের গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে বা নিকট সম্পর্কযুক্ত অ-গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে অভ্যাস, রুচি ও মেজাজের অসংখ্য ছোট ছোট সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন, তখন তাঁরা ঐ-সব সাদৃশ্যকে এইসব গুণবিশিষ্ট একই পূর্বপুরুষ থেকে এই জাতিগুলির উদ্ভূত হওয়ার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। আর তাই এদের সকলকেই তাঁরা একটি মাত্র প্রজাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মানবজাতিগুলির ক্ষেত্রে এ-কথা আরো বেশি করে সত্যি।

বিভিন্ন মানবজাতির দৈহিক আকৃতি ও মানসিক বৃত্তির মধ্যে (একই রকম প্রথার কথা এখানে বলছি না) অসংখ্য স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন যে-সব সাদৃশ্য চোখে পড়ে, সেগুলি যে প্রত্যেকটি জাতি আলাদা আলাদাভাবে অর্জন করেছিল—তা মেনে নেওয়া যায় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি (স্বল্প গুরুত্বের সাদৃশ্য) তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই বংশগতভাবে লাভ করেছে। এভাবেই আমরা পৃথিবীর বুকে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বার আগে মানুষের প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। বিভিন্ন সমুদ্রের তীরে তীরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে দুস্তর ব্যবধান যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিপুল পার্থক্যের জন্ম দেয়। তা না হলে একই জাতির মানুষদের হয়ত নানান মহাদেশেই বসবাস করতে দেখা যেত। কিন্তু তা দেখা যায় না। স্যার জে. লুবক্‌ পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের বন্য জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত কলা-কৌশলগুলির তুলনা করে দেখানোর পর সেই সব কৌশল-গুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, যেগুলি মানুষ তার আদি বাসস্থান

ছেড়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত জানত না। কারণ এগুলি একবার শিখলে ভুলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেইজন্য স্যার লুবক্ বলেছেন, বর্শা যা হচ্ছে সুচালো-মুখ ছোরার উন্নত সংস্করণ এবং মাথাওয়ালা ভারী দণ্ড যা আসলে দীর্ঘ হাতল-যুক্ত হাতুড়িরই উন্নত সংস্করণ—আদি বাসস্থান ছেড়ে যাওয়ার আগে মাত্র এই দুটি উপকরণেই অভ্যস্ত ছিল মানুষ।" অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে সম্ভবত আগুন জ্বালানোর কৌশলও ততদিনে মানুষ শিখে নিয়েছিল, কারণ বর্তমানের সমস্ত জাতিই আগুন জ্বালাতে জানে, এমনকি ইউরোপের প্রাচীন গুহাবাসীদেরও এই বিদ্যাটি জানা ছিল। কাজ-চালানো গোছের ডোঙা বা ভেলা বানাবার কৌশলও সম্ভবত তাদের আয়ত্বে ছিল। কিন্তু সেই সুদূর যুগে অনেক জায়গারই ভূমিতল ঠিক আজকের মতো ছিল না, ফলে অনেক সময়ই তারা ডোঙার সাহায্য ছাড়া কেবল পায়ে হেঁটেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল বলে মনে হয়। স্যার জে. লুবক্ আরো বলেছেন, এ কথাটা একেবারেই অবাস্তব যে আমাদের আদি পূর্বপুরুষেরা নাকি "দশ (সংখ্যা) অবধি গুণতে পারত, কারণ এখনও পর্যন্ত অনেক জাতির লোকজনেরা চারের বেশি গুণতে পারে না।" তাসত্ত্বেও, সেই প্রাচীন যুগে মানুষের মননগত ও সামাজিক গুণগুলি আজকের দিনের নিম্নতম স্তরের বন্য জাতিগুলির তুলনায় খুব একটা নিকৃষ্ট মানের ছিল না। অন্যথায় তাদের পক্ষে জীবন-সংগ্রামে এত সাফল্য লাভ করা সম্ভব ছিল না, আর তাদের দ্রুত ও ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে সেই সাফল্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কতকগুলি ভাষার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য বিচার করে কিছু ভাষাতত্ত্ববিদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ যখন প্রথম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন সে কথা বলতে জানত না। তবে এ কথা মনে করার মতো কারণও আছে যে, এখনকার যে-কোন ভাষার তুলনায় একেবারে প্রাথমিক স্তরের হলেও, তাদেরও একটা ভাষা ছিল, যা তারা ব্যবহার করত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী সহযোগে, আর তাসত্ত্বেও সেই ভাষা পরবর্তীকালের উন্নততর ভাষাগুলির উপর কোন ছাপ ফেলে নি। যত প্রাথমিক স্তরেরই হোক না কেন, কোন একটা ভাষার অস্তিত্ব না থাকলে সেই সুদূর অতীতে মানুষ প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ আসনে আরোহন করতে পারত কি না—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আদিম মানুষ যখন মোটাদাগের কয়েকটি মাত্র কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং যখন তার ভাষা ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের—তখনকার সেই অবস্থায় তাকে আদৌ মানুষ বলা যাবে কি না,তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমরা কোন্ সংজ্ঞা

ব্যবহার করছি, তার উপর। বাঁদর-সদৃশ জীব থেকে ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে ঠিক কখন সে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছোল যখন থেকে তাকে "মানুষ" নামে অভিহিত করা যাবে, তা বলা নিতান্তই অসম্ভব। তবে, এ আলোচনা এখানে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। একথা আবার বলছি, তথাকথিত মানবজাতিগুলিকে জাতিই (Race) বলা হবে, নাকি তাদেরকে প্রজাতি (Species) বা উপজাতি (Subspecies) নামে চিহ্নিত করা হবে—তাতে কিছু যায় আসে না। তবে, 'উপ-প্রজাতি' শব্দটিই এক্ষেত্রে বেশি যুক্তিযুক্ত। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বিবর্তনবাদ যখন সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে (আশাকরি ভবিষ্যতে আরো বেশী স্বীকৃতি পাবে), তখন নিশ্চয়ই মানবজাতিগুলিকে একটিমাত্র প্রজাতি হিসেবে দেখার মতাবলম্বী আর তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে দেখার মতাবলম্বীদের মধ্যেকার বিবাদ আপনা থেকেই মিটে যাবে।

আরো একটা প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। প্রশ্নটা হল—মানুষের প্রত্যেকটা উপ-প্রজাতি বা জাতি একজোড়া আদি মানব-মানবী থেকে সৃষ্টি হয়েছে কি না। আমাদের পোষা জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে কোন একটি জোড়ের থেকে উদ্ভূত তারতম্যযুক্ত দুটি স্ত্রী-পুরুষকে সতর্কভাবে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে মিলন ঘটালে, অথবা এমনকি নতুন ধরণের কোন বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একটিমাত্র প্রাণী থেকেও, একটা নতুন জাতি সহজেই সৃষ্টিকরা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানবজাতি সচেতন-ভাবে নির্বাচিত কোন স্ত্রী-পুরুষের জোড় থেকে সৃষ্টি হয় নি, সৃষ্টি হয়েছে বহু নরবা নারীকে অসচেতনভাবে টিকিয়ে রাখার ফলেই, যাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় পার্থক্য ছিল। যদি এমন হয় যে একটি দেশের জল-হাওয়া বড় আর তেজী ঘোড়াদের পক্ষে দারুণ উপযুক্ত, এবং অন্য একটি দেশের জল-হাওয়া ছোট মাপের রোগা-পাতলা ঘোড়াদের পক্ষে উপযুক্ত, তাহলে কালক্রমে দুটি পৃথক উপ-প্রজাতির সৃষ্টি হবে, আর তা সৃষ্টি করার জন্য এই উভয় দেশের কোনটিতেই একটিও স্ত্রী-পুরুষ জোড়কে আলাদা করে নিয়ে তাদের থেকে আলাদা করে বাচ্চার জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। অনেক জাতিই এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে, আর তাদের এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজাতিগুলির গড়ে ওঠার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। আমরা এ-ও জানি যে, যে-সব ঘোড়াকে ফক্‌ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলি ক্রমে ক্রমে হ্রস্বাকার ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর যে-সব ঘোড়ারা পালিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমিতে, তাদের উত্তরপুরুষ ক্রমে ক্রমে লম্বা-চওড়া এবং বড় ধরণের মাথার হয়ে উঠেছিল। স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, এ ধরণের

করেছে ; আর ঐ দ্জন মিলে মাত্র তিনটি স্তানের জন্ম দিতে পেরেছিল।
এই ধরণের অস্বাভাবিক ঘটনার কারণ কী, তা বলতে গিয়ে ডঃ স্টোরি মন্তব্য করেছেন যে ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের সভ্য করে তোলার চেষ্টা করার ফলেই তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত বেড়ে উঠেছিল। "যদি তাদেরকে নিজেদের অভ্যাস মতো অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হত, তাহলে তারা আরও বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারত এবং তাদের মৃত্যুর হারও অনেক কম হত।" আদি বাসিন্দাদের জীবনের আর একজন মনোযোগী পর্যবেক্ষক মিঃ ডেভিস বলেছেন, "এদের জন্মের হার কম আর মৃত্যু অসংখ্য। হয়ত এর একটা বড় কারণ হল তাদের বসবাসের অবস্থার ও খাদ্যের পরিবর্তন। কিন্তু ভ্যান ডিয়েমেন্স্ ল্যান্ডের মূল ভূখণ্ড থেকে তাদের নির্বাসন আর তার ফলস্বরূপ তাদের মনোবল ভেঙে পড়াটা ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ" (বন্উইক্)।
অস্ট্রেলিয়ার একেবারে দু'প্রান্তের দুটি জায়গাতেও একই ঘটনা দেখা গিয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ অভিযাত্রী মিঃ গ্রেগারী, মিঃ বন্উইক্কে বলেছিলেন যে কুইন্সল্যান্ডে "কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সন্তান জন্মের হার খুবই কমে গেছে, এমনকি একেবারে হাল আমলে যে-সব জায়গায় বসতি গড়ে উঠেছে, সে-সব জায়গাতেও। ফলে, এবার এরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করবে।" শার্ক্স্ উপসাগর অঞ্চলের যে তেরো জন আদিবাসী মার্চিন্সন নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বারোজনই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।
মিঃ কেন্টন তাঁর একটা সুলিখিত প্রতিবেদনে নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের জনসংখ্যা কমে আসার ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর ঐ প্রতিবেদন থেকেই নিম্নলিখিত যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (শুধু একটি তথ্য ছাড়া)। ১৮৩০ সালের পর থেকেই যে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে চলেছে, তা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন—এমনকি ওখানকার বাসিন্দারা পর্যন্ত। আর এই কমে যাওয়ার প্রক্রিয়া লাগাতারই চলছে। ওখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রকৃত লোকগণনার কাজ আজ পর্যন্ত চালানো না গেলেও, বেশ কিছু জেলার অধিবাসীরা নিজেরাই কিছু হিসেব হাজির করেছে। এইসব হিসেব যথেষ্টই নির্ভরযোগ্য। এ থেকে দেখা যায়, ১৮৫৮ সালের আগের চোদ্দবছরে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ১৯·৪২ শতাংশ। ওখানকার অনেক গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে দূরে বসবাস করত—কেউ থাকত সমুদ্র উপকূলে, কেউ বা উপকূল থেকে দূরে। তাদের জীবনযাপনের উপকরণ আর আচার-

অভ্যাসের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য ছিল। ১৮৫৮ সালে এদের মোট জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ৫৩ হাজার ৭০০ জন। তার চোদ্দ বছর পরে, ১৮৭২ সালে, আবার গণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার ৩৫৯ জনে, অর্থাৎ লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৩২.২৯ শতাংশ। এর পিছনে যে যে কারণ থাকতে পারে, যেমন নতুন নতুন রোগ, নারীদের ব্যভিচার, অত্যধিক সুরাসক্তি, যুদ্ধ ইত্যাদি—এ-সব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে মিঃ ফেন্টন বলেছেন যে ঐ বিপুল হারে লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টাকে এইসব কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যথেষ্ট যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, নারীদের বন্ধ্যাত্ব এবং অল্পবয়সী বাচ্চাদের অত্যধিক পরিমাণে মারা যাওয়াই হচ্ছে এর মূল কারণ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮৪৪ সালে যেখানে প্রতি ২.৫৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছু একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, সেখানে ১৮৫৮ সালে সংখ্যাটা নেমে এসেছিল প্রতি ৩.২৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছু একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্কে। প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হারও ছিল খুবই বেশি। নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অসমতাকেও তিনি লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা ঐ অঞ্চলে মেয়ের তুলনায় ছেলেই বেশি জন্মাত। এই শেষোক্ত বিষয়টা নিয়ে পরবর্তী কোন পরিচ্ছেদে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। নিউজিল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা কমে যাওয়া আর আয়ার্ল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া—এই দুটো ব্যাপারকে সবিস্ময়ে তুলনা করেছেন মিঃ ফেন্টন। এই দুটো দেশের জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই, আর দুই দেশের বর্তমান বাসিন্দাদের আচার-অভ্যাসও অনেকটা একইরকম। মাওরিরা নিজেরাই "বলে যে তাদের ক্ষয়প্রাপ্তির একটা কারণ হল নতুন ধরণের খাদ্য আর পোশাক চালু হওয়া, এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটা।" অবস্থার পরিবর্তন প্রজননক্ষমতার উপর কতটা প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে তাদের ধারণায় সম্ভবত কোন ভুল নেই। এদের লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। মিঃ ফেন্টন দেখিয়েনে, শস্যকে (ভুট্টা) অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তা দিয়ে পচে-ওঠা খাদ্য বানানোর কৌশল তারা ১৮৩০ সাল নাগাদই আবিষ্কার করেছিল এবং ব্যাপাকভাবে কাজে লাগাতে শুরু করেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, নিউজিল্যাণ্ডে যখন মাত্র অল্প কিছু ইউরোপিয়ান গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই ওখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটা অভ্যাসগত পরিবর্তন। ১৮৩৫ সালে আমি যখন বে অফ

যেমন, জমিতে কৃষিকাজ শুরু করা হলে সেটা অ-সভ্য জাতিগুলির পক্ষে একটা সর্বনাশা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তারা নিজেদের অভ্যাস পাল্টাতে পারে না বা পাল্টাতেও চায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন কিছু রোগ আর কদভ্যাসও তাদের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে, এদের মধ্যে নতুন কোন রোগ ছড়িয়ে পড়লে সেই রোগের আক্রমণে জীবনহানির সংখ্যা বেড়েই চলে, আর ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যাদের সবচেয়ে বেশি, তারা সবাই মারা না-যাওয়া পর্যন্ত এই মরণ-দৌড় বন্ধ হয় না। চোলাই মদের ক্ষতিকর প্রভাবেও একই ঘটনা ঘটতে পারে, কারণ বহু অ-সভ্য জাতির মধ্যেই এই চোলাই মদ সম্বন্ধে একটা অদম্য আসক্তি থাকে। তাছাড়াও দেখা গেছে (ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়ই বটে) দুটি স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জাতির মধ্যে প্রথম মিলন ঘটার পর তাদের মধ্যে নানান অসুখ মাথাচাড়া দেয়। মিঃ স্প্রোট্, যিনি ভ্যাঙ্কুবার দ্বীপপুঞ্জে এই বিলুপ্তির বিষয়টাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি বলেছেন—ঐ দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয়রা অনুপ্রবেশ করার পর থেকেই ওখানকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন অভ্যাস বদলাতে শুরু করে, আর তার ফলে দেখা দেয় রোগ, স্বাস্থ্যহানি। তাছাড়া তিনি আপাতভাবে তুচ্ছ এই কারণটার উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন যে সেখানকার আদি বাসিন্দারা "তাদের চারপাশে এক নতুন জীবনের ছাপ দেখে হতচকিত ও স্থূলবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল ; কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করার প্রেরণাটাই হারিয়ে ফেলেছিল তারা, আর তার জায়গায় অন্য কোন নতুন প্রেরণার সন্ধানও পায়নি।"

একটা জাতি সভ্যতার কোন স্তরে আছে, তা অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার জয়লাভের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মাত্র কয়েকশ বছর আগেও ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের বর্বর জাতিগুলির আকস্মিক আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। কিন্তু আজ এরকম ভীতি নেহাতই হাস্যকর। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করার মতো। মিঃ বেগহট দেখিয়েছেন যে আজকের দিনে অ-সভ্য জাতিগুলি আধুনিক সভ্য জাতিগুলির কাছে যত সহজে পরাভূত হয়, প্রাচীন আমলের সভ্য জাতিগুলির (classical nations) কাছে কিন্তু তারা তত সহজে পরাভূত হত না। তা যদি হত, তাহলে সে আমলের নীতিবিদরা এ বিষয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ বর্বরদের সম্বন্ধে তখনকার কোন লেখকের রচনাতেই কোনরকম বিলাপ ফুটে ওঠেনি। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কোন জাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পিছনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছে দুর্বল প্রজননক্ষমতা আর ভগ্নস্বাস্থ্য, বিশেষত

শিশুদের ভগ্নস্বাস্থ্য। এগুলির পিছনে আবার কাজ করে জীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তন, এমনকি সেই নতুন অবস্থা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও ফলটা একই হয়। এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এবং এ-ব্যাপারে আমাকে অনেক তথ্য সরবরাহ করার জন্য আমি মিঃ এইচ. এইচ. হাওয়র্থ-এর কাছে ঋণী। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা আমি সংগ্রহ করেছি। ইংরেজরা যখন প্রথম তাসমানিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তাসমানিয়ার জনসংখ্যা ছিল কারো কারো মতে প্রায় ৭ হাজার, আবার কারো কারো মতে প্রায় ২০ হাজার। মূলত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আর তাছাড়া নিজেদের মধ্যে হানাহানি করার ফলে সেখানকার জনসংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই খুব কমে যায়। সমস্ত উপনিবেশিকরা মিলে একসময় তাসমানিয়ার মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। এই ঘটনার পর ওখানকার অবশিষ্ট বাসিন্দারা যখন সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১২০ জনে। ১৮৩২ সালে এদেরকে ফ্লিণ্ডার্স দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাসমানিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জটি চল্লিশ মাইল লম্বা আর বারো থেকে আঠারো মাইল চওড়া। জায়গাটা এমনিতেই স্বাস্থ্যকর, তাছাড়া সরকার ঐ-সব মানুষদের ভালভাবে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে। ১৮৩৪ সালে তাদের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় (বনউইক্-এর হিসেব অনুযায়ী) সাতচল্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, আটচল্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্কা নারী আর ষোলটি শিশুতে, অর্থাৎ মোট ১১১ জনে। ১৮৩৫ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ১০০ জনে। যেহেতু তাদের সংখ্যা অতি দ্রুত কমে আসছিল, এবং যেহেতু তারা নিজেরা মনে করত যে অন্য কোথাও থাকলে তারা এত দ্রুত শেষ হয়ে যেত না—তাই ১৮৪৭ সালে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাসমানিয়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থ অয়েস্টার খাঁড়ি অঞ্চলে। সেই সময় (২০ ডিসেম্বর, ১৮৪৭) তাদের লোকসংখ্যা ছিল চোদ্দজন পুরুষ, বাইশ জন নারী আর দশটি শিশু। কিন্তু এই স্থান পরিবর্তনের ফলে তাদের কোন লাভই হল না। রোগ আর মৃত্যু তাদের সঙ্গে লেগেই রইল ছায়ার মতো। ১৮৬৪ সালে এসে এদের মধ্যে সাকুল্যে বেঁচে ছিল মাত্র একজন পুরুষ (যে ১৮৬৯ সালে মারা যায়) আর তিনজন বর্ষীয়সী মহিলা। সকলকার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া, মৃত্যু—এ-সবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল নারীদের বন্ধ্যাত্ব। অয়েস্টার খাঁড়ি অঞ্চলে যখন মাত্র ন'জন নারী জীবিত ছিল, সেই সময় তারা মিঃ বনউইক্কে বলেছিল যে তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন জীবনে সন্তানধারণ

করেছে ; আর ঐ দুজন মিলে মাত্র তিনটি সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছিল।
এই ধরণের অস্বাভাবিক ঘটনার কারণ কী, তা বলতে গিয়ে ডঃ স্টোরি মন্তব্য করেছেন যে ঐ অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের সভ্য করে তোলার চেষ্টা করার ফলেই তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত বেড়ে উঠেছিল। "যদি তাদেরকে নিজেদের অভ্যাস মতো অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হত, তাহলে তারা আরও বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারত এবং তাদের মৃত্যুর হারও অনেক কম হত।" আদি বাসিন্দাদের জীবনের আর একজন মনোযোগী পর্যবেক্ষক মিঃ ডেভিস বলেছেন, "এদের জন্মের হার কম আর মৃত্যু অসংখ্য। হয়ত এর একটা বড় কারণ হল তাদের বসবাসের অবস্থার ও খাদ্যের পরিবর্তন। কিন্তু ভ্যান ডিয়েমেনস্ ল্যান্ডের মূল ভূখণ্ড থেকে তাদের নির্বাসন আর তার ফলস্বরূপ তাদের মনোবল ভেঙে পড়াটা ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ" (বনউইক)।
অস্ট্রেলিয়ার একেবারে দু'প্রান্তের দুটি জায়গাতেও একই ঘটনা দেখা গিয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ অভিযাত্রী মিঃ গ্রেগারী, মিঃ বনউইককে বলেছিলেন যে কুইন্সল্যান্ডে "কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সন্তান জন্মের হার খুবই কমে গেছে, এমনকি একেবারে হাল আমলে যে-সব জায়গায় বসতি গড়ে উঠেছে, সে-সব জায়গাতেও। ফলে, এবার এরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করবে।" শার্কস্ উপসাগর অঞ্চলের যে তেরো জন আদিবাসী মার্চিনসন নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বারোজনই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।
মিঃ কেন্টন তাঁর একটা সুলিখিত প্রতিবেদনে নিউজিল্যান্ডের মাওরিদের জনসংখ্যা কমে আসার ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর ঐ প্রতিবেদন থেকেই নিম্নলিখিত যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (শুধু একটি তথ্য ছাড়া)। ১৮৩০ সালের পর থেকেই যে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে চলেছে, তা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন—এমনকি ওখানকার বাসিন্দারা পর্যন্ত। আর এই কমে যাওয়ার প্রক্রিয়া লাগাতারই চলছে। ওখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রকৃত লোকগণনার কাজ আজ পর্যন্ত চালানো না গেলেও, বেশ কিছু জেলার অধিবাসীরা নিজেরাই কিছু হিসেব হাজির করেছে। এইসব হিসেব যথেষ্টই নির্ভরযোগ্য। এ থেকে দেখা যায়, ১৮৫৮ সালের আগের চোদ্দবছরে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ১৯·৪২ শতাংশ। ওখানকার অনেক গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে দূরে বসবাস করত—কেউ থাকত সমুদ্র উপকূলে, কেউ বা উপকূল থেকে দূরে। তাদের জীবনযাপনের উপকরণ আর আচার-

অভ্যাসের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য ছিল। ১৮৫৮ সালে এদের মোট জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ৫৩ হাজার ৭০০ জন। তার চোদ্দ বছর পরে, ১৮৭২ সালে, আবার গণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৬ হাজার ৩৫৯ জনে, অর্থাৎ লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৩২·২৯ শতাংশ। এর পিছনে যে যে কারণ থাকতে পারে, যেমন নতুন নতুন রোগ, নারীদের ব্যভিচার, অত্যধিক সুরাসক্তি, যুদ্ধ ইত্যাদি—এ-সব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে মিঃ ফেণ্টন বলেছেন যে ঐ বিপুল হারে লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টাকে এইসব কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যথেষ্ট যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, নারীদের বন্ধ্যাত্ব এবং অল্পবয়সী বাচ্চাদের অত্যধিক পরিমাণে মারা যাওয়াই হচ্ছে এর মূল কারণ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮৪৪ সালে যেখানে প্রতি ২·৫৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছু একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল, সেখানে ১৮৫৮ সালে সংখ্যাটা নেমে এসেছিল প্রতি ৩·২৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক পিছু একজন করে অপ্রাপ্তবয়স্কে। প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুর হারও ছিল খুবই বেশি। নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অসমতাকেও তিনি লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা ঐ অঞ্চলে মেয়ের তুলনায় ছেলেই বেশি জন্মাত। এই শেষোক্ত বিষয়টা নিয়ে পরবর্তী কোন পরিচ্ছেদে একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। নিউজিল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা কমে যাওয়া আর আয়ার্ল্যাণ্ডে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া—এই দুটো ব্যাপারকে সবিস্ময়ে তুলনা করেছেন মিঃ ফেণ্টন। এই দুটো দেশের জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই, আর দুই দেশের বর্তমান বাসিন্দাদের আচার-অভ্যাসও অনেকটা একইরকম। মাওরিরা নিজেরাই "বলে যে তাদের ক্ষয়প্রাপ্তির একটা কারণ হল নতুন ধরণের খাদ্য আর পোশাক চালু হওয়া, এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটা।" অবস্থার পরিবর্তন প্রজননক্ষমতার উপর কতটা প্রভাব ফেলে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে তাদের ধারণায় সম্ভবত কোন ভুল নেই। এদের লোকসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। মিঃ ফেণ্টন দেখিয়েনে, শস্যকে (ভুট্টা) অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তা দিয়ে পচে-ওঠা খাদ্য বানানোর কৌশল তারা ১৮৩০ সাল নাগাদই আবিষ্কার করেছিল এবং ব্যাপাকভাবে কাজে লাগাতে শুরু করেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, নিউজিল্যাণ্ডে যখন মাত্র অল্প কিছু ইউরোপিয়ান গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই ওখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটা অভ্যাসগত পরিবর্তন। ১৮৩৫ সালে আমি যখন বে অফ

আইল্যান্ডস-এ যাই, তখনই দেখেছিলাম যে সেখানকার বাসিন্দাদের পোশাক আর খাদ্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারা তখন আলু, ভুট্টা আর অন্যান্য কৃষিজ ফসল উৎপন্ন করত, এবং ইংরেজদের বিভিন্ন পণ্য ও তামাকের সঙ্গে সেইসব ফসলের বিনিময় করত।

বিশপ প্যাটেসন্-এর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, নিউ হেব্রাইড এবং তার সন্নিহিত দ্বীপগুলির মেলানেশিয়ানদের ধর্ম-প্রচারক হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিউজিল্যান্ড, নরফোক দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল।

স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের আদি বাসিন্দাদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটাও নিউজিল্যান্ডের ঘটনার মতোই ভয়াবহ। এ ব্যাপারে যাঁরা যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁদের মতে—১৭৭৯ সালে কুক্ যখন এই দ্বীপপুঞ্জটি আবিষ্কার করেন, তখন এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে একটা মোটামুটি লোকগণনা করা হয়। দেখা যায়, লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫০ জনে! ১৮৩২ সালে এবং তার পরেও কয়েকবার সরকারি উদ্যোগে যথাযথভাবে লোকগণনা করা হয়েছে। আমি শুধু নিম্নলিখিত তথ্যটুকুই সংগ্রহ করতে পেরেছি :

বছর	আদিবাসী লোকসংখ্যা (একমাত্র ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬-এর মধ্যবর্তী সময়টুকু বাদে ; ঐ সময় দ্বীপের অল্প কিছু বিদেশীকেও লোক-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।)	লোকসংখ্যা হ্রাসের বার্ষিক শতকরা হার : ধরে নেওয়া হচ্ছে যে দুটি লোক গণনার মধ্যবর্তী সময়ে এই হারের কোন পরিবর্তন ঘটে নি ; এইসব লোকগণনা অনিয়মিত সময়ের ব্যবধানে করা হয়েছে।
১৮৩২	১৩০,৩১৩	৪·৪৬
১৮৩৬	১০৮,৫৭৯	২·৪৭
১৮৫৩	৭১,০১৯	০·৮১
১৮৬০	৬৭,০৮৪	২·১৮
১৮৬৬	৬৮,৭৬৫ }	
১৮৭২	৫১,৫৩১ }	২·১৭

দেখা যাচ্ছে, চল্লিশ বছরের মধ্যে (১৮৩২ থেকে ১৮৭২) লোকসংখ্যা কমে গেছে ৬৮ শতাংশ! অধিকাংশ লেখক এই ঘটনার যে-সব কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলি হল—নারীদের ব্যভিচার, আগেকার আমলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, পরাজিত গোষ্ঠীগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া বিপুল শ্রমের বোঝা এবং নতুন নতুন রোগের সূত্রপাত, যে রোগগুলি অনেক সময় মারাত্মক রূপ নিয়েছে। এইসব কারণ এবং আরও কিছু কারণ যে এ-ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমে যাওয়ার জন্যও হয়ত এইসব কারণই দায়ী। কিন্তু এ-ব্যাপারে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রজননক্ষমতা কমে যাওয়া। আমেরিকান নৌ-বাহিনীর ডঃ রাশ্চেনবার্গার ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এইসব দ্বীপ পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের একটি জেলায় ১১৩৪ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ২৫ জনের আর অপর একটি জেলায় ৬৩৭ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ১০ জনের পরিবারে তিনটি করে সন্তান ছিল। ৮০ জন বিবাহিতা মহিলার মধ্যে মাত্র ৩৯ জন সন্তান ধারণে সক্ষম হতে পেরেছিল। আর, "সরকারি হিসেব মতে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি দম্পতির গড়ে আধজন করে সন্তান আছে।" অয়েস্টার খাঁড়ির তাসমানিয়ানদের মধ্যেও সন্তানের গড় সংখ্যাটা ঠিক এ-রকমই। জার্ভেস—যাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থটি ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় —বলেছেন, "যে-সব পরিবারে তিনটি করে সন্তান আছে, তাদের সমস্ত রকম কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়। যাদের সন্তানের সংখ্যা তিনের চেয়েও বেশি, তাদের পুরস্কার হিসেবে জমি ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হয়।" এই নজিরবিহীন সরকারি বিধি থেকেই বোঝা যায় গোটা জাতিটা কতদূর পর্যন্ত প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়েছিল। ১৮১৯ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় রেভারেণ্ড এ বিশপ লিখেছিলেন, ওখানকার বহু শিশুই খুব কম বয়সে মারা যায়। বিশপ স্ট্যালে আমাকে জানিয়েছেন—চিত্রটা এখনও পাল্টায়নি, ঠিক যেমন পাল্টায়নি নিউজিল্যাণ্ডেও। অনেকে বলেন, শিশুদের প্রতি মায়েদের অবহেলাই এই অকাল মৃত্যুর কারণ। কিন্তু সম্ভবত এর প্রধান কারণ হল শিশুদের দুর্বল স্বাস্থ্য, যার উৎস হচ্ছে তাদের মাতা-পিতার দুর্বল প্রজনন-ক্ষমতা। নিউজিল্যাণ্ডের অবস্থার সঙ্গে আর একটা বিষয়েও এদের সাদৃশ্য চোখে পড়ে —এখানেও মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্মের হার অনেক বেশি। ১৮৭২ সালের লোকগণনা অনুযায়ী এখানে সর্বসমেত ১১ হাজার ৬৫০ জন পুরুষ আর ২৫ হাজার ২৪৭ জন নারী ছিল, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১২৫.১৬ জন

ইউরোপিয়ানরা পদার্পন করার পর থেকেই বাসিন্দারা বহুলাংশে প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়েছে—এটা আমরা দেখেছি। তাছাড়া রক্ত সম্পর্কযুক্ত নরনারীর মধ্যেকার মিলনে যে মানুষের উপর খুব বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, তা-ও আজ আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিশেষত নিউজিল্যাণ্ডের মতো বিশাল অঞ্চলে আর নানা ধরণের এলাকা বিশিষ্ট স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে তো নয়-ই বরং দেখা যায় নরফোক দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান বাসিন্দারা, ভারতবর্ষের টোডারা এবং স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমপ্রান্তীয় দ্বীপগুলির আধিবাসীরা প্রায় প্রত্যেকেই পরস্পরের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোন বা নিকট আত্মীয়, এবং তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রজনন-অক্ষমতার কোনরকম চিহ্নই নেই।

নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে মানুষের সাদৃশ্য কতটা—তা খুঁজে দেখলে একটা অধিকতর সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গীর হদিশ মিলতে পারে। জীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে জননব্যবস্থার উপরে তার অস্বাভাবিক রকম প্রভাব পড়ে (কেন এমন হয়, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই)। এই প্রভাবের ফল ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। আমার 'ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্টস আণ্ডার ডোমেস্টিকেশন' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৮-শ পরিচ্ছেদে এ-ব্যাপারে প্রচুর তথ্য দিয়েছি, তাই এখানে শুধু তার একটা সংক্ষিপ্তসারই তুলে দিচ্ছি—উৎসাহী পাঠকরা ঐ গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। অল্প কয়েকটি পরিবর্তন অধিকাংশ বা সমস্ত প্রাণীরই স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি ও প্রজননক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, আর অন্য পরিবর্তনগুলি বহুসংখ্যক প্রাণীকে প্রজনন-অক্ষম করে দেয়। এর একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতবর্ষের পোষা হাতিরা : এরা কোন শাবকের জন্ম দিতে পারে না। অবশ্য জাভা-র পোষা হাতিরা শাবকের জন্ম দিয়ে থাকে, কারণ ওখানকার পোষা মাদি-হাতিদের অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোর কিছুটা সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে তারা অনেকটাই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরণের আমেরিকান বাঁদরদের স্ত্রী-পুরুষদের তাদের নিজেদের দেশেই বহু বছর একসঙ্গে রেখে দেখা গেছে—তাদের বাচ্চাকাচ্চা খুব কমই হয়েছে বা একেবারেই হয়নি। আমাদের আলোচনায় এটা একটা যথোপযুক্ত উদাহরণ, কেননা মানুষের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আসলে, বন্দী হওয়ার পর অবস্থার যে সামান্যতম পরিবর্তনটুকু ঘটে থাকে, সেটুকুই একটা বন্য প্রাণীকে প্রজনন-অক্ষম করে দিতে পারে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের অধিকাংশ গৃহপালিত প্রাণীই প্রকৃতির কোলে স্বাধীন জীবনে যতটা প্রজননক্ষম ছিল, গৃহপালিত হওয়ার পর থেকে তার চেয়ে অনেক

বেশি প্রজননক্ষম হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু প্রাণীর তো চরম অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও প্রজননক্ষমতার বিন্দুমাত্র হেরফেরও ঘটে না। বন্দীদশা সব প্রাণীর উপর সমান প্রভাব ফেলে না, তারতম্য থাকেই। অবশ্য একই প্রজাতির সমস্ত প্রাণীর উপর বন্দীদশা সাধারণত একইভাবে একইরকম প্রভাব রেখে যায়। অনেকসময় কোন্ বর্গের একটা মাত্র প্রজাতি প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে, বাকিদের মধ্যে তেমন কোন ব্যাপার চোখে পড়ে না। আবার কখনও বা কোন বর্গের একটা মাত্র প্রজাতিই প্রজননক্ষম থাকে, বাকিরা হয়ে পড়ে অক্ষম। কিছু কিছু প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ প্রাণীরা বন্দীদশায় অথবা নিজেদের অঞ্চলে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে থাকতে না পারার অবস্থায় কখনোই পরস্পর মিলিত হয় না। আবার অন্য অনেক প্রজাতির প্রাণীরা এ-রকম অবস্থায় মিলিত হয় বটে, কিন্তু সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। কোন কোন প্রজাতির প্রাণীরা এ-রকম অবস্থায় সন্তানের জন্মও দিয়ে থাকে, কিন্তু স্বাধীন অবস্থার মতো বেশি সংখ্যায় নয়। আর, কিছুক্ষণ আগে মানুষের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ-রকম ক্ষেত্রে তাদের সন্তানেরা সাধারণত দুর্বল আর রুগ্ন কিম্বা বিকৃত চেহারার হয় এবং অল্প বয়সেই মারা যায়।

অর্থাৎ, জীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা জননব্যবস্থার উপরেও ছাপ ফেলে—এটা একটা সাধারণ নিয়ম, আর আমাদের নিকটতম প্রাণী চতুষ্পদ বাঁদরদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। এ থেকে স্বভাবতই ধরে নেওয়া যে আদিম অবস্থার মানুষদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য। কাজেই, কোন বন্য জাতির জীবন-যাপনের অভ্যাস হঠাৎ পরিবর্তিত হলে তারা কম-বেশি প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তাদের সন্তানরাও দুর্বল চেহারার হয়, আর তা হয় একইভাবে ও একই কারণে। ঠিক যেমনটা দেখা যায় নিজেদের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর ভারতবর্ষের হাতি আর চিতাবাঘের ক্ষেত্রে, আমেরিকার অনেক বাঁদরদের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বহু ধরণের জীবজন্তুর ক্ষেত্রে।

যে আদিবাসীরা বহুকাল ধরে বিভিন্ন দ্বীপে এবং প্রায় একইরকম অবস্থার মধ্যে বসবাস করে আসছে, তাদের ওপর অভ্যাসের পরিবর্তন কেন এতটা ছাপ ফেলে —তার কারণটা খুঁজে দেখা যায়। কোন ধরণের পরিবর্তনই সভ্য জাতির মানুষদের মতো অতটা প্রভাব ফেলতে পারে না। এ-ব্যাপারে গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সভ্য জাতির মানুষদের যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে, কেননা গৃহপালিত পশুরা কখনো কখনো শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও (যেমন ইউরোপীয় কুকুররা ভারতবর্ষে গেলে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ে), দু'একটা ক্ষেত্র

ছাড়া আর প্রায় কখনোই তারা প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ে না। সভ্য জাতিগুলি বা গৃহপালিত পশুরা যে প্রজনন-অক্ষমতায় আক্রান্ত হয় না, তার কারণ হচ্ছে সম্ভবত এই যে, অধিকাংশ বন্য পশুদের তুলনায় তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে নানা ধরণের অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে, ফলে নানা ধরণের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও তাদের অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া একসময় তাদেরকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে বারবার দেশান্তরী হতে হয়েছে, আর মিলন ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন বর্গ বা উপ-জাতির নর-নারীর মধ্যে —এগুলোও এর এক একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। সভ্যজাতির মানুষদের সঙ্গে আদিবাসীদের যৌনসংযোগ ঘটলে, সেই মিলনজাত আদিবাসী সন্তানদের উপর অবস্থার পরিবর্তন আর তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। দেখা গেছে, তাহিতির বাসিন্দা আর ইংরেজদের মিলনজাত সন্তানরা পিট্‌কেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জে বসবাস শুরু করার পর তাদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে উঠেছিল, জায়গার অভাব দেখা দিচ্ছিল দ্বীপে। ১৮৫৬-র জুন মাসে তাদেরকে নরফোক দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের মধ্যে ছিল ৬০ জন বিবাহিত মানুষ আর ১১৪-টি অপ্রাপ্তবয়স্ক মোট ১৭৪ জন। এখানেও তাদের সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে চলে যে তাদের মধ্যে ১৬ জন ১৮৫৯ সালে পিট্‌কেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০ জনে—পুরুষ আর নারীদের সংখ্যা ছিল একেবারে সমান সমান। তাসমানিয়ানদের ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার কতই না তফাৎ। মাত্র সাড়ে এগার বছরে নরফোক দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের সংখ্যা ১৭৪ জন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ জনে ; আর পনের বছরে তাসমানিয়ানদের সংখ্যা ১২০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ জনে—যার মধ্যে শিশু মাত্র ১০-টি।[১২]

আবার, ১৮৬৬-র লোকগণনা আর ১৮৭২-এর লোকগণনার অন্তর্বর্তী সময়ে স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের অমিশ্রিত রক্তের আদিবাসীদের মোট লোকসংখ্যার ৮ হাজার ৮১ জন কমে গেছে, আর মিশ্ররক্তের বাসিন্দারের (যারা অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান) সংখ্যা ৮৪৭ জন বেড়ে গেছে। তবে এই শেষোক্তদের মধ্যে মিশ্ররক্তের মানুষদের সন্তানরাও আছে, নাকি এটা শুধু মিশ্ররক্তবিশিষ্ট প্রথম প্রজন্মের মানুষদেরই সংখ্যা—তা আমার জানা নেই।

১২। এই সব বিবরণ লেডি বেল্‌সার-এর "দ্য মিউটিনারস্ অফ্ দ্য 'বাউন্টি'." ১৮৭০, এবং হাউস অফ কমন্স্-র ২৯ মে, ১৮৬৩-র নির্দেশে মুদ্রিত "পিট্‌কেয়ার্ন আইল্যাণ্ড". নামক গ্রন্থ দুটি থেকে সংগৃহীত। স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের অধিবাসীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য "হনলুলু গেজেট" পত্রিকা থেকে এবং মিঃ কোন্-এর কাছ থেকে সংগৃহীত।

এখানে যে-সব ঘটনার কথা বললাম, সেগুলি সবই সেইসব আদিবাসীদেরই ঘটনা, যারা তাদের এলাকায় সভ্য মানুষদের আগমনের দরুণ নানারকম নতুন অবস্থার মুখোমুখী হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে, যেমন কোন পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর আক্রমনের ফলে এইসব আদিবাসীদের যদি নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতো এবং নিজেদের আচার-অভ্যাস বদলাতে হত, তাহলে সম্ভবত তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত আর তারা প্রজনন-অক্ষম হয়ে পড়ত। যে-সব বন্য পশু গৃহপালিত জীবে পরিণত হয়, তাদের মূল প্রতিরোধক্ষমতা (যা প্রথম বন্দী হওয়ার পরও তাদের অনায়াসে শাবকের জন্ম দিতে পারার ক্ষমতার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে) আর সভ্যতার সঙ্গে প্রথম সংযোগের পর অ-সভ্য মানুষদের মূল প্রতিরোধক্ষমতা (যে ক্ষমতার জোরে তারা নিজেরাই সুসভ্য হয়ে ওঠার জন্য টিকে থাকতে পারে)—এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ক্ষমতাটা হল জীবন-যাপনের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

শেষত, বিভিন্ন মানবজাতির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া এবং এইভাবে হ্রাস পেতে পেতে একদিন তাদের পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যে এক অত্যন্ত জটিল বিষয়, এর পিছনে যে বহু কারণ কাজ করে এবং সেই কারণগুলিও যে বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে উন্নততর শ্রেণীর প্রাণীদের, যেমন প্রস্তরীভূত ঘোড়াদের, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার কোন ফারাক নেই। এইসব ঘোড়ারা একসময় দক্ষিণ আমেরিকার মাটি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তার কিছুদিনের মধ্যে ঐ একই অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিল অসংখ্য স্পেনীয় ঘোড়া। নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা বোধহয় পশুদের সঙ্গে মানুষের এই সাদৃশ্যটার কথা জানে। কেননা তারা নিজেদের ভবিতব্যকে তুলনা করে থাকে তাদের দেশীয় ইঁদুরদের সঙ্গে, যে ইঁদুররা এখন ইউরোপীয় ইঁদুরদের পাল্লায় পড়ে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। এর নির্দিষ্ট কারণগুলিকে আর তার কার্যধারাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলে আপাতভাবে কাজটাকে খুবই কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি মনে রাখা যায় যে প্রতিটি প্রজাতি ও প্রতিটি জাতির সংখ্যাবৃদ্ধির পথে সারাক্ষণই নানান প্রতিবন্ধক থাকে—তাহলে আর ব্যাপারটা অত কঠিন থাকে না। এইসব প্রতিবন্ধকের সঙ্গে যদি নতুন কোন প্রতিবন্ধক (তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন) যুক্ত হয়, তাহলে সেই জাতির সদস্যসংখ্যা কমে যেতে বাধ্য, আর এইভাবে কমতে কমতেই জাতিটি একসময় বিলুপ্তির সীমানায় পেঁছে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন পরাক্রমশালী গোষ্ঠীর

আক্রমণই ঐ জাতিটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

বিভিন্ন মানবজাতি সমূহের গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে ঃ অনেক সময় দুটি পৃথক পৃথক জাতির নারী-পুরুষের মধ্যে মিলনের ফলে একটা নতুন জাতি সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা আর হিন্দুরা একই আর্যকুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা যে যে ভাষায় কথা বলে সেগুলি একই মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট, অথচ এই দুই জাতির মানুষদের দেখতে একেবারেই আলাদা, আবার অন্যদিকে ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে ইহুদীদের চেহারার প্রায় কোন পার্থক্যই নেই, অথচ এই ইহুদীরা হচ্ছে সেমিটিক কুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের ভাষাও ইউরোপিয়ানদের থেকে আলাদা— এই বিচিত্র ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ব্রকা বলেছেন যে আসলে আর্যরা যখন বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন তাদের কিছু কিছু শাখার সঙ্গে কিছু কিছু এলাকার আদিবাসীদের ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছিল, এবং তারই ফল হিসেবে উপরোক্ত ঘটনা ঘটতে পেরেছে। নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি জাতির মধ্যে মিলন ঘটলে তার প্রথম ফল হিসেবে সৃষ্টি হয় বিভিন্নধর্মী মানুষদের একটা সংমিশ্রণ। যেমন, ভারতবর্ষের সাঁওতাল বা পাহাড়ী গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে ; ওখানের মানুষদের মধ্যে অসংখ্য রকম পার্থক্য আছে, একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে প্রায় বোঝাই যায় না, আর এই ক্রমমালার মধ্যে আছে "পাহাড়ে বসবাসকারী খাটো আকৃতির কৃষ্ণবর্ণ গোষ্ঠী থেকে শুরু করে দীর্ঘকায়, সবুজাভ বর্ণের ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত, যাদের ভুতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ, চোখে শান্ত ভাব, এবং মাথা উন্নত কিন্তু আকারে ছোট।" সেইজন্য ওখানকার আদালতে বিচারের সময় সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করা হয় তারা সাঁওতাল না হিন্দু। দুটি স্বতন্ত্র জাতির মিলনের ফলে যে-সব বিভিন্নধর্মী মানুষবিশিষ্ট জাতি গড়ে উঠেছে এবং যাদের মধ্যে অমিশ্রিত রক্তের কোন মানুষই আর অবশিষ্ট নেই বা বড়জোর দু' একজন অবশিষ্ট আছে (যেমন পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা), তারা আবার কোনদিন সকলে সমধর্মী হয়ে উঠতে পারে কি না—তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে আমাদের গৃহপালিত ক্ষেত্রে কোন সংকরজাতের প্রাণীকে কয়েক প্রজন্ম ধরে সতর্ক নির্বাচনের মধ্যে রাখলে ধীরে ধীরে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আর কোন প্রভেদ থাকে না। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে বিভিন্নধর্মী মানুষবিশিষ্ট কোন জাতির মধ্যে বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে অবাধ সংমিশ্রণ ঘটে চললে সেটাই নির্বাচনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তখন আর পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের কোন

সম্ভাবনা থাকে না। এর ফলে ঐ সংকর জাতিটি একসময় সমধর্মী হয়ে উঠবে, তবে তাদের মধ্যে হয়ত আদি জাতিদুটির বৈশিষ্ট্যসমূহ তখন আর সমান পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে গায়ের রঙের পার্থক্যটাই হচ্ছে সবথেকে বিশিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। একসময় মনে করা হত যে বিভিন্ন জাতি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জলবায়ুবিশিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করার দরুণই তাদের গায়ের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কিন্তু প্যালাস্ প্রথম দেখান যে এই ধারণাটা সত্য নয়। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক নৃতত্ত্ববিদই তাঁর ধারণাকে সমর্থন করে আসছেন। পূর্বোক্ত ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ হল, বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট জাতিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকলেও (এদের অধিকাংশই তাদের বর্তমান বাসভূমিতে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে), এইসব জায়গার জলবায়ুর মধ্যে যে দারুণ পার্থক্য আছে, তা কিন্তু নয়। আবার, দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনশ বছর ধরে বসবাস করার পরও ডাচ্‌দের গায়ের রঙ প্রায় পাল্টায়নি বললেই চলে। একই ঘটনা দেখা যায় জিপ্‌সি আর ইহুদীদের ক্ষেত্রেও। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এরা ছড়িয়ে আছে, এবং সর্বত্রই এদের দেখতে প্রায় একইরকম—অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গার ইহুদীদের দেখতে একইরকম হওয়ার ব্যাপারটাকে কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই দেখানো হয়ে থাকে। অনেকে বলেন, গায়ের রঙ পরিবর্তনের ব্যাপারে উষ্ণ আবহাওয়া যতটা সাহায্য করে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করে স্যাঁৎসেতে বা শুষ্ক আবহাওয়া। কিন্তু স্যাঁৎসেতে আর শুষ্ক আবহাওয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে দক্ষিণ আমেরিকায় ডি'অরবাইনি এবং আফ্রিকায় লিভিংস্টোন একেবারে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাই এ বিষয়ে কোন মতামতকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না।

বিভিন্ন ঘটনা (যেগুলি আমি অন্যত্র উদ্ধৃত করেছি) প্রমাণ করে যে গায়ের আর চুলের রঙ অনেক সময় কিছু উদ্ভিজ্জ বিষের ক্রিয়া এবং কিছু পরজীবি জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। তাই আমার মনে হয়েছিল নিগ্রো ও অন্যান্য কৃষ্ণবর্ণ জাতির গায়ের রঙ কালো হওয়ার কারণ হল—তাদের দেশের জলাভূমি থেকে যে ভয়ংকর বিষ-বাষ্প বেরোত, তার হাত থেকে তারাই বেঁচে যেত যাদের গায়ের রঙ ছিল ঘোর কালো, আর বহু প্রজন্ম ধরে চলতে চলতে এটাই তাদের স্বাভাবিক রঙে পরিণত হয়েছে।

পরে জেনেছি, আমার অনেকদিন আগে ডঃ ওয়েল্‌স্‌-ও এই একই কথা ভেবেছিলেন। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ক্রান্তীয় আমেরিকায় যে ইয়েলো-ফিভার বা পীত-জ্বরের ভয়ঙ্কর প্রকোপ, তা নিগ্রোদের এবং এমনকি বর্ণসংকর-দেরও একেবারেই আক্রমণ করতে পারে না। আফ্রিকার উপকূলবর্তী অন্তত ২৬০০ মাইল এলাকা জুড়ে যে মারাত্মক সবিরাম জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং যার আক্রমণে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ প্রতিবছর মারা যায় আর আরও এক-পঞ্চমাংশ দেশে ফিরে যায় পঙ্গু হয়ে—তার আক্রমণ থেকেও নিগ্রো ও বর্ণ-সংকররা অনেকটাই মুক্ত। এইসব রোগ থেকে নিগ্রোদের এই অনাক্রম্যতার ক্ষমতাটা কিছুটা সহজাত (যা নির্ভর করে তাদের শারীরিক গঠনের কোন অজানা বৈশিষ্ট্যের উপর) এবং কিছুটা নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারার ফল। পাউনোট্‌ বলেছেন, মেক্সিকোর যুদ্ধের জন্য সুদানের কাছাকাছি এলাকা থেকে যে সব নিগ্রোদের সৈনিক হিসাবে বাছাই করা হয়েছিল এবং যাদেরকে ঈজিপ্টের ভাইসরয়ের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয়েছিল, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এবং ওয়েস্টইণ্ডিজের জলবায়ুতে অভ্যস্ত অন্যান্য নিগ্রোদের মতো তাদেরকেও পীত-জ্বর আক্রমণ করতে পারেনি। নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারার ক্ষমতার যে একটা বিশেষ ভূমিকা আছে, তা অনেক ঘটনার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, কোন শীতলতর জলবায়ুর অঞ্চলে কিছুদিন বসবাস করার পর নিগ্রোদের সহজেই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জ্বরে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি যে জলবায়ুবিশিষ্ট অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে, সেই জলবায়ু তাদের উপরেও একইভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, ১৮৩৭ সালে যখন ডেমেরারা অঞ্চলে পীত-জ্বর মহামারীর আকার ধারণ করেছিল, তখন ডঃ ব্লেয়ার দেখেছিলেন—অন্য দেশ থেকে যে-সব লোক এসে ওখানে বসবাস শুরু করেছিল, তাদের মৃত্যু-হারের সঙ্গে তারা যে দেশ থেকে চলে এসেছিল তার অক্ষাংশের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। নিগ্রোরা পীত-জ্বরের বিরুদ্ধে এখন একটা অনাক্রম্যতা অর্জন করেছে (যদি সেটা নতুন জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতারই ফল হয়ে থাকে), অর্থাৎ একসময় বহু বছর ধরেই তারা এই রোগের শিকার হত। ক্রান্তীয় আমেরিকার আদিবাসীরা ঐ অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে, কিন্তু পীত-জ্বরের আক্রমণ থেকে তারা ও রেহাই পায় না। রেভারেণ্ড এইচ. বি. ট্রিস্ট্রাম্‌ বলেছেন, উত্তর আফ্রিকার অনেক জেলার আদি বাসিন্দারা প্রতিবছর ঐ-সব এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, অথচ নিগ্রোরা কিন্তু দিব্যি থাকে।

নিগ্রোদের এই অনাক্রম্যতার সঙ্গে যে তাদের গায়ের রঙের কিছু একটা সম্পর্ক আছে—এটা নিছকই অনুমান মাত্র। তাদের রক্ত, স্নায়ুতন্ত্র বা কোন কলার মধ্যেকার পার্থক্যের সঙ্গেও ঐ অনাক্রম্যতার সম্পর্ক থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও, উপরোক্ত ঘটনাগুলির কথা এবং গায়ের রঙ ও দেহের ক্ষয়-প্রবণতার মধ্যেকার আপাত সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আমার মনে হয়—অনুমানটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এই অনুমানটা কতদূর সত্য, তা খুঁজে দেখারও চেষ্টা করেছি, যদিও খুব একটা সফল হতে পারি নি।[১৩] প্রয়াত ডঃ দানিয়েল, যিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘদিন বসবাস করেছিলেন, তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে গায়ের রঙের সঙ্গে রোগ থেকে অনাক্রম্যতার কোন সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত ফর্সা ছিলেন, কিন্তু তথাপি ঐ উপকূলে যখন তিনি প্রথম পা রাখেন (তিনি তখন নেহাতই বালক), তখন তাঁকে দেখে এক বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ নিগ্রো-প্রধান বলেছিলেন—পীত-জ্বর তাঁকে আক্রমণ করতে পারবে না। অ্যান্টিগুয়া-র ডঃ নিকলসন এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে জানিয়েছেন, কৃষ্ণাঙ্গ ইউরোপিয়ানদের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ানরাই পীত-জ্বরে বেশি আক্রান্ত হয় বলে তিনি মনে করেন না। কালো কেশবিশিষ্ট ইউরোপিয়ানরা

১৩। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে অনুমতি পাবার পর আমি একটি ফাঁকা সারণী নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ বিদেশে কর্মরত বিভিন্ন রেজিমেন্টের শল্য-চিকিৎসকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তার কোন উত্তর ফেরত আসেনি। সারণীতে আমি মন্তব্য করেছিলাম, "গৃহপালিত পশুদের লেজের বর্ণ ও শারীরিক গঠনের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাপারে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মানবজাতির গাত্রবর্ণের সঙ্গে তারা যে পরিবেশে বসবাস করে, তারও কিছুটা সম্পর্ক আছে। তাই নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো দরকার। বিষয়টি হল—ইউরোপের অধিবাসীদের চুলের রঙের সঙ্গে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগের (তারা যে-সব রোগের শিকার হয়) কোন সম্পর্ক আছে কি না। অস্বাস্থ্যকর ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে তাঁবু ফেলবার সময় বিভিন্ন রেজিমেন্টের শল্যচিকিৎসকরা যদি প্রথমেই অসুস্থদের সরিয়ে নেবার পর হিসেব করে নেন যে দলের কতজন ব্যক্তির কেশ কৃষ্ণবর্ণ, কতজনের কেশ হাল্কাবর্ণ আর কতজনের কেশ এই দুয়ের মধ্যবর্তী বর্ণের, তাহলে ভালো হয়। সেইসঙ্গে যদি তাঁরা ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর বা রক্তামাশায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা করেন, তাহলে এরকম কয়েক হাজার ঘটনা নথিভুক্ত হওয়ার পর স্পষ্ট করে বোঝা যাবে যে কেশবর্ণের সঙ্গে শরীরে ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোগ সংক্রমণের কোন সম্পর্ক আছে কি না। হয়তো আদৌ এরকম কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু অনুসন্ধানটা চালানো একান্তই দরকার। আর সত্যিসত্যিই যদি কোন ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে তার সাহায্যে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বাছাই করতে সুবিধে হবে। এই অনুসন্ধানের ফলাফল তত্ত্বগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, যার সাহায্যে বলা যাবে বহু প্রজন্ম ধরে কালো চুল বা কালো গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অধিকতর কার্যকরীভাবে টিকে থাকার জন্যই অস্বাস্থ্যকর ক্রান্তীয় জলবায়ুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী কোন জাতির সদস্যদের গায়ের রঙ কালো হয়ে উঠেছে কি না।"

যে উষ্ণ জলবায়ুর প্রকোপকে অন্যদের থেকে বেশি সহ্য করতে পারে—এ-কথা মিঃ জে. এম হ্যারিসও স্বীকার করেন নি। বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছেন যে আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে নানান কাজের জন্য লাল চুলওয়ালা মানুষরাই বেশি উপযুক্ত হয়ে থাকে।[১৪] এইসব ছোট-খাট ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, জলাভূমি হতে নির্গত বিষ-বাষ্পজনিত রোগের আক্রমণ থেকে আগেকার দিনের ঘোর কালো রঙের মানুষরা বেশি মাত্রায় রেহাই পেতো বলেই আজকের নিগ্রোরা কৃষ্ণাঙ্গ হয়েছে—এই অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন।

ডঃ শার্প বলেছেন, ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোদে শ্বেতাঙ্গদের গায়ের চামড়া পুড়ে যায়, ফোস্‌কা পড়ে যায়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের চামড়ায় এতটুকু আঁচও লাগে না। তিনি আরও বলেছেন যে মানুষের অভ্যাসের উপর এটা নির্ভর করে না, কারণ ছ-আট বছর বয়সের কৃষ্ণাঙ্গ শিশুদের হামেশাই নগ্ন অবস্থায় কোলে করে নিয়ে যাওয়া হয় ঐ রোদের মধ্যে দিয়েই, কিন্তু তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। জনৈক চিকিৎসক আমাকে জানিয়েছিলেন যে কয়েকবছর আগে পর্যন্ত প্রতি গ্রীষ্মে (শীতকালে কখনোই হত না) তাঁর হাতে হালকা বাদামী রঙের একরকম দাগ হত, যেগুলো অনেকটা রোদ-পোড়া দাগেরই মতো, তবে একটু বড় মাপের। আশ্চর্য ব্যাপার হল, প্রখর রোদের তাপে তাঁর শরীরের এই দাগ-পড়া অংশগুলোর কোন ক্ষতি হত না, কিন্তু তাঁর চামড়ার অন্য শাদা অংশগুলো রোদের তাপে হামেশাই লাল্‌চে হয়ে যেত, ফোস্‌কা পড়ত। নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও শরীরের শাদা লোমে ঢাকা অংশ আর শরীরের অন্যান্য অংশের উপর রোদের প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না, কিছুটা পার্থক্য থাকেই। এইভাবে রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়ার হাত থেকে চামড়ার রক্ষা পাওয়ার ঘটনা দিয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ মানুষের গায়ের চামড়া ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, তা আমার জানা নেই। যদি তা-ই

১৪। দ্রঃ, "অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিভিয়্যু", জানুয়ারি ১৮৬৬, পৃঃ ২১। ডঃ শার্পও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে বলেছেন—"কিছু মেডিক্যাল অফিসার লক্ষ্য করেছেন যে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রোগে সেখানকার কালো চুল ও ময়লা গাত্রবর্ণের অধিবাসীরা যতটা ভোগে, তার চেয়ে হাল্কা বর্ণের চুল ও উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের ইউরোপের অধিবাসীরা অনেক কম ভোগে (দ্রঃ, "ম্যান এ স্পেশ্যাল ক্রিয়েশন", ১৮৭৩, পৃঃ ১১৮)। আমি যতদূর জানি, তাতে বলতে পারি এই মন্তব্যের পিছনে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।" অন্যদিকে, সিয়েরা লিওনের অধিবাসী মিঃ হেড্‌ল্‌ ঠিক ক্যাপ্টেন বার্টনের মতোই সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। কারণ, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়ায় "তাঁর আমলেই সবথেকে বেশি সংখ্যক কেরাণীর মৃত্যু হয়েছিল" (দ্রঃ ডব্লিউ. রিয়াদ্‌-এর "আফ্রিকান স্কেচ্‌বুক্‌", খণ্ড ২, পৃঃ ৫২২)।

হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে আফ্রিকা মহাদেশে নিগ্রোরা যতদিন ধরে বসবাস করে আসছে কিম্বা মালয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশে যতদিন ধরে বসবাস করছে পাপুয়ানরা, আমেরিকা ক্রান্তীয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা তার থেকে অনেক কম দিন ধরে সেখানে বসবাস করছে, আবার অন্য দিকে ভারতবর্ষের বুকে ফর্সা রঙের হিন্দুরা যতদিন ধরে বসবাস করছে, তার চেয়ে অনেক আগে থেকে সেখানে বসবাস করছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসীরা।

বিভিন্ন মানবজাতির গায়ের রঙের মধ্যে কেন এত তারতম্য, এটা গাত্রবর্ণের দরুণ অর্জিত কোন বিশেষ সুবিধেরই স্মারক, নাকি জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাবজনিত ফল, তার সঠিক বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। তবুও, জলবায়ুর প্রভাবের ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা কিছু কিছু উত্তরাধিকারমূলক প্রভাব যে কোন-না-কোন নির্দিষ্ট জলবায়ুর দরুণই সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে।[১৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, জীবনযাপনের অবস্থা শারীরিক কাঠামোকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে থাকে, আর তার ফলে সৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। তাই দেখা যায় ইউরোপের লোকেরা কিছুদিন আমেরিকায় থাকলে তাদের চেহারার সামান্য পরিবর্তন ঘটে, এবং এই পরিবর্তনটা ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। তাদের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কিছুটা লম্বা হয়ে যায়। কর্ণেল বার্নিস্ আমাকে বলেছিলেন, বিগত যুদ্ধের সময় আমেরিকায় যে-সব জার্মান সৈন্য এসেছিল, তারা যখন আমেরিকান ক্রেতাদের জন্য বানানো রেডিমেড পোশাক পরে ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের চেহারাটা বড় হাস্যকর দেখাত। আসলে ঐ-সব পোশাকের সব অংশগুলোই তাদের শরীরের থেকে অনেক লম্বা লম্বা হত। এই ঘটনার মধ্যে উপরোক্ত কথারই একটা প্রমাণ ফুটে উঠেছে। এছাড়াও, দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে তৃতীয় প্রজন্মের গৃহ-দাসদের

১৫। এ-বিষয়ে আবিসিনিয়া, আরব ও অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসের প্রভাব সম্পর্কে মঁসিয় এ. দ্য ক্যাত্রেফাজের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (দ্রঃ, "রেভো দে কুর্ সাঁইতিফিক্", ১০ অক্টোবর, ১৮৬৮ পৃঃ ৭২৪)। খানিকফ্-এর লেখা উদ্ধৃত করে ডঃ রোল্ জানিয়েছেন, জর্জিয়াতে বসবাসকারী জার্মানদের অধিকাংশই দু'পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও কালো চোখের মণি লাভ করেছে (দ্রঃ, "Der Mensch, seine Abstammung", ১৮৬৫, পৃঃ ৯৯)। মিঃ ডি. ফোর্বস্ আমাকে জানিয়েছেন, আন্দিজ পর্বতমালার কুইচুয়া জাতির লোকেরা উপত্যকার যে যে অঞ্চলে বসবাস করে, সেই সেই অঞ্চলের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের পরস্পরের গায়ের রঙের মধ্যেও ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়।

(house-slave) দেখতে যে কৃষিগত দাসদের (field-slave) চেয়ে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে—সে ব্যাপারে প্রমাণের অভাব নেই।

তবে, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়—তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত যে-সব পার্থক্য রয়েছে, সেগুলি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নয়। এমনকি কোন নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে বহুকাল বসবাস করাটাও এ-সব পার্থক্য সৃষ্টি করে না। এস্কিমোদের একমাত্র খাদ্যই হচ্ছে পশুমাংস; এরা লোমওয়ালা মোটা পশুচর্মের পোশাক পরে, কনকনে ঠাণ্ডা আর দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে (সূর্য ওঠে না) দিন কাটায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের এমন কিছু বিশাল পার্থক্য নেই, অথচ এই দক্ষিণ চীনের অধিবাসীরা বেঁচে থাকে প্রধানত উদ্ভিজ্জ খাদ্য খেয়ে, এবং প্রায় খালি গায়ে তাদেরকে দিন কাটাতে হয় প্রচণ্ড গরম, রোদ-ঝলমল আবহাওয়ায়। দুর্গম উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে বস্ত্রহীন ফুজিয়ানরা। ব্রাজিলের বোটোকুডো-রা অভ্যন্তর ভাগের গভীর নিরক্ষীয় অরণ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, উদ্ভিজ্জ খাদ্যই এদের প্রধান সম্বল। কিন্তু এইসব জলবায়ুগত পার্থক্য সত্ত্বেও এই গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। "বিগল্" জাহাজে যে ফুজিয়ানরা ছিল, কয়েকজন ব্রাজিলবাসী তাদেরকে দেখে তো বোটোকুডো গোষ্ঠীর লোক বলেই মনে করেছিল। আবার ক্রান্তীয় আমেরিকার অন্যান্য অধিবাসীদের মতো বোডোকুডোদের সঙ্গেও নিগ্রোদের বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। অথচ নিগ্রোরা বাস করে আতলান্তিক মহাসাগরের ঠিক বিপরীত পারে, তাদের এলাকার জলবায়ুর সঙ্গে ক্রান্তীয় আমেরিকার জলবায়ুর প্রায় কোন পার্থক্যই নেই, এবং নিগ্রোদের আচার-অভ্যাসও প্রায় এদেরই মতো।

শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে নানান পার্থক্য—এ মতও গ্রহণযোগ্য নয় (সামান্য কিছু প্রভাব অবশ্য থাকতে পারে)। যে-সব মানুষ সাধারণত ডিঙিতেই বসবাস করে, তাদের পাগুলো কিছুটা খাটো হয়ে যেতে পারে; যারা বসবাস করে উঁচু জায়গায়, তাদের বুকটা বেড়ে উঠতে পারে আয়তনে; যাদেরকে সারাক্ষণ কোন-না-কোন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে হয়, তাদের সেই ইন্দ্রিয়ের কোটরটি আয়তনে বড় হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের মুখের আদলেও ঘটতে পারে কিছু পরিবর্তন। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে চোয়ালের ব্যবহার অনেক কমে গেছে বলে (আগে বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য

চোয়ালের বিভিন্ন পেশীতে বিভিন্ন ভঙ্গী ফোটাতো মানুষ) তাদের চোয়াল আয়তনেও অনেক ছোট হয়ে গেছে আর বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজ বেশি করার দরুণ তাদের মস্তিষ্ক আয়তনে বড় হয়ে উঠেছে। এই দুয়ের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় সভ্য মানুষের চেহারা বন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে। কোন জাতির মানুষদের দৈহিক উচ্চতা যদি বেড়ে যায় আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মস্তিষ্কের আয়তন যদি না বাড়ে, তাহলে (খরগোশদের ব্যাপারে আগে যা বলা হয়েছে, তার আলোকে বিচার করলে মনে হয়) তাদের করোটির গঠন কিছুটা লম্বাকৃতির (dolichocephalic) হয়ে উঠতে পারে।

শেষতঃ, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শারীরিক বৃদ্ধির যে নিয়মটিকে আমরা আজও ভালভাবে বুঝে উঠতে পারিনি, তা-ও অনেক সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন, পেশীসমূহের বিপুল বৃদ্ধি এবং অক্ষিকোটরের অনেকখানি বেড়ে যাওয়ার মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক আছে। উত্তর আমেরিকার মান্দানদের গাত্রত্বক আর চুলের মধ্যে এবং চুলের বিন্যাস ও তার রঙের মধ্যে সুস্পষ্ট আন্তঃসম্পর্ক আছে।[১৬] ত্বকের রঙ আর ত্বক থেকে নির্গত গন্ধের মধ্যেও আছে একটা আন্তঃসম্পর্ক। ভেড়াদের শরীরের কোন একটা নির্দিষ্ট অংশে লোমের সংখ্যা আর রোমকূপের সংখ্যাও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। আমাদের গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে মানুষের শারীরিক কাঠামোর বিভিন্ন পরিবর্তনকেও হয়ত এই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত পরিবর্তনের নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যেকার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য-গত পার্থক্যগুলিকে বিভিন্ন জাতির জীবনযাপনের অবস্থার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে, কিম্বা কোন কোন অঙ্গকে লাগাতারভাবে ব্যবহার করার ফল হিসেবে, অথবা বিভিন্ন অঙ্গের আন্তঃসম্পর্কের নীতির সাহায্যে মোটেই যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে এবার খুঁজে দেখা যায় যে, একজন মানুষের সঙ্গে অপর একজন মানুষের যে-সব ছোটখাট পার্থক্য থাকে (এরকম পার্থক্য একান্তই স্বাভাবিক), সেগুলি বহু প্রজন্ম ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে বজায় থেকেছে কিনা এবং বেড়ে উঠেছে কি না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথমেই আপত্তি

১৬। মিঃ কার্টলিন বলেছেন, মান্দানদের সমগ্র গোষ্ঠীটিতে সমস্ত বয়সের মানুষ এবং নারী-পুরুষ সব মিলিয়ে প্রতি ১০-১২ জনের মধ্যে একজনের উজ্জ্বল রূপালী-ধূসর বর্ণের চুল থাকে, আর এটা বংশগতভাবেই সঞ্চারিত হয় (দ্রঃ, "নর্থ আমেরিকান ইণ্ডিয়ানস্", তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৪২, খণ্ড ১, পৃঃ ৪৯)। এরকম লোকেদের চুল ঘোড়ার কেশরের মতো মোটা আর কর্কশ হয়ে থাকে, বাদবাকীদের চুল পাতলা ও কোমল।

তুলে বলা যায়—যে-সব পার্থক্য মানুষের পক্ষে সহায়ক, কেবলমাত্র সেগুলিই এভাবে বজায় থাকতে পারে। আমাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী বলা যায় (ভুল হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক), বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি তাদেরকে কোনরকম প্রত্যক্ষ বা বিশেষ সুবিধে দেয় না। অবশ্য মানুষের মননগত, নৈতিক বা সামাজিক গুণাবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে এ কথাটা প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন মানবজাতির যাবতীয় বাহ্যিক পার্থক্য নিয়তই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এ থেকেও বোঝা যায় যে এইসব পার্থক্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কেননা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলে বহুদিন আগেই এগুলি হয় একটা স্থায়ী রূপ নিত এবং সেই অনুযায়ীই বজায় থাকত, অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। প্রাণিতত্ত্ববিদরা যাকে প্রোটিআন বা পলিমরফিক (protean or polymorphic) বলে থাকেন, তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে মানুষের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই প্রোটিআন বা পলিমরফিক অত্যন্ত পরিবর্তনশীল চরিত্রের হয়ে থাকে, আর তার কারণ হল, প্রথমত, এই বিভিন্নতাগুলি নিতান্তই গুরুত্বহীন, এবং দ্বিতীয়ত, এর ফলে তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতার বাইরে থেকে যেতে পেরেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নানাভাবে বিভিন্ন মানবজাতির মধ্যেকার পার্থক্যের কারণ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের আলোচনায় আসেনি—যৌন নির্বাচন (sexual selection)। মানুষ এবং অন্যান্য বহু জীবজন্তুর উপর এই যৌন নির্বাচনের যথেষ্টই প্রভাব আছে। অবশ্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার যাবতীয় পার্থক্য যৌন নির্বাচনের ফলেই গড়ে উঠেছে—এ-কথা আমি বলতে চাইছি না। আসলে এই একটা বিষয়ই শুধু অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে। আমাদের স্বল্প জ্ঞান নিয়ে এ-ব্যাপারে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, মানুষে মানুষে কিছু-না-কিছু ছোটখাট পার্থক্য যেহেতু থাকেই—যেমন কারুর মাথা একটু গোল হয়, কারুর বা চ্যাপ্টা, কারুর নাক টিকালো আবার কারুর বা থ্যাবড়া—তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব পার্থক্য একটা স্থায়ী আর নির্দিষ্ট রূপ নিতে পারত, যদি এইসব পার্থক্যের পিছনের কারণগুলি আরও সুনির্দিষ্টভাবে ক্রিয়া করত এবং যদি তার সঙ্গে যুক্ত হত সুদীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্বিবাহ বা রক্তসম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে মিলন। এই পার্থক্যগুলি সাময়িক বা অস্থায়ী চরিত্রের হয়ে থাকে, যে বিষয়ে এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, এবং যথোপযুক্ত অভিধার অভাবে এগুলিকে প্রায়শই স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা হয়। আমি এ-কথাও বলতে চাইছি না যে যৌন নির্বাচনের ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানসম্মত

পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে, এই যৌন নির্বাচন অসংখ্য জীবজন্তুর ক্ষেত্রেই এক নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে। কাজেই, এই বিষয়টা যদি মানুষের মধ্যেও কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তা এক বিচিত্র ঘটনা হিসেবেই প্রতিভাত হবে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। সেইসঙ্গেই দেখানো যায় যে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে-সব পার্থক্য রয়েছে, যেমন গায়ের রঙ, রোমশতা, মুখের আদল ইত্যাদি বিষয়ে, এগুলি এমন ধরণের পার্থক্য যা যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে উদ্ভূত হতেই পারে। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করতে হলে গোটা প্রাণী-জগৎটারই পর্যালোচনা করতে হয়। তাই এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আমি মূলত এই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করেছি। সবশেষে আমি আবার মানুষের প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা করব, এবং যৌন নির্বাচন তাকে কতটা পরিবর্তিত করেছে দেখানোর পর এই প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের একটা সারসংক্ষেপ উপস্থাপিত করব।

সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার

(তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ)

আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, কোন নিম্নতর জীব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষ—বিকাশের ধরণ—মানুষের বংশবৃত্তান্ত—মননগত ও নৈতিক গুণ—যৌন নির্বাচন—উপসংহার।

এই গোটা বইটার একটা ছোট্ট সারসংক্ষেপ হাজির করা গেলে এর মূল বিষয়গুলি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এখানে যে সমস্ত মত অভিব্যক্ত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি নিছকই অনুমানভিত্তিক, এবং কোন কোনটা ভুল বলেও প্রমাণিত হবে। তবে, গোটা বইটাতে আমি যেখানেই কোন একটা মতের পক্ষে দাঁড়িয়েছি, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কেন আমি সেই মত সমর্থন করছি—তার কারণও দেখানোর চেষ্টা করেছি। মানুষের ইতিহাসের কিছু জটিল সমস্যার উপরে কতটা আলোকপাত করতে পারে বিবর্তনবাদ, তা খুঁজে দেখা দরকার ছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে ভ্রান্ত তথ্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা এগুলি দীর্ঘদিন ধরে চালু থেকে ভ্রান্তি ছড়ায়। কিন্তু কিছুটা যুক্তি-প্রমাণবিশিষ্ট কোন ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী খুব একটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে না, কারণ সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রান্তি প্রমাণের ব্যাপারে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠে। ভ্রান্তিটা প্রমাণ করা গেলে ভুল-ঠিকানায় যাওয়ার একটা পথ বন্ধ হয়ে যায় আর সেই-সঙ্গেই অনেক সময় খুলে যায় সত্যের ঠিকানামুখী পথের দুয়ার।

কোন নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই মানুষ উদ্ভূত হয়েছে—এটাই এ বইয়ের প্রধান সিদ্ধান্ত, এবং বহু অভিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্ববিদই এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন। যে বনিয়াদের উপর এই সিদ্ধান্তটি গড়ে উঠেছে, তা কখনোই নাকচ হয়ে যেতে পারে না। কারণ, মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের ভ্রূণগত বিকাশের মধ্যেকার এবং শারীরিক গঠন-কাঠামোর অসংখ্য বিষয়ের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য (যেগুলির কোনটা হয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আবার কোনটা বা নিছকই মামুলী), তার শরীরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত টিকে থাকা নানান লুপ্তপ্রায় অংশ, এবং তার মধ্যে মাঝে মাঝে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়—এই বিষয়গুলিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এগুলি সম্বন্ধে অনেকদিন আগে থেকেই নানা কিছু জানা গেছে, কিন্তু

মানুষের উদ্ভবের সঙ্গে এগুলির সম্পর্কটা কী—তা কিছুদিন আগে পর্যন্তও জানা যায়নি। আজ সমগ্র জীবজগৎ সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তার আলোকে বিচার করলে এগুলির তাৎপর্য দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিষয়গুলিকে অন্যান্য কিছু বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করলে, যেমন একই প্রজাতির সদস্যদের পারস্পরিক সাদৃশ্য, অতীতে এবং বর্তমানে তাদের ভৌগোলিক বিন্যাস এবং তাদের ভূতাত্ত্বিক পারম্পর্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করলে, সবকিছুর মধ্যে বিবর্তনবাদের অমোঘ নীতিটাই আমাদের সামনে একান্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এই সবকটি বিষয়ই ভ্রান্ত, এমন ভাবাটা নিতান্তই অর্থহীন। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলীকে যারা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিমাত্র বলে দেখতে (বন্যরা যেভাবে দেখে) রাজি নয়, তারা কোনমতেই আর মেনে নেবে না যে মানুষ পুরোপুরি এককভাবে, সবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মানবশিশুর ভ্রূণের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর, যেমন কুকুরের, ভ্রূণের সাদৃশ্য ; অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের করোটি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সমগ্র দৈহিক কাঠামোর সঙ্গে মানুষের করোটি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দৈহিক কাঠামোর মিল (এ-সব অঙ্গ যে কাজেই ব্যবহৃত হোক না কেন) ; শারীরগঠনের বিভিন্ন অংশ যা চতুষ্পদ স্তন্যপায়ীদের মধ্যেই দেখা যায় অথচ সাধারণত মানুষের শরীরে থাকে না, এমন কিছু অংশ—যেমন বেশ কিছু পেশী, কখনো কোন মানুষের শরীরে হঠাৎ দেখতে পাওয়া, এবং এ-রকম আরও অনেক বিষয় থেকে এটা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়—যে আদি পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা, সেই একই পূর্বপুরুষ থেকেই মানুষেরও উদ্ভব হয়েছে।

আমরা দেখেছি, শরীরের সমস্ত অংশের ব্যাপারে এবং মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে হরেক রকমের ফারাক থাকে। নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে যে-সব কারণে এ-ধরণের পার্থক্য বা বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির ব্যাপারে যে-সব নিয়ম ক্রিয়াশীল থাকে, মানুষের ক্ষেত্রেও সেইসব কারণ ও নিয়মগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। নিম্নতর প্রাণী এবং মানুষ—উভয়ের ক্ষেত্রেই বংশগতির একই নিয়ম কাজ করে। হাতের কাছে জীবনযাপনের যতটুকু উপকরণ থাকে, তার পরিধি ছাড়িয়ে দ্রুত বেড়ে চলে মানুষের সংখ্যা। ফলে দেখা দেয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর সংগ্রাম, আর সুযোগ পেলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম। একই ধরণের বেশ কিছু সুস্পষ্ট পার্থক্য বা বিভিন্নতা বংশপরম্পরাক্রমে চলতে থাকাটা এ ব্যাপারে মোটেই অত্যাবশ্যক নয়, মানুষের একের সঙ্গে অপরের যে সামান্য পার্থক্য থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠার জন্য

সেটুকুই যথেষ্ট। আবার এমনটা মনে করারও কোন কারণ নেই যে একই প্রজাতির অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর শরীরের প্রতিটি অংশের সঙ্গে অন্য প্রজাতির প্রাণীদের শরীরের অংশগুলির পার্থক্য হুবহু একইরকম। দীর্ঘকাল ধরে কোন অঙ্গ ব্যবহৃত বা অব্যহৃত হতে থাকলে তার বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়াও অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো একটা ভূমিকা নেয়। শরীরের যে-সমস্ত পরিবর্তন একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল অথচ আজ আর যেগুলির বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, সেগুলি বহুদিন ধরে বংশপরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়ে চলে। শরীরের কোন একটা অংশ পরিবর্তিত হলে অন্যান্য অংশগুলিও আন্তঃসম্পর্কের নিয়মের দরুণ পরিবর্তিত হয়। আন্তঃসম্পর্কযুক্ত অঙ্গবিকৃতির নানান ঘটনার মধ্যে এর নজির আমরা পেয়েছি। জীবনযাপনের পারিপার্শ্বিক, যেমন সুপ্রচুর খাদ্য, উষ্ণতা বা আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট প্রভাবেরও একটা ভূমিকা আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আর শেষতঃ শারীরিকভাবে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কয়েকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে যৌন নির্বাচনের সাহায্যে।

মানুষ এবং অন্যান্য প্রতিটি প্রাণীর শরীরেই এমন কিছু কিছু অংশ থাকে, আমাদের সীমিত জ্ঞানে মনে হয় যেগুলি এখন তার কোন কাজেই লাগে না বা আগেও লাগত না, এবং এই কাজে না-লাগার কারণ হয়ত জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থা কিম্বা একের সঙ্গে অন্যদের যৌণ সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত। কোন একটি ধরণের নির্বাচন অথবা অঙ্গগুলির ব্যবহার বা অব্যবহারের বংশানুক্রমিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে এইসব অপ্রয়োজনীয় অংশগুলির উদ্ভবের ব্যখ্যা করা যায় না। তবে, আমরা আমাদের গৃহপালিত পশুদের শরীরে কখনও কখনও যে-সব অদ্ভুত ও সুস্পষ্ট গঠন-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, সেগুলির অজানা কারণসমূহ যদি তাদের সকলকার মধ্যে সমানভাবে কাজ করত, তাহলে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভবত ঐ প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যেই ফুটে উঠতে দেখা যেত। এ-ধরণের পরিবর্তনের কারণ কী, ভবিষ্যতে তা জানতে পারার আশা করতে পারি আমরা, বিশেষত অঙ্গবিকৃতির ব্যাপারটার সাহায্যে এই কারণগুলো বোঝা যেতে পারে। বহু পর্যবেক্ষক, যেমন মঁসিয় কামিল দারেস্ত, যে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন, তা ভবিষ্যতে খুবই সম্ভাবনাময় ভূমিকা নিতে পারে। সাধারণভাবে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে প্রতিটা ছোটখাট বিভিন্নতা এবং প্রতিটা অঙ্গবিকৃতির কারণ চারপাশের অবস্থার চরিত্রের মধ্যে যতটা না নিহিত থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি নিহিত থাকে প্রাণীদের শারীরিক

কাঠামোর মধ্যেই। অবশ্য বহু ধরণের শারীরিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে নতুন ও পরিবর্তিত অবস্থা নিঃসন্দেহেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যে-সব উপায়ের কথা এইমাত্র বলা হল সেগুলির সাহায্যে এবং সম্ভবত এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত আরও কিছু উপায়ের সাহায্যেই মানুষ তার আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন থেকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠল, তখন থেকেই গড়ে উঠতে থাকল বিভিন্ন পৃথক পৃথক জাতি, বা আরও সঠিক অর্থে বললে, বিভিন্ন উপ-প্রজাতি। এ-রকম কোন কোন উপ-প্রজাতির মধ্যে, যেমন নিগ্রো ও ইউরোপিয়াননের মধ্যে, পার্থক্য এতই বেশি যে এই দুই শাখার দু'জন মানুষকে কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের কাছে হাজির করলে এবং তাদের সম্বন্ধে আর কোন তথ্য তাঁকে না জানালে, তিনি নির্ঘাৎ এদের দুজনকে দুটি পৃথক প্রজাতির সদস্য বলে চিহ্নিত করে দেবেন! তাসত্ত্বেও, সমস্ত জাতির মানুষদের দৈহিক কাঠামোর অসংখ্য ছোটখাট বিষয় এবং মানসিক বহু বৈশিষ্ট্য একইরকম। এর কারণ একমাত্র এ-ই হতে পারে যে, তারা প্রত্যেকেই কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এগুলি অর্জন করেছে উত্তরাধিকার সূত্রে। আর এইসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সেই আদি পূর্বপুরুষকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

একটা জাতি থেকে আর একটা জাতির পার্থক্য এবং মূল বংশের থেকে প্রত্যেক জাতির পার্থক্যের উৎস কোন এক আদি মানব-মানবীর মধ্যেই নিহিত ছিল— এমনটা ভাবলে ভুল হবে। আসলে পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে জীবন-যাপনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পক্ষে যারা অধিকতর উপযুক্ত ছিল (কেউ কিছুটা বেশি, কেউ কিছুটা কম), তারা ঐ অবস্থার পক্ষে অনুপযুক্তদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় টিকে থাকতে পেরেছিল। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিল রয়েছে সেই প্রক্রিয়ার, যেখানে মানুষ মিলনের জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেছে নেয় না, বরং শুধু উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিদের সাহায্যেই সন্তান উৎপাদন করায় এবং নিকৃষ্টতরদের অবহেলা করে। এইভাবে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে সে তার নিজের বংশ বা গোষ্ঠীকে পরিবর্তিত করে এবং অসচেতনভাবেই গড়ে তোলে এক নতুন বংশধারা। কাজেই, কোনরকম নির্বাচন ব্যতীতই অর্জিত পরিবর্তনের ব্যাপারে, এবং নির্দিষ্ট জীবটির প্রকৃতি ও চারপাশের অবস্থার প্রভাবের ফলে অথবা জীবনযাপনের পরিবর্তিত আচার-অভ্যাসের ফলে উদ্ভূত বিভিন্নতাসমূহের দরুণ কোন একজোড়া নারী-পুরুষ ঐ

একই দেশে বসবাসকারী অন্য নারী-পুরুষদের চেয়ে বেশি পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে না, কেননা এদের সকলকার মধ্যে অবাধ যৌনমিলনের দরুণ অবিরাম একটা সংমিশ্রণ ঘটেই চলে।

মানুষের ভ্রূণাবস্থার গঠন-কাঠামো, নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য, তার শরীরের বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় অঙ্গ এবং মাঝে-মাঝে তার মধ্যে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের যে প্রবণতা দেখা যায়—এগুলি থেকে আমরা আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারি এবং জীবজগতের সমগ্র সারিতে তাদের সঠিক স্থানটাও মোটামুটি নির্ধারণ করতে পারি। আমরা জেনেছি যে কোন এক রোমশ, লেজবিশিষ্ট চতুষ্পদী প্রাণী থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল মানুষ, যে প্রাণীটি সম্ভবত বৃক্ষবাসী ছিল এবং বসবাস করত পূর্ব গোলার্ধে। কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ যদি এই প্রাণীটির সমগ্র দৈহিক-কাঠামো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে খুব সম্ভবত তিনি এদেরকে ঠিক পূর্ব গোলার্ধের এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাঁদরদের আরও প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মতো চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী প্রাণী (quadrumana) হিসেবেই চিহ্নিত করতেন। চতুষ্পদী স্তন্যপায়ীরা এবং যাবতীয় উন্নততর স্তন্যপায়ীরাই সম্ভবত উদ্ভূত হয়েছে কোন এক প্রাচীন ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণী থেকে, এই ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণী উদ্ভূত হয়েছিল কোন উভচর-সদৃশ জীব থেকে বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে দিয়ে বিবর্তনের ধারায়, আবার এই উভচর-সদৃশ জীবের উদ্ভব ঘটেছিল মাছের মতো কোন জীব থেকে। সুদূর অতীতের ধূসর কুয়াশা সরালে বোঝা যায়—সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর আদি পূর্বপুরুষ ছিল নিঃসন্দেহেই কোন জলচর প্রাণী, তাদের শরীরে ফুলকা থাকত, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই একই শরীরে বিদ্যমান থাকত, এবং শরীরের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি (যেমন মস্তিষ্ক বা হৃদ্‌পিণ্ড) ছিল অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত বা একেবারেই অবিকশিত। ঐ-সব প্রাণীদের সঙ্গে সবথেকে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় বর্তমানের সামুদ্রিক জীব অ্যাসিডিয়ানের শূককীটের সঙ্গে।

মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায় আমাদের মননগত ক্ষমতা ও নৈতিক প্রবণতার প্রশ্নটা। কিন্তু বিবর্তনবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা সহজেই বুঝে নিতে পারেন যে, উন্নততর জীবজন্তুদের বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতাও (যে ক্ষমতার ধরণটা ঠিক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতারই মতো, যদিও মাত্রাগত পার্থক্যটা বিপুল) বিকশিত হয়ে চলে। তাই দেখা যায় উন্নততর জাতের বাঁদর বা বনমানুষদের

সঙ্গে মাছেদের, কিম্বা পিঁপড়েদের সঙ্গে ক্ষুদ্র কোন কীটেদের মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য বিপুল। কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের মানসিক ক্ষমতার বিকাশের প্রশ্নটা খুব একটা জটিল নয়, কেননা আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তাদের মানসিক ক্ষমতা পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রকৃতির কোলে স্বাধীন অবস্থায় থাকার সময় এগুলি যে জীবজন্তুদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, এই ব্যাপারটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তাদের অগ্রগতির অনুকূল। মানুষের সম্বন্ধেও এই একই সিদ্ধান্ত করা চলে: অত্যন্ত সুপ্রাচীন কালেও মননশক্তি তার পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই শক্তির সাহায্যেই সে উদ্ভাবন করেছিল ভাষা এবং ব্যবহার করেছিল সেই ভাষাকে, তৈরী করেছিল নানান হাতিয়ার, উপকরণ, ফাঁদ ইত্যাদি; আর নিজের সামাজিক আচার-অভ্যাসের বলে বহুদিন আগেই সে সমস্ত সজীব প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর স্থান অর্জন করেছিল।

আধা-উদ্ভাবন এবং আধা-সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে ভাষাকে মানুষ যখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করল, তখন থেকে তার মননশক্তির বিকাশও ঘটে চলল দ্রুততালে। কারণ ভাষার অবিরাম ব্যবহার প্রতিক্রিয়া ঘটাতো মস্তিষ্কে এবং তা সঞ্চারিত হত উত্তরাধিকারসূত্রে। এটা আবার ছাপ ফেলতো ভাষার অগ্রগতির উপর। মিঃ চন্সি রাইট চমৎকারভাবে বলেছেন, নিম্নতর প্রাণীদের তুলনায় মানুষের মাথা যে তার শরীরের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে বড় হয়, সম্ভবত তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, সেই প্রাচীনকালে কোন সাদামাটা ধরণের ভাষা ব্যবহার করার দরুণই তার মাথাটা শরীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে গিয়েছিল। ভাষা হচ্ছে এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যা সমস্ত জিনিস ও গুণ বা ক্ষমতার জন্য আলাদা আলাদা সংকেতের জন্ম দিয়েছে, মানুষের মধ্যে গড়ে তুলেছে সুশৃঙ্খল চিন্তাধারা, যা নিছক ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি থেকে কখনোই গড়ে উঠতে পারত না বা গড়ে উঠলেও তাকে টিকিয়ে রাখা যেত না। মানুষের উন্নততর মননগত ক্ষমতাসমূহ—যেমন যুক্তিপ্রয়োগ, বিভিন্ন ঘটনার সার-সংকলন, আত্মসচেতনতা প্রভৃতি—সম্ভবত গড়ে ওঠে অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার অবিরাম অগ্রগতি ও অনুশীলনের ফলেই।

নৈতিক গুণাবলীর বিকাশের প্রশ্নটা আরও চিত্তাকর্ষক। এর বনিয়াদ নিহিত থাকে সামাজিক প্রবৃত্তির মধ্যে, পারিবারিক বন্ধনও যার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবৃত্তি-গুলি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং নিম্নতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিগুলি

কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজের দিকে বিশেষ প্রবণতা সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু ভালবাসা আর সহানুভূতির সুনির্দিষ্ট বোধ হচ্ছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীবজন্তুরা পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দ পায়, বিপদের সময় একে অপরকে সতর্ক করে দেয় এবং একে অপরকে নানাভাবে রক্ষা ও সাহায্য করে। এই প্রবৃত্তিগুলি কিন্তু একই প্রজাতির সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, এগুলি প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র একই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের মধ্যেই। যেহেতু এগুলি প্রজাতির পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, তাই ধরে নেওয়া যায় যে খুব সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই এগুলি অর্জিত হয়েছিল।

নৈতিকগুণসম্পন্ন প্রাণী একমাত্র তাকেই বলা চলে, যে তার নিজের অতীত কার্যকলাপ এবং সেগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে, আর সেইসব কাজের কোন কোনটাকে সঠিক ও কোন কোনটাকে বেঠিক বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম। এ-কথা অনস্বীকার্য যে একমাত্র মানুষই এইসব ক্ষমতার অধিকারী, আর নিম্নতর প্রাণীদের সঙ্গে তার যাবতীয় পার্থক্যের মধ্যে এটাই হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে নৈতিক বোধ সৃষ্টি হয়, প্রথমত, সামাজিক প্রবৃত্তিসমূহের চিরস্থায়ী ও সদা-বর্তমান প্রকৃতির দরুণ; দ্বিতীয়ত, কোন কাজ সম্বন্ধে নিজের প্রতিবেশীদের অনুমোদন বা অননুমোদনকে মানুষ মূল্য দেয় বলে; এবং তৃতীয়ত, তার মানসিক ক্ষমতার উন্নততর কার্যকলাপের দরুণ, যেখানে অতীতের স্মৃতি তার মনের পর্দায় ফুটে থাকে নিখুঁতভাবে। এই শেষোক্ত বিষয়টিতেই সে নিম্নতর প্রাণীদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। মনের এই ক্ষমতার দরুণ মানুষ বাধ্য হয় অতীত আর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে, এবং অতীতের ঘটনাগুলির মূল্যায়ণ করতে। তাই দেখা যায় কোন সাময়িক আকাঙ্খা বা আবেগ মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিকে কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য দমিয়ে রাখার পর সে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং ঐ প্রশমিত হয়ে আসা তাড়নাটিকে তুলনা করে সদা-বর্তমান সামাজিক প্রবৃত্তির সঙ্গে। তখন তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে একটা অসন্তুষ্টির ভাব—আসলে অতৃপ্ত যে-কোন প্রবৃত্তিই মানুষের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়। অতঃপর সে সিদ্ধান্ত নেয় যে ভবিষ্যতে সে আর ও-রকম কাজ করবে না। এটাকেই আমরা বিবেকবোধ বলে থাকি। অন্য কোন প্রবৃত্তির থেকে অধিকতর জোরদার বা দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করে, যে অনুভূতিকে আমরা প্রকাশ করে থাকি 'এ কাজটা

করা অবশ্যই উচিত' বলে। কোন শিকারী কুকুর যদি নিজের অতীত কার্যকলাপ সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারত, তাহলে সে হয়ত নিজেকে বলত (যেমনটা আমরা তার সম্বন্ধে বলে থাকি)—আমার উচিত ছিল ঐ খরগোশটার দিকে ভাল করে নজর রাখা; ওটাকে শিকার করার তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বশে আমার অমন করে ছুটে যাওয়াটা ঠিক হয় নি।

সমাজবদ্ধ প্রাণীদের একটা আকাঙ্খা তাদেরকে আংশিকভাবে অনুপ্রাণিত করে সাধারণভাবে নিজের গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য করতে, কিন্তু এই আকাঙ্খা তাকে অনেক বেশি করে অনুপ্রাণিত করে কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করতে। মানুষও তার আশপাশের অন্যান্য মানুষদের সাহায্য করার ব্যাপারে একই সাধারণ আকাঙ্খার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু তার কোন বিশেষ প্রবৃত্তি নেই বা থাকলেও তা খুবই কম। কথার সাহায্যে নিজের আকাঙ্খা ব্যক্ত করার ব্যাপারে তার যে ক্ষমতা রয়েছে, সেক্ষেত্রেও সে নিম্নতর প্রাণীদের থেকে আলাদা। কথার দ্বারা আকাঙ্খা ব্যক্ত করার এই ক্ষমতা সাহায্য চাওয়ার বা দেওয়ার অন্যতম নির্দেশকের ভূমিকা দখল করেছে। সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যটাও অনেক পাল্টে গেছে মানুষের মধ্যে। এখন আর এটা শুধু এক অন্ধ প্রবৃত্তি-সঞ্জাত ব্যাপার নয়। অন্যান্য মানুষদের প্রশংসা বা নিন্দা এখন এই উদ্দেশ্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে থাকে। প্রশংসা ও নিন্দা করা বা তা উপলব্ধি করার ভিত্তি হল সহানুভূতি। আমরা দেখেছি যে এই সহানুভূতি বোধটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রবৃত্তি সমূহের অন্যতম। সহানুভূতি ব্যাপারটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে অর্জিত হলেও, অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা তা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। যেহেতু মানুষ মাত্রেই খোঁজে তার নিজের সুখ, তাই কোন কাজ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার প্রশংসা বা নিন্দাও নির্ভর করে সেই কাজ বা উদ্দেশ্য তাকে সুখ দিতে পারছে কিনা—তারই উপর। আর সুখ যেহেতু সার্বজনীন মঙ্গলের এক অপরিহার্য উপাদান, তাই সর্বাধিক মানুষকে সুখী করতে পারার নীতিটা সঠিক-বেঠিক নির্ধারণের একটা নিরাপদ মানদণ্ড হিসেব কাজ করে থাকে পরোক্ষভাবে। মানুষের যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা যত উন্নত হয় এবং যতই সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ততই ব্যক্তির চরিত্রের উপর এবং সার্বজনীন মঙ্গলের উপর কিছু কিছু আচার-আচরণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন মানুষের এই উপলব্ধিপ্রসূত গুণগুলিকে জনমতের দ্বারা যাচাই করার অবস্থা সৃষ্টি হয়, সেগুলি প্রশংসা লাভ করে এবং তার বিপরীত ব্যাপারগুলিকে নিন্দা করে মানুষ, কিন্তু অনুন্নত জাতিগুলি

প্রায়শই যুক্তিপ্রয়োগে ভুল করে থাকে, অনেক কুপ্রথা ও বাজে কুসংস্কারকেও তারা ঐ ভুল যুক্তি দিয়ে বিচার করে। ফলে সেগুলি তাদের কাছে উচ্চ গুণের মর্যাদা পায় আর তা ভঙ্গ করাকে তারা দারুণ অপরাধ বলে মনে করে।

মননগত ক্ষমতার থেকে মানুষের নৈতিক গুণাবলীকে সঙ্গতভাবেই অধিক মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, অতীতের স্মৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ করতে পারার ব্যাপারে মনের যে শক্তি আছে, তা হচ্ছে বিবেকবোধের অন্যতম মৌলিক (যদিও গৌণ) বনিয়াদ। প্রতিটি মানুষের মননগত ক্ষমতাকে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুশিক্ষিত ও উদ্দীপিত করে তোলার সবথেকে জোরদার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় এই ঘটনার মধ্যেই। কোন জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে যদি কিছুটা সামাজিক অনুভূতি ও সহানুভূতিবোধ থাকে, তাহলে স্বভাবিকভাবেই সে ভালো কাজই করার চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে যথেষ্ট সংবেদনশীল বিবেকবোধও থাকতে পারে। তবে, যা-কিছু আমাদের কল্পনাকে আরও বিশদ করে তোলে এবং অতীতের স্মৃতিকে স্মরণ করায় ও আজকের ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা করার অভ্যাসকে জোরদার করে তোলে, তা আমাদের বিবেকবোধকেও করে তোলে আরও সংবেদনশীল, আর এমনকি সামাজিক অনুভূতি ও সহানুভূতির ঘাটতিকেও কিছুটা পূরণ করতে পারে।

মানুষের নৈতিক প্রকৃতি আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছতে পেরেছে অংশত তার যুক্তিপ্রয়োগের শক্তি উন্নত হওয়া এবং তার ফলস্বরূপ একটা যুক্তিসম্মত জনমত গড়ে ওঠার মাধ্যমে। কিন্তু অভ্যাস, দৃষ্টান্ত, নির্দেশ ও চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে তার সহানুভূতিবোধ আরও কোমল আর আরও পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠাটা এর পিছনে আরও বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বিভিন্ন সদ্‌গুণসম্মন্ন প্রবণতাগুলি যদি মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্রিয়াশীল থাকে, তাহলে একসময় সেগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হতেও পারে। কোন এক সর্বদ্রষ্টা দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে সুসভ্য জাতিগুলি, আর এই বিশ্বাসটা তাদের নীতিবোধকে অনেক উন্নত করে তুলেছে। শেষ বিচারে মানুষ তার আশপাশের অন্যান্য লোকজনের প্রশংসা বা নিন্দাকে নিজের কার্যকলাপের একমাত্র পথ-প্রদর্শক বলে মেনে নেয় না (যদিও এই প্রশংসা বা নিন্দার প্রভাব থেকে প্রায় কেউই মুক্ত নয়), বরং তার পথ-প্রদর্শক হয়ে ওঠে যুক্তিসম্মত প্রত্যয়। তখন সে নিজের বিবেকবোধ দিয়েই সবকিছু বিচার করে, পরিচালিত করে। তাসত্বেও, নৈতিক বোধের প্রধান ভিত্তি বা উৎস হল সামাজিক প্রবৃত্তি, এবং সহানুভূতিবোধও এই প্রবৃত্তির অন্তর্গত। আর ঠিক নিম্নতর প্রাণীদের মতো মানুষও এইসব প্রবৃত্তি

অর্জন করেছিল মূলত প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ।

অনেকেই বলে থাকেন যে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ পার্থক্য হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা ও না-থাকা। তবে এই বিশ্বাসটা যে মানুষের সহজাত বা প্রবৃত্তিগত হতে পারে না, তা আমরা আগেই দেখেছি। আবার অন্যদিকে, সর্বব্যাপী কোন এক ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসটা সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে আছে। আপাতভাবে এই বিশ্বাসটি গড়ে ওঠে মানুষের যুক্তি-সম্মত চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতির ফলে, এবং আরও বেশি তার কল্পনাশক্তি, কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ বেড়ে ওঠার ফলে। ঈশ্বর বিশ্বাসটাকে মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে দেখিয়ে যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তা আমি জানি। কিন্তু এ যুক্তিটা একেবারেই অচল। তাহলে তো আমাদের বেশ কিছু নির্দয় ও ক্ষতিকর ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়, কেননা কোন মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের থেকে এইসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাসটা আরও সার্বজনীন। দীর্ঘদিনের চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত উন্নত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোন সর্বব্যাপী ও মঙ্গলময় সৃষ্টি-কর্তার ধারণা তার মাথায় আসে নি।

যাঁরা বিশ্বাস করেন নিম্নশ্রেণীর কোন প্রাণী থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই উদ্ভব হয়েছে মানুষের, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন যে আত্মার অবিনশ্বরতা সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে এটা কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। স্যার জে. লুবক দেখিয়েছেন, বর্বর মানবজাতিগুলির মধ্যে এ-রকম কোন সুস্পষ্ট ধারণার অস্তিত্ব নেই। তবে, আমরা দেখেছি যে বন্য মানুষদের আদিম বিশ্বাস থেকে আহরিত যুক্তিগুলি আমাদের প্রায় কোন সাহায্যই করে না। অতি ক্ষুদ্র একটা কোষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে বিকাশের ঠিক কোন্ পর্যায়ে এসে মানুষ একটা অবিনশ্বর প্রাণীর মর্যাদা পেল—তা নির্ধারণ করা অসম্ভব এবং তা নিয়ে খুব কম জনেরই মাথাব্যথা আছে। তাছাড়া এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভও নেই, কেননা ধাপে ধাপে এগিয়ে-চলা জৈবিক শৃঙ্খলার বিশাল পরিধির মধ্যে ঠিক কখন ঐ পর্যায়টা এসেছিল, তা নির্ধারণ করা সম্ভবও নয়।

আমি জানি এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলিকে অনেকেই চরম অধার্মিক ব্যাপার বলে মনে করবেন। কিন্তু এইসব সিদ্ধান্তকে যাঁরা অস্বীকার করবেন, তাঁদেরকে ও প্রমাণ করতে হবে যে মানুষের জন্মকে সাধারণ জননক্রিয়ার ফল হিসাবে দেখানোর চেয়ে, কোন নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে রূপান্তর ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত ব্যাখ্যাটা কেন বেশি অধার্মিক ব্যাপার হিসেবে

বিবেচিত হবে। কোন প্রজাতি এবং তার প্রতিটি সদস্যের জন্মের প্রশ্নটা সেই সুদীর্ঘ ঘটনা-পরম্পরারই অঙ্গ, তাকে নিছক আকস্মিক কিছু সুযোগের ফল বলে মেনে নিতে আমরা রাজি নই। দৈহিক কাঠামোর প্রতিটি ছোটখাট পরিবর্তন, বিবাহের মধ্য দিয়ে প্রতিটি নারী-পুরুষের মিলন, প্রতিটি শুক্রাণুর বিস্তার এবং এ ধরণের অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা আসলে কোন-না-কোন বিশেষ উদ্দেশ্যই সাধন করে—আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তার কিছু যায় আসে না। আর আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে রাজি হয় না।

যৌন নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক কিছুই যে আজও অজানার কুয়াশায় ঢাকা, তা আমি জানি। তবু আমি গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বচ্ছ একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রাণীজগতের নিম্নতর ধাপগুলিতে এই যৌন নির্বাচনের প্রায় কোন ভূমিকাই নেই। এইসব নিম্নতর প্রাণীরা অনেক সময় জীবনভোর একই জায়গায় থেকে যায়, বা একই শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই বিদ্যমান থাকে, কিম্বা (যা আরও গুরুত্বপূর্ণ) তাদের উপলব্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতা এতটা উন্নত হয় না যা দিয়ে তারা ভালবাসা বা ঈর্ষা অনুভব করতে অথবা ভাল-মন্দ বাছাই করতে পারে। তবে, সন্ধিপদ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে, এমনকি এই দুই বিরাট উপ-পর্বের নিম্নতম প্রাণীদের ক্ষেত্রেও, যৌন নির্বাচন এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জীবজগতের বড় বড় শ্রেণীগুলিতে, অর্থাৎ স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীসৃপ, মাছ, কীট-পতঙ্গ, এমনকি কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের (কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি) মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি প্রায় একইরকম। এদের সবার ক্ষেত্রেই পুরুষরাই সাধারণত প্রণয়-প্রার্থী হয়, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য শুধু তাদেরই শরীরে থাকে অস্ত্রের মতো ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন অঙ্গ। সাধরণত তারা নারীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও আকারে বড় হয়, আর সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে থাকে সাহস ও সংগ্রামপ্রিয় মেজাজ। গান গাওয়া বা শিস্ দেওয়ার ক্ষমতাও শুধু পুরুষদেরই থাকে বা অন্ততপক্ষে নারীদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। তাছাড়া পুরুষদের শরীরেই থাকে সুগন্ধ উৎপাদক গ্রন্থি। নানাধরণের অসংখ্য উপাঙ্গের অধিকারী হয় পুরুষরা, তাদের শরীরে দেখা যায় চোখ-জুড়োনো কিম্বা অদ্ভুত ধরণের রঙের কারুকাজ, আর নারীরা থাকে এ-সব থেকে বঞ্চিত। আবার যে-সব প্রজাতির প্রাণীদের স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক কাঠামোর মধ্যে আরও গুরুতর পার্থক্য থাকে, তাদের

ক্ষেত্রেও শুধু পুরুষদের শরীরেই থাকে স্ত্রী-প্রাণীদের চিনে নেওয়ার মতো বিশেষ ইন্দ্রিয়, আর সেইসঙ্গেই থাকে স্ত্রী-প্রাণীর কাছে পেঁছনোর উপযুক্ত সঞ্চরণ-অঙ্গ এবং এমনকি সঙ্গিনীকে আঁকড়ে ধরার মতো বিশেষ অঙ্গও থাকে কারো কারো মধ্যে। স্ত্রী-প্রাণীদের মোহিত করা বা করায়ত্ত করার এই উপাদানগুলি পুরুষ প্রাণীদের শরীরে প্রায়শই বছরের বিশেষ একটা সময়ে, অর্থাৎ সঙ্গমের মরশুমে, সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক সময় এগুলি মেয়েদের মধ্যেও কমবেশি সঞ্চারিত হয়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এগুলি একেবারেই প্রাথমিক দশায় থাকে। পুরুষ প্রাণীদের নির্বীর্য করে দিলে তাদের এই উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে যায়, কিম্বা তারা আর কোনদিনই এগুলি অর্জন করতে পারে না। এইসব উপাদান কিন্তু অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না, এগুলি তাদের শরীরে দেখা দেয় তারা জননক্ষম হয়ে ওঠার কিছুদিন আগে থেকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই প্রজাতির অল্পবসী স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের দেখতে অনেকটাই একরকম হয়, আর স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সন্তানদের প্রচুর সাদৃশ্য থাকে। আবার জীবজগতের প্রতিটা বড় বড় শ্রেণীর মধ্যেই কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনার সন্ধান মেলে। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলি কোন কোন স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এত রকম একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের এই বিস্ময়কর সমরূপতাকে উপলব্ধি করা যায় এদের সকলকার মধ্যে একটা সাধারণ কারণের সক্রিয়তার কথা স্বীকার করে নিলে। এই কারণটাই হচ্ছে যৌন নির্বাচন।

কোন প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে অন্যান্যদের চেয়ে কয়েকজনের বেশি সফল হওয়ার উপরই নির্ভর করে যৌন নির্বাচন। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন সর্বদাই নির্ভর করে জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থার ব্যাপারে উভয় লিঙ্গের সদস্যদের সাফল্যের উপর। যৌন নির্বাচন দু ধরণের হয়ে থাকে : প্রথম ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাড়িয়ে দেওয়া বা হত্যা করার জন্য একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, সাধারণত পুরুষদের মধ্যেই, নির্বাচনটা ঘটে থাকে, আর মেয়েরা থাকে নিষ্ক্রিয় ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সংগ্রামটা ঘটে একই লিঙ্গভুক্ত সদস্যদের মধ্যে, যার উদ্দেশ্য থাকে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের, সাধারণত মেয়েদের, উত্তেজিত বা মোহিত করা, এবং মেয়েরাও আর তখন নিষ্ক্রিয় থাকে না, নিজেদের মনোমত সঙ্গী বেছে নেয়। এই শেষোক্ত ধরণের নির্বাচনটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে অন্য একটা ঘটনার, যেখানে মানুষ কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অথচ কার্যকরীভাবে তার গৃহপালিত জীবজন্তুদের মধ্যে একটা

নারীদের মধ্যে মনোহর অঙ্গসজ্জার প্রতি দারুণ আকর্ষণ থাকাটা (যাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়) বেশ বিস্ময়কর। সরীসৃপ, মাছ এবং কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটা আরও বিস্ময়জনক। তবে, নিম্নতর প্রাণীদের মনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি! যেমন, পুরুষ জাতীয় বার্ড অফ প্যারাডাইস (সুন্দর ডানাওয়ালা বায়স জাতীয় পাখি) বা ময়ূররা যে একেবারে বিনা উদ্দেশ্যেই অজস্র কষ্ট স্বীকার করেও স্ত্রী-পাখিদের সামনে নিজেদের পেখম খাড়া করে ছড়িয়ে দেয় ও নাচতে থাকে—তা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উল্লিখিত একটা বিষয়ের কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। তাঁরা বলেছেন, কাঙ্খিত পুরুষকে না পেলে অনেক ময়ূরী পুরো একটা মরশুম সঙ্গীহীন অবস্থায় কাটিয়ে দেয়, তবু অন্য কোন ময়ূরের সঙ্গে জোড় বাঁধে না।

তাসত্ত্বেও, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ইতিকথায় আমার জানা সবথেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল আর্গাস-ফেজ্যাণ্ট জাতীয় পুরুষ-পাখিদের ডানার পালকের মনোরম নকশা ও চক্রাকার অঙ্গসজ্জার আলো-ছায়াময় বর্ণচ্ছটা সম্বন্ধে স্ত্রী-পাখিদের তীব্র প্রীতি। যাঁরা মনে করেন এই জাতীয় পুরুষ-পাখিরা তাদের সৃষ্টির সময় থেকেই এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, তাঁদেরকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, বড় বড় পালকগুলি তাদের ডানাকে ওড়ার কাজে সাহায্য করে না এবং সেগুলি একমাত্র এই প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রেমনিবেদনের সময়ে বিচিত্রভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, সেই পালকগুলি তারা পেয়েছিল অঙ্গসজ্জা হিসেবেই। তাই যদি হয়, তাহলে সেইসঙ্গে তাঁকে এ-ও স্বীকার করে নিতে হবে যে ঐ প্রজাতির স্ত্রী-পাখিরাও একেবারে প্রথম থেকেই এই ধরণের অঙ্গসজ্জাকে মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল। আমার আপত্তি শুধু একটা জায়গাতেই। আমি মনে করি, আর্গাস-ফেজ্যাণ্ট জাতীয় পুরুষ-পাখিরা তাদের সৌন্দর্য অর্জন করেছে ক্রমান্বয়ে, এবং বহু প্রজন্ম ধরে স্ত্রী-পাখিরা সুন্দরতর অঙ্গসজ্জাবিশিষ্ট পুরুষদের পছন্দ করার ফলেই তা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রী-পাখিদের এই সৌন্দর্যচেতনা ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে অনুশীলন বা অভ্যাস মারফৎ—ঠিক আমাদের রুচিবোধের মতোই। পুরুষ-পাখিদের শরীরের কয়েকটি পালক ঘটনাচক্রে অপরিবর্তিত রয়ে গেলে দেখা যায় তার একদিকের কিছু ফিকে দাগ ধীরে ধীরে চমৎকার চক্রাকার অঙ্গসজ্জায় পরিণত হতে পারে, এবং সম্ভবত এভাবেই তাদের শরীরের অঙ্গসজ্জাগুলি সৃষ্টি হয়েছিল।

যাঁরা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে এটা মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ ও মাছেদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের নিজ নিজ প্রজাতির পুরুষদের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার মতো উন্নত রুচি অর্জন করতে পারে (যে রুচির সঙ্গে আমাদের রুচিও প্রায়শই মিলে যায়), তাঁদের একটু ভেবে দেখতে বলব যে মেরুদণ্ডী শ্রেণীর উচ্চতম প্রাণী থেকে শুরু নিম্নতম প্রাণী পর্যন্ত সকলেরই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ গড়ে উঠেছে এই মেরুদণ্ডী শ্রেণীর আদি সাধারণ পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। এইদিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় কিভাবে কতকগুলি মানসিক ক্ষমতা বিভিন্ন ধরণের জীবজন্তুর মধ্যে প্রায় একইভাবে ও একই মাত্রায় গড়ে উঠতে পেরেছে।

যৌন নির্বাচনের নীতিকে যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা এই উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্নায়ুতন্ত্র শুধু অধিকাংশ শারীরিক কার্যকলাপকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, সেই সঙ্গেই শরীরের বিভিন্ন গঠন-কাঠামোর এবং কিছু কিছু মানসিক ক্ষমতার বিকাশকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সাহস, সংগ্রামপ্রিয়তা, ধৈর্য, শারীরিক শক্তি ও আয়তন, সব ধরণের হাতিয়ার, সাঙ্গীতিক অঙ্গ (গান গাওয়া ও শিস দেওয়া উভয়েরই), উজ্জ্বলবর্ণ আর অঙ্গসজ্জামূলক উপাঙ্গ — এই সবকিছুই কোন একটি লিঙ্গের সদস্যরা পরোক্ষভাবে অর্জন করেছে পছন্দ-অপছন্দের প্রয়োগ, ভালবাসা ও ঈর্ষার প্রভাব এবং ধ্বনি, বর্ণ বা আকারের ব্যাপারে সুন্দরকে চিনে নিতে পারার সাহায্যে। আর, মনের এইসব ক্ষমতা স্পষ্টতই নির্ভর করে মস্তিষ্কের বিকাশের উপর।

গৃহপালিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও কুকুরদের মধ্যে যৌনমিলন ঘটানোর আগে মানুষ তাদের প্রকৃতি ও বংশবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিস্তর খোঁজখবর নেয়। কিন্তু নিজেদের বিবাহের ক্ষেত্রে তারা খুব কম সময়েই এরকম যত্ন নেয় বা আদৌ নেয় না। প্রকৃতির কোলে স্বাধীন অবস্থায় থাকার সময় জোড়-বাঁধার ব্যাপারে নিম্নতর প্রাণীরা যে প্রেরণার দ্বারা চালিত হয়, বিবাহের ব্যাপারে মানুষও চালিত হয় প্রায় সেই একই প্রেরণার দ্বারা—যদিও সে ঐ-সব প্রাণীদের থেকে উন্নত, কেননা মানসিক আকর্ষণ ও গুণকে সে বিপুল মূল্য দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদাও মানুষকে আকৃষ্ট করে দারুণভাবে। তবুও, উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারলে সে তার সন্তানদের শারীরিক গঠন ও কাঠামোকে উন্নত করতে পারে তো বটেই, সেই সঙ্গেই উন্নত করতে পারে তাদের মননগত ও নৈতিক গুণাবলীকেও। শারীরিক বা মানসিক-ভাবে যথেষ্ট অক্ষম নারী বা পুরুষদের বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলে

তারা যে সত্যিসত্যিই বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে, এমনটা আশা করা নেহাতই আকাশকুসুম কল্পনা, এবং বংশগতির নিয়মকে পুরোপুরি না জানলে এই আশা কোনদিনই আংশিকভাবেও বাস্তবায়িত হবে না। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা সমাজের মঙ্গলই করে চলেছেন। সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং বংশগতির নিয়মকে ভালভাবে বুঝতে পারলে আমাদের অজ্ঞ আইনপ্রণেতারা আর রক্তসম্পর্কযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা, তা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

কিভাবে মানবজাতির আরও বেশি মঙ্গল করা যায়, তা এক জটিল সমস্যা। যারা নিজেদের সন্তানদের চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে না, তাদের কারুরই বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ দারিদ্র্য শুধু একটা দারুণরকম ক্ষতিকর ব্যাপারই হয়, সেইসঙ্গেই দেখা যায় দারিদ্র্য যতই বেড়ে চলে, বিবাহের ব্যাপারে মানুষও ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মিঃ গ্যাল্টন যেমন বলেছেন, দূরদর্শী ব্যক্তিরা যদি বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে আর বেপরোয়ারা বিবাহ করে চলে, তাহলে একসময় সমাজের উৎকৃষ্টতর সদস্যদের চেয়ে নিকৃষ্টতরদের সংখ্যা বেশি হয়ে যেতে পারে। অন্য সব জীবজন্তুর মতো মানুষও আজকের উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের পথ বেয়েই, যে সংগ্রাম ছিল মানুষের সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলারই অনিবার্য ফলাফল। মানুষ যদি আরও উন্নত হতে চায়, তাহলে তাকে এক ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলতে হবে। নাহলে সে ক্রমে ক্রমে শ্রমবিমুখ হয়ে পড়বে, এবং অধিকতর গুণসম্পন্ন মানুষরা জীবনযুদ্ধে কম গুণসম্পন্ন মানুষদের থেকে বেশি সাফল্যও অর্জন করতে পারবে না। তাই, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক হারকে (তার বেশ কিছু সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর দিক থাকলেও) কোনভাবেই ভীষণ রকম কমিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সমস্ত মানুষেরই অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার পাওয়া উচিত, আর যোগ্যতম ব্যক্তিদের জীবনযুদ্ধে সবথেকে সফল হওয়া এবং সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যাওয়ার পথে কোন আইনগত বা রীতি-প্রথামূলক প্রতিবন্ধকও স্থাপন করা উচিত নয়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণই ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও, মানবপ্রকৃতির উচ্চতম অংশের উপর আরও কিছু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রভাবও অস্বীকার যায় না। কেননা মানুষের নৈতিক গুণাবলী প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ততটা অগ্রসর হয় নি, যতটা অগ্রসর হয়েছে অভ্যাস, যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা, নির্দেশ, ধর্ম ইত্যাদির প্রভাবের সাহায্যে। অবশ্য মানুষের নীতিবোধের

বিকাশের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে যে সামাজিক প্রবৃত্তি, তা গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই—এ-কথা অনস্বীকার্য।

কোন নিম্নতর জৈবিক রূপ থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মানুষ—এটাই এগ্রন্থের মূল সিদ্ধান্ত। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে, এ সিদ্ধান্ত অনেকেই ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও, আমরা যে বর্বরদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছি, তাতে কোন সন্দেহই নেই। এক জঙ্গলাকীর্ণ ও ভাঙাচোরা সমুদ্রতটে একদল ফুজিয়ানকে প্রথম দেখার সময় বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, সে স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। ঐ ফুজিয়ানদের দেখা মাত্রই আমার মধ্যে যে চিন্তাটা ঝলক দিয়ে উঠেছিল, তা হচ্ছে—এ-রকমই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা! ঐ লোকগুলি ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন, সর্বাঙ্গে রঙ দিয়ে আঁকা নকশা, জট-পড়া দীর্ঘ চুল, মুখে উত্তেজনার ছাপ, আর চাউনিতে হিংস্রতা, বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের ছোঁয়া। প্রায় কোনরকম কলা-কৌশলই তাদের জানা ছিল না। যা-কিছু শিকার করত, তাই দিয়েই জীবনধারণ করত বন্য জীবজন্তুদের মতো। তাদের কোন শাসনব্যবস্থা বা সরকার ছিল না, এবং নিজেদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরের সকলকার প্রতিই তারা ছিল একান্ত নির্মম। কোন বন্য মানুষকে তার নিজের বাসভূমিতে দেখলে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, কেননা মনে রাখা দরকার আরও নিম্নতর কোন জীবের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার শিরায় শিরায়। সেই ছোট্ট বীর বাঁদরটি, যে তার প্রতিপালকের জীবন রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল এক ভয়ংকর দুশমনের সামনে, কিম্বা সেই বৃদ্ধ বেবুনটি, যে পাহাড় থেকে নেমে এসে এসে একপাল বিস্মিত কুকুরের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নিজের তরুণ সাথীকে—এদের থেকে উদ্ভূত হয়েছি বলতে আমি যতটা গর্ববোধ করি, ততটা গর্ব আমি অনুভব করি না কোন বন্য মানুষের থেকে সৃষ্টি হয়েছি বলতে, যে মানুষটি তার শত্রুদের উপর নির্যাতন চালিয়ে উৎফুল্ল হয়, রক্তরঞ্জিত বলি দিয়ে উল্লসিত হয়, অনুশোচনাহীনভাবে চালিয়ে যায় শিশুহত্যা, নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে ক্রীতদাসীর মতো আচরণ করে, যার ব্যবহারে কোনরকম নম্রতা নেই, এবং যে নানান কুসংস্কারে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

নিজের প্রচেষ্টায় না হলেও, জৈবিক পরম্পরার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য মানুষ কিছুটা গর্ব অনুভব করতেই পারে। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মানুষ এই শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল না, ধাপে ধাপে সে উঠে এসেছে এখানে। এই ঘটনাটা তাকে সুদূর ভবিষ্যতে আরও উঁচুতে ওঠার আশা যোগাতে পারে। কিন্তু এখানে

আমরা আশা বা আশঙ্কা নিয়ে আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি আমাদের যুক্তির পরিসরে আবিষ্কৃত সত্যটুকু নিয়ে। আমার সাধ্যমতো প্রমাণ উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। তবে, আমার মতে, এ-কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের যাবতীয় মহৎ গুণ সত্ত্বেও, চরম হীন অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য তার সহানুভূতি, অন্যান্য মানুষের প্রতি এবং এমনকি নিম্নতম প্রাণীদের প্রতিও তার সদাশয়তা, তার আকাশছোঁয়া মননশক্তি যা সৌরজগতের গতি-প্রকৃতিকেও আয়ত্ত করতে শুরু করছে—এইসব সুউন্নত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্তেও, মানুষের শারীরিক কাঠামোয় আজও রয়ে গেছে কোন নিম্নতর জীব থেকে উদ্ভূত হওয়ার অনপনেয় ছাপ।